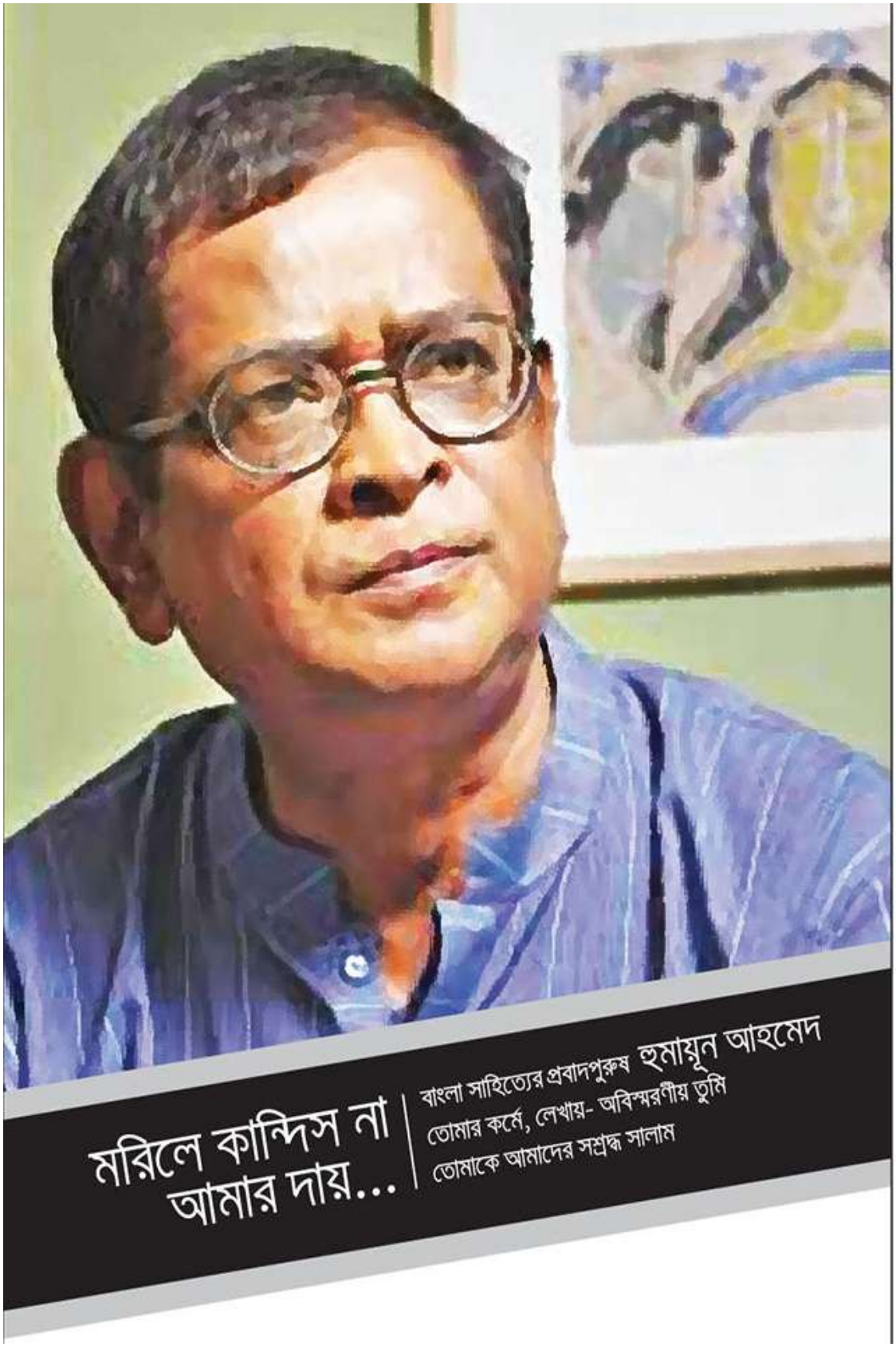
মরিলে কান্দিস না
আমার দায়...
বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ হুমায়ূন আহমেদ
তোমার কর্মে, লেখায়- অবিস্মরণীয় তুমি
তোমাকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ

একনজরে হুমায়ূন আহমেদ

লেখক নাম : হুমায়ূন আহমেদ।

ডাকনাম : ছোটবেলায় প্রথমে নাম ছিল শামসুর রহমান। ডাকনাম কাজল। পরে নিজেই নাম পরিবর্তন করে হুমায়ূন আহমেদ রাখেন।

জন্ম : ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর, বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে।

মৃত্যু : ২০১২ সালের ১৯ জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের বেলভ্যু হাসপাতালে।

মা : আয়েশা ফয়েজ। গৃহিণী।

বাবা : ফয়জুর রহমান আহমেদ।

ভাইবোন : তিন ভাই ও দুই বোন।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, এইসব দিনরাত্রি, জোছনা ও জননীর গল্প, মন্দ্রসপ্তক, দূরে কোথাও, সৌরভ, নি, ফেরা, কৃষ্ণপক্ষ, সাজঘর, বাসর, গৌরীপুর জংশন, বহুব্রীহি, লীলাবতী, কবি, নৃপতি, অমানুষ, দারুচিনি দ্বীপ, শুভ্র, নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই, আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, বৃষ্টি ও মেঘমালা, মেঘ বলেছে যাবো যাবো, আমার আছে জল, আকাশ ভরা মেঘ, মহাপুরুষ, শূন্য, ওমেগা পয়েন্ট, ইমা, আমি এবং আমরা, কে কথা কয়, অপেক্ষা, পেন্সিলে আঁকা পরী, অয়োময়, কুটু মিয়া, দ্বিতীয় মানব, ইস্টিশন, মধ্যাহ্ন, মাতাল হাওয়া, শুভ্র গেছে বনে, ম্যাজিক মুনসি, ময়ূরাক্ষী, হিমু, হিমুর হাতে কয়েকটি নীল পদ্ম, হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, আজ হিমুর বিয়ে, হিমু রিমান্ডে, চলে যায় বসন্তের দিন, আমিই মিসির আলি, যখন নামবে আঁধার ইত্যাদি।

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ : বলপয়েন্ট, কাঠপেন্সিল, ফাউন্টেইন পেন, রংপেন্সিল, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ।

উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র : আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য টিভি নাটক : আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য নাটক রচনা শুরু করেন তিনি। এটি তাঁকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর অন্যতম ধারাবাহিক নাটক এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত, অয়োময়, আজ রবিবার।

পুরস্কার : একুশে পদক (১৯৯৪), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), শিশু একাডেমী পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ কাহিনী ১৯৯৩, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ১৯৯৪, শ্রেষ্ঠ সংলাপ ১৯৯৪), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরস্কার (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮) এবং জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক।

তাঁর হাতে সোনা ফলেছে
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা থেকে যখন খবর পাই, বন্ধু হুমায়ূন আহমেদ আর নেই, তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এত অল্প বয়সে তিনি চলে গেলেনমেনে নিতে পারছি না এখনো। প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। ! হুমায়ূন ছিলেন আমার ছোট। কিন্তু আমরা মিশতাম বন্ধু হিসেবে। খুব আড্ডাপ্রিয় ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। ছিলেন সুরসিক। আমি যখন ঢাকা যেতাম , তখন ছুটে যেতাম ওর নুহাশপল্লীতে। জমিয়ে আড্ডা মারতাম। মনে আছে, ওখানের সুইমিং পুলেও আমরা একসঙ্গে সাঁতার কেটেছি। নিউইয়র্কে অবস্থানকালীনও আমরা আড্ডা মেরেছি। আড্ডা মেরেছি হুমায়ূন কলকাতায় এলেও। তিনি ছিলেন আমার একজন ভালো বন্ধু। এত অল্প বয়সে তিনি চলে যাবেন, ভাবতেই পারিনি। আমেরিকা থেকে চিকিৎসা শেষে তিনি যখন দেশে ফিরেছিলেন কিছুদিনের জন্য , তখন ভেবেছিলাম, তিনি সত্যিই বেঁচে ফিরে এসেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবারের রাতের খবর আমার হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

হিমু ছিল হুমায়ূনের এক অমর সৃষ্টি , অনবদ্য চরিত্র। হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশের খুবই জনপ্রিয় লেখক। পশ্চিমবঙ্গেও হুমায়ূন সমান জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু বাংলাদেশ নয় , এই উপমহাদেশ এক নামী, প্রতিভাবান লেখককে হারাল। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

আমি তো হুমায়ূনকে বলতাম, তোমার জনপ্রিয়তা আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকেও তুমি হার মানিয়েছ। শুনে হুমায়ূন হাসতেন। বলতাম , দারুণ সব নাটক তোমার। মন কেড়ে নেয় মানুষের।

হুমায়ূন আহমেদের ছিল এক শক্তিশালী লেখনীর হাত। তাঁর হাতে সোনা ফলেছে। তাই তো কলকাতার দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় পরপর আট বছর তাঁর উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। অথচ কলকাতার লেখকদেরও পরপর প্রতিবছর লেখা ছাপা হয় না। আমাদেরও লেখা ছাপা হতো এক বা দুই বছর অন্তর। এতেই বোঝা যায়, তিনি কত বড় মাপের লেখক ছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ শুধু সাহিত্যের গণ্ডিতে

নিজেকে আটকে রাখেননি। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নির্দেশিত এবং রচিত নাটক বাংলাদেশে দারুণ জনপ্রিয় ছিল। জনপ্রিয় ছিল তাঁর চলচ্চিত্রও।
সর্বশেষ ছয়সাত মাস আগে ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলেছিলাম-, ভয় নেই, সেরে উঠবে। সত্যি বলতে কী, হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন শক্ত মনের মানুষ। বারবার বলতেন , আমি রোগ থেকে মুক্তি পাব।
আমি তাঁর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম ঢাকায়। সে কী আনন্দ তখন দুই বন্ধু চুটিয়ে ! আড্ডা মেরেছি।
এই প্রতিভাবান লেখকের মৃত্যু আমি এখনো মেনে নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে , হুমায়ূন এখনো আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। আমি বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। λ অনুলিখন

তাঁর শেষ প্রহর
হাসান ফেরদৌস

শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ। নয় মাস একটানা লড়াই করেছিলেন বেঁচে থাকার জন্য, পারলেন না। গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় বেলা একটা ২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন, শাশুড়ি তহুরা আলী, সস্ত্রীক ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল , দীর্ঘদিনের প্রকাশক বন্ধু মাজহারুল ইসলাম এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. আবদুল মোমেন ও তাঁর স্ত্রী সেলিনা মোমেন।

মৃত্যুর আগের শেষ ঘণ্টার কথা বিস্তারিত বললেন ড. মোমে ন।

‘আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছি, তখন নিউইয়র্ক সময় দুপুর ১২টা ১০ মিনিট। ভেন্টিলেশনে ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এর আগে প্রচণ্ড ব্যথায় কোঁকাচ্ছিলেন। ব্যথা কমানোর জন্য কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। অচেতন অথচ ভেতরে ভেতরে প্রবল আলোড়ন চলছিল, আমরা ঠিক টের পাচ্ছিলাম। ডা. মিলার, যাঁর অধীনে হুমায়ূন আহমেদের চিকিৎসা চলছিল, খুবই চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। দেহের রক্তচাপ বারবার পরীক্ষা করছিলেন। চোখ রাখছিলেন মনিটরের ওপর। বললেন, রক্তচাপ ১২০/৭০-এর ওপরে রাখাই হলো আসলে চ্যালেঞ্জ। কৃত্রিম উপায়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার জন্য সব রকম চেষ্টাই তিনি করছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, রক্তচাপ দ্রুত নেমে যাচ্ছে। ৫৬, ৩৪, ৩৩–পারদের মাত্রায় কমছে; আমাদের উদ্বেগ বাড়ছে। একসময় দেখলাম, মনিটরে রক্তচাপের রেখাটি লম্বা একটানা রেখায় পরিণত হলো। ডা. মিলার বিষন্ন মু খে বললেন, “এটাই মৃত্যুর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তার পরও মিরাকল কখনো কখনো ঘটে। ” কৃত্রিম উপায়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি, তখন সময় বেলা একটা ২০ মিনিট।’

ড. মোমেন জানালেন, হুমায়ূন আহমেদের শয্যাপাশে তখনো ব্যাকুলভাবে কথা বলে চলেছেন শাওন। তখনো তাঁর অনেক না-বলা কথা রয়ে গেছে। আকুল হয়ে বলছেন , 'তুমি যেয়ো না। ছেলে দুটিকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ?' শাশুড়ি তহুরা বেগম উচ্চ স্বরে কাঁদছেন। মাজহার–হুমায়ূন আহমেদের দীর্ঘদিনের নিকটবন্ধু–কথা হারিয়ে ফেলেছেন। 'এমন বেদনার দৃশ্য, এমন কান্না আমি কখনো দেখিনি,' বিষাদ কণ্ঠে বললেন ড. মোমেন।

নয় মাস আগে চিকিৎসার জন্য নিউইয়র্কে আসার পরপর হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার কথা হয়। ক্যানসার কঠিন রোগ, কিন্তু সে রোগকে পরাস্ত করতে পারবেন–এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি জানালেন, সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য। সে সময় কী মনে হওয়ায় ভাবলেন, নিজের শরীর চেকআপ করিয়ে নেবেন। তখনই ধরা পড়ল কোলন ক্যানসার, তা-ও বেশ অগ্রসর পর্যায়ে। তড়িঘড়ি করে নিউইয়র্কে এসে ভর্তি হন বিশ্ববিখ্যাত ক্যানসার হাসপাতাল স্লোওন ক্যাটারিংয়ে। প্রথম দুটি কেমো থেরাপি সেখানে দেওয়ার পর তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় নিউইয়র্কের বেলভিউ হাসপাতালে। পর পর দুটি সফল অস্ত্রোপচার এই হাসপাতালেই হয়।

সফল অস্ত্রোপচারের পরও হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন মূলত অস্ত্রোপচারোত্তর জটিলতা থেকে। এমনিতে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তার ওপর প্রথম অস্ত্রোপচারের পর জটিল সংক্রমণে আক্রান্ত হন। সে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রক্তে ও টিস্যুতে। দ্রুত কমতে থাকে রক্তচাপ , বাধাগ্রস্ত হয় শরীরের রক্তপ্রবাহ। বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বারের মতো অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু সময় ততক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে। ড. মিলার জানান, হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর আশু কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতা, হৃদ্যন্ত্রের বৈকল্য ও কিডনির ক্রমব্যর্থতা।

জীবনের শেষ দিনগুলো প্রবল শারীরিক বেদনার ভেতর দিয়ে কাটিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। বেদনা উপশমের জন্য কড়া মাত্রার ওষুধ দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। মাজহারুল ইসলা ম জানান, কথা বলতে না পারলেও জ্ঞান পুরোপুরি হারাননি তিনি। ভেন্টিলেশনে থাকার কারণে যন্ত্রণা বেড়ে গিয়েছিল। আকারে-ইঙ্গিতে, কখনো কাগজে লিখে বলতেন নলগুলো খুলে ফেলতে। স্ত্রী শাওনকে শাসন করে বলতেন, 'চিকিৎসককে এখনই বলো এসব খুলে ফেলতে। '

মাজহার বললেন, 'আজ সকালে বেশ ভালো ছিলেন হুমায়ূন ভাই। এত দ্রুত যে চলে যাবেন, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। মৃত্যুর আগে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি , ব্লাড প্রেশার কমে আসছে। শাওন চিৎকার করে বলছেন, "তুমি একটু শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করো। " খালাম্মা কোরআন শরিফ থেকে দোয়া-দরুদ পড়ছেন। জাফর ভাই ও ভাবি পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। আমাদের সবার চোখের সামনে চলে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ।'

হুমায়ূন আহমেদের চিকিৎসার সঙ্গে গোড়া থেকে জড়িত ছিলেন বিশ্বজিৎ সাহা। গত মাসের শেষ দিন বেশ রাত করে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন বেলভিউ হাসপাতালে। কাচের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে ইশারায় হুমায়ূন আহমেদ ভেতরে আসতে বললেন। ঘরে ঢোকার পর রোগা আঙুলগুলো বাড়িয়ে দিলেন। এর আগে বিশ্বজিৎ ও তাঁর স্ত্রী রুমা যতবার এসেছেন , হুমায়ূন আহমেদের মাথা টিপে দিয়েছেন, হাত-পা টিপে দিয়েছেন। সে দিনও প্রিয় লেখকের আঙুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। 'সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা,' এ কথা বলতে গিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন বিশ্বজিৎ।

নিউইয়র্কের বইমেলা হলো গত মাসে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের পক্ষে সে মেলায় তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি জানান, মেলায় অংশ নিতে হুমায়ূন আহমেদ খুব আগ্রহী ছিলেন। প্রথমবারের মতো তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হবে, সে জন্য দারুণ উত্তেজিত ছিলেন তিনি। 'শতবর্ষের বাংলা গান'–এই নামে এক ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করেছিলেন। তিনি ধারা বর্ণনা দেবেন , স্ত্রী শাওন গাইবেন গান। 'হলো না, কিছুই হলো না,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন বিশ্বজিৎ।

হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় একটি ইসলামিক ফিউনেরাল হোমে। আজ শুক্রবার জুমার পর তাঁর জানাজা হবে বাঙালি -অধ্যুষিত এলাকা জ্যামাইকার একটি বাংলাদেশি মসজিদে। রাষ্ট্রদূত মোমেন জানান, হুমায়ূন আহমেদের মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্ভব হলে শুক্রবার জানাজার পর বিমানযোগে পাঠানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন তাঁরা।

মাজহারও জানান, সম্ভব হলে একই বিমানে দেশে ফিরবেন শাওন ও তাঁদের দুই শিশুপুত্র। সুস্থ হওয়ার আশায় নিউইয়র্ক এসেছিলেন হুমায়ূন ও শাওন। স্বামীর লাশ নিয়ে একা ফিরে যাচ্ছেন শাওন।

নিউইয়র্কের আকাশ এখন ঘন কালো মেঘে ঢাকা। থেমে থেমে ঝরছে বৃষ্টি। আকাশও বুঝি কাঁদছে প্রিয় লেখকের অকাল তিরোধানে।

২০ জুলাই, ২০১২, নিউইয়র্ক।

আমার বন্ধু হুমায়ূন
আসাদুজ্জামান নূর

১৫ জুলাই আমি নিউইয়র্ক পৌঁছেছিলাম। ১৬, ১৭ ও ১৮ জুলাই আমি ছিলাম হুমায়ূন আহমেদের পাশে। ১৬ আর ১৭ জুলাই মনে হয়েছিল তাঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। ১৮ জুলাই মনে হচ্ছিল একটু ভালো। মাজহার সে সময় হুমায়ূনের মূল চিকিৎসক ডা. মিলারের একটি এসএমএস দেখাল। আমি নিশ্চিত নই , সম্ভবত ডা. মিলার এই এসএমএস পাঠিয়েছিলেন পূরবী বসুকে। এসএমএসে লেখা ছিল , হুমায়ূনের

শরীরের অবস্থা প্রতিদিনের উন্নতি-অবনতি নিয়ে বিচার করা যাবে না। এক সপ্তাহ দেখে তার পরই আসতে হবে কোনো সিদ্ধান্তে।

আমি যে তিন দিন নিউইয়র্কে ছিলাম, প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে গেছি। প্রথম দিন তাঁকে ছুঁয়ে দেখেছি। কথা বলার চেষ্টা করেছি। সেদিন তিনি একটু কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনো সাড়া দেননি। দিবারাত্রি তাঁর কাছাকাছি ছিল শাওন, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইয়াসমিন হক ও মাজহার। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাঁকে সর্বোচ্চ চিকিৎসাই দেওয়া হয়েছে। ১৮ জুলাই নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনে আসার সময় জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকেও মাজহারের কাছে ফোন করে তাঁর খবর নিয়েছি।

গতকাল (১৯ জুলাই) লন্ডনে পৌঁছানোর পর বিকেলের দিকে ঢাকা থেকে আমার স্ত্রীর ফোন পেলাম। তখনই খবরটা পেলাম। আমি মাজহারকে ফোন করার পর ও কিছু বলতে পারছিল না। হাউমাউ করে কাঁদছিল।

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমার জীবনের এত ঘটনা রয়েছে, তা কি বলে শেষ করা যাবে?

হুমায়ূন শরীরের ব্যাপারে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। তেল-চর্বিযুক্ত খাবার খেতে পছন্দ করতেন। ধূমপান করতেন। স্বাস্থ্য সচেতন হলে, সময়মতো স্বাস্থ্যপরীক্ষা করালে আগেই তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ত। কিন্তু তিনি মনে করতেন, 'যতক্ষণ বেঁচে আছি, বাঁচার মতো বেঁচে থাকব।' ওপেন হার্ট সার্জারি হওয়ার পরেও খাওয়াদাওয়ায় কোনো নিয়ম মেনে চলেননি তিনি। আমরা তাঁকে নিয়ম মেনে চলতে বলতাম, কিন্তু তিনি শুনতেন না। বরং বলতেন, 'এত টাকা-পয়সা খরচ করে অপারেশন করালাম, তাহলে সেটা করালাম কিসের জন্য? ভালোভাবে থাকার জন্যই তো!'

হুমায়ূনের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বিষয়ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম। নানা ধরনের জটিলতা, সংকটে বন্ধু হিসেবে কমবেশি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা সেটা ঠিক করেছি, না ভুল করেছি, আজ আর সে আলোচনার প্রয়োজন নেই। মানুষ হিসেবে তিনি যেটা ভালো মনে করেছেন , সেটাই করেছেন।

হুমায়ূন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন না একেবারেই। সবাইকে নিয়ে চলার একটা আগ্রহ সব সময়ই তাঁর ছিল। আনন্দ তিনি একা উপভোগ করতেন না। পরিবার, বন্ধুরা তাঁর পাশে থাকুক, সেটাই চাইতেন। কিন্তু একটা ব্যাপার বলব, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া ছিল কঠিন কাজ। সম্পর্কের একটা পর্যায়ে গিয়ে তিনি একটা দেয়াল তুলে দিতেন। বন্ধুদের কারও পক্ষেই সেই দেয়ালের ওপাশে যাও য়া সম্ভব ছিল না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা হয়তো যেতে পারত, কিন্তু সে বিষয়ে আমার জানা নেই। খুবই অগোছালো জীবন যাপন করতেন , কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব গোছালো। যেমন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনি কারও সঙ্গে দেখা

করতেন না। সেটা ছিল তাঁর লেখালেখি আর পড়াশোনার সময়। হুমায়ূনের বাড়িতে ছিটকিনি লাগানো হতো না। চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকত।

বিচিত্র মানুষ ছিলেন হুমায়ূন। বিজ্ঞানের ছাত্র , কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল বিস্তর। মানবসভ্যতার ইতিহাস, ধর্ম নিয়ে তাঁর জানার পরিধি ছিল বিশাল। ছবি আঁকাও ছিল পছন্দের বিষয়। ছিলেন গানপাগল। রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি লোকসংগীত নিয়েও আগ্রহ ছিল। ময়মনসিংহগীতিকা ভালো লাগত তাঁর। লালনের ছিলেন প্রচণ্ড ভক্ত।

কোথাও কেউ নেই নাটকে হুমায়ূন আমাকে চরিত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি নেতিবাচক চরিত্রটি বেছে নিলাম। তখন টেলিভিশনের এক প্রযোজক আমাকে বলেছিলেন, কাজটা ভালো হলো না। আমাকে নাকি ইতিবাচক চরিত্রেই মানায়। তাই আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম কাজটা। তারপরের ঘটনা তো জানেন সবাই। বাকের ভাই চরিত্রটি ইতিহাস হয়ে গেল। হুমায়ূনের যেকোনো নাটকেই আমি অবধারিতভাবে ছিলাম। কিন্তু রাজনীতিতে ঢোকার কারণে সরে যেতে হলো। একটা পর্যায়ে গিয়ে আর পারলাম না। হুমায়ূন তখন আমার ওপর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। বলেছিলেন , 'এখন তো আপনি বড় অভিনেতা হয়ে গেছেন, তাই হুমায়ূনকে আর পাত্তা দিচ্ছেন না।'

আগুনের পরশমণি ছবির শুটিংয়ের কাজ শেষের দিকে এসে কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। শুটিংয়ে বসে আছি অনেকক্ষণ ধরে। একসময় অধৈর্য হয়ে বললাম, না, এভাবে আর পারছি না। হুমায়ূনও খেপে গিয়ে বললেন, 'তাহলে চলে যান। ছবিতে এ চরিত্রটি থাকবে না।' আমিও সত্যিই খুব কষ্ট পেয়ে বাড়ি চলে এলাম। রাত ১১টায় দেখি আমার বাড়ির কলবেল বেজে উঠল। হুমায়ূন এসেছেন ফুল হাতে। রাতে আড্ডা হলো। খাওয়াদাওয়া হলো। খুব অল্পতেই রেগে যেতেন হুমায়ূন। কিন্তু তা ভুলেও যেতেন অল্পতেই ।

নিজ গ্রামে তিনি একটি স্কুল করেছেন। প্রথমে বাবার নামে করতে চেয়েছিলেন, পরে সব মুক্তিযোদ্ধার নামে করেছেন। সেই স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম আমি। সে সময় গান হচ্ছিল, আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তাদের সবার চোখে পানি। সেই স্কুল এখন অনেক বড় হয়েছে। হুমায়ূনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্কুলটায় সরকারিভাবে বেতন গেলে তাঁর ওপর থেকে চাপ অনেকটা কমে যেত। স্কুলটি সরকারি করা হলে তাঁর আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি পাবে।

যাওয়া তো নয় যাওয়া
আনিসুজ্জামান

হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে নতুন করে আর কী বলার আছে? ২৪ বছর বয়সী এক তরুণ–বিজ্ঞানের ছাত্র–প্রথম উপন্যাস লিখেই পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে ফেলল। তারপরে আর পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ

বা প্রয়োজন হলো না। সে যা-ই লেখে পাঠকেরা তা সাগ্রহে লুফে নেয়। বইমেলায় লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে তারা তার বই কেনে, তাতে লেখকের স্বাক্ষর নিতে না পারলে দুঃখিত হয়। প্রকাশকেরাও অমন অদৃশ্য সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে তার পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্যে, বড় অঙ্কের আগাম টাকা দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়। হুমায়ূনের উপন্যাসের নাট্যরূপ ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত হলে বাড়িসুদ্ধ লোকজন সব কা জ ফেলে তা দেখতে থাকে। হুমায়ূন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তা দেখতে শহর ভেঙে পড়ে। চলচ্চিত্র বা নাটকের জন্যে হুমায়ূন গান লেখে, তাতে সুর দেয়, তা সমাদৃত হয়। মনের আনন্দে হুমায়ূন ছবি আঁকে, তা নিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

হুমায়ূন লিখেছে দু হাতে। তার গ্রন্থের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গেছে। সে লিখেছে উপন্যাস ও ছোটগল্প, নাটক ও রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও শিশুতোষ রচনা। প্রথম প্রথম সমালোচকেরা তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তারপর তাঁরা তার ত্রুটিসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। হুমায়ূন বেশি লেখে , তাতে তার লেখার মান পড়ে যায়। হুমায়ূন বড় বেশি জনপ্রিয়, তার মানে তার লেখায় গভীরতা নেই। হুমায়ূন কেবল গল্প বলে, দেশ ও সমাজের প্রতি তার কোনো অঙ্গীকার নেই।

হুমায়ূন একবার বাংলা সাহিত্যের এক অধ্যাপককে একটা গল্প পড়তে দেয় তার মতামত জানার জন্যে। অধ্যাপক স্বীকার করেন, গল্পটা মন্দ নয়। তবে, তাঁর মতে, এতে গভীরতা কম। পাণ্ডুলিপিটা পকেটে ভরতে ভরতে হুমায়ূন তাকে বলেছিল, 'গল্পটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমি চরিত্রের নাম পালটে কপি করে দিয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যখন গভীরতার অভাব, তখন আমার লেখা অগভীর হলে আমার দুঃখ নেই।'

হুমায়ূন কখনো দাবি করেনি যে, গল্প বলার অধিক সে কিছু করতে চেয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে যেমনভাবে সে দেখেছে, তেমনিভাবে তাকে উপস্থিত করেছে। দেখা যাবে, সে যা তুলে ধরেছে তার লেখায়, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার দেখার ভঙ্গি, উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে এই চেনা জগৎ ও জানা কথার মধ্যে আমরা নতুনত্ব খুঁজে পাই, আনন্দ-বিষাদের দোলায় দুলতে থাকি। ভালো করে গল্প বলাই তো কথাসাহিত্যিকের প্রধানতম কাজ। টেলিভিশন নাটকে তার সৃষ্ট চরিত্রের শাস্তি যেন না হয় , তার জন্যে বাংলাদেশের একাধিক জায়গায় মিছিল হয়েছে। বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টির বড় দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী হতে পারে? আর সামাজিক অঙ্গীকার? আবার তার টেলিভিশন-নাটকের কথাই বলি। ধারাবাহিকের বিশেষ একটি পর্ব প্রচারিত হওয়ার পরের দিন সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুনি ছাত্রদের মুখে মুখে 'তুই রাজাকার' বাক্যটা সজোরে ঘুরে ফিরছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূনের লেখার মধ্যে যে-অসাধারণত্ব আছে, তার গুণগ্রাহিতার পূর্ণ পরিচয় ভবিষ্যতে যে পাওয়া যাবে , তাতে আমার সন্দেহ নেই।

যে-সাহস নিয়ে সে হলুদ হিমু ও কালো র‍্যা ব লিখেছিল, তা যেমন দুর্লভ, তেমনি বিপজ্জনক–সমাজের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার না থাকলে অমন বই লেখা যায় না।

হুমায়ূন পাঠকসৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরা–বাংলা সাহিত্যে যাদের কোনো আগ্রহ নেই–হুমায়ূনের বই পড়তেই ভালো করে বাংলা লেখার উদেযাগ নিচ্ছে। হুমায়ূনের কল্যাণে এ দেশের প্রকাশনা শিল্প যেমন সহায়তালাভ করেছে, তারও তুলনা বিরল।

হুমায়ূনের মধ্যে যে-সৃষ্টিশীল মানুষটি বাস করতো , সে ছিল অনেকটা খেয়ালি। তার ব্যক্তিগত আচরণে এই খেয়ালিপনার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে , তবে তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তার রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে দুর্জ্ঞেয়তা ও রহস্যময়তা–যেখানে চরিত্রের আচরণে বা ঘটনার পরম্পরায় আমরা সবসময়ে সামঞ্জস্য বা কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি না। তবে নিজের রচনায় হুমায়ূন যে-গতিশীলতা সৃষ্টিতে পারক্ষম, তার ফলে এ-সম্পর্কে মনে প্রশ্ন বা অবিশ্বাস জাগার আগেই গল্প এগিয়ে যায়। আসলে হুমায়ূনের মনে অতিপ্রাকৃতে আস্থার একটা জায়গা আছে , সেটা অনস্বীকার্য।

হুমায়ূন সম্পর্কে নতুন কথা সম্ভবত এই যে , ৬৪ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তার মৃত্যু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল , এ কথা বলা যাবে না। তারপরও আশা ছিল, সে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে। তার অগণিত বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী-গুণগ্রাহী এই মৃত্যুতে হতাশ ও বেদনার্ত । তারপরও, হুমায়ূন নেই, এ-কথাটি বলতে পারব না। হুমায়ূন আছে। ভালো করেই আছে। চিরদিনই থাকবে।

হুমায়ূন তার পূর্বসূরিদের রচনা দিয়ে নিজের অনেক বইয়ের নাম রেখেছিল। জীবনানন্দ দাশের দারুচিনি দ্বীপ কিংবা যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ মনে পড়ে। সবচেয়ে সে বেশি নিয়েছিল রবী ন্দ্রনাথ থেকে:আগুনের পরশমণি, আমার আছে জল, তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে , দিনের শেষে, দূরে কোথায়, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল , মেঘ বলেছে যাব যাব, শ্যামল ছায়া, সকল কাঁটা ধন্য করে, সবাই গেছে বনে। তাকে অনুসরণ করে এবং তার চলে যাওয়াকে মনে করে আমিও আজ রবীন্দ্রনাথের কথাই ব্যবহার করি: যাওয়া তো নয় যাওয়া।

প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ
ইমদাদুল হক মিলন

বাবার মৃত্যুর পর আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

চার দিন কথা বলতে পারিনি। নিঃশব্দে চোখের জলে ভেসেছি। ১৯৭১ সালের কথা। সেই ঘটনার ৪১ বছর পর গতরাত (বৃহস্পতিবার, ১৯ জুলাই) থেকে আমি বলতে গেলে বাকরুদ্ধই হয়ে আছি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো থেকে অবিরাম ফোন এসেছে, কত বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন ফোন করেছেন, ফোন ধরার পরই গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। চোখের জলে গাল ভাসতে শুরু করেছে।

হুমায়ূন ভাই নেই, এই বেদনা আমি নিতে পারছি না।

গত কয়েক দিন নানা রকমের খবর রটছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল প্রচার করছিল তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। 'কালের কণ্ঠে' সংকটাপন্ন শব্দটা লিখতে আমি মানা করলাম। এই শব্দ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বুধবার সন্ধ্যায় আমেরিকায় ফোন করে মাজহারের কাছে খবর নিয়েছি। তিনি বলেছেন , অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে। শুনে চাপ ধরা বুক খানিকটা হালকা হলো। বৃহস্পতিবার বাসায় ফিরছি, রাত ৯টার দিকে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ ফোন করলেন। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। হুমায়ূনের খবর কী , বলো তো? মন খারাপ করা সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

আগের দিন শোনা মাজহারের উদ্ধৃতি দিলাম। তার পরও মন ভারাক্রান্ত হলো। তখনই নিউ ইয়র্কে মাজহারকে আবার ফোন করলাম। মাজহার আগের মতোই বললেন, অবস্থা তেমনই। আমি মামুন ভাইকে ফোন করে বললাম। তিনি যেন হাঁপ ছাড়লেন। থ্যাঙ্কস গড।

রাত ১১টার দিকে ফরিদুর রেজা সাগর ফোন করে বললেন, যখন তখন অশুভ সংবাদটা আসবে। মন শক্ত করো।

ঘণ্টাখানেক পর সেই সংবাদ এলো। টেলিভিশন স্ক্রলে উঠতে লাগল, নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ...

এর পর থেকে আমার চারপাশে শুধুই হুমায়ূন আহমেদ। মাথা শূন্য হয়ে গেল , বুক ফাঁকা হয়ে গেল। চোখজুড়ে শুধুই হুমায়ূন আহমেদের প্রিয়মুখ। কত দিনের কত ঘটনা মনে এলো , আমাদের কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনার দিন। যে বেলভ্যু হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, ১০-১২ বছর আগে আমরা কয়েকজন তাঁকে সেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর হার্টের সমস্যা। এনজিওগ্রাম করাবেন। আর্কিটেক্ট করিম ভাই, অন্যপ্রকাশের মাজহার, কমল আর আমি, আমরা গেলাম তাঁর সঙ্গে।

যাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলাটার কথা আমার মনে আছে। আমরা সবাই ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে তাঁর দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে। হুমায়ূন ভাই

দলামোচড়া করে দু-তিনটা শার্ট-প্যান্ট ভরলেন একটা ব্যাগে, পাসপোর্ট-টিকিট হাতে নিলেন, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বললেন, চলো।

আমি অবাক। আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন, না কুতুবপুর?

নিউ ইয়র্কে তখন একটা বইমেলারও আয়োজন করেছিল মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদার গেছেন। হুমায়ূন ভাই আর আমিও অতিথি। একই হোটেলে উঠেছি সবাই। কী যে আনন্দে কাটল কয়েকটা দিন। এনজিওগ্রাম করানো হলো হুমায়ূন ভাইয়ের। এক রাত হাসপাতালে থাকতে হবে। কিন্তু ওই একটা রাত একা হাসপাতালে থাকবেন তিনি, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। শিশুর মতো ছটফট করতে লাগলেন, চঞ্চল হয়ে গেলেন। আমরা নানা রকমভাবে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে একটা রাত বেলভ্যুতে রাখতে পেরেছিলাম। চারপাশে বন্ধুবান্ধব ছাড়া তিনি থাকতেই পারতেন না। একা চলাফেরা করতে পারতেন না। তিনি চলতেন সম্রাটের মতো। চারপাশে আমরা কয়েকজন তাঁর পারিষদ।

হুমায়ূন ভাই, যে জগতে আপনি চলে গেলেন, সেখানে একা একা আপনি কেমন করে থাকবেন? সেখানে তো আপনার পাশে আপনার মা নেই, শাওন নেই, নিষাদ-নিনিত নেই, মাজহার নেই, আমরা কেউ নেই।

আমার ৫০তম জন্মদিনে আমাকে নিয়ে 'প্রথম আলো'তে একটা লেখা লিখলেন হুমায়ূন ভাই, 'কী কথা তাহার সাথে'। (এই নামে 'এনটিভি'তে আমি তখন একটা প্রোগ্রাম করতাম। হুমায়ূন ভাইকে নিতে চেয়েছি, তিনি যাননি। শাওনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।) তাঁর স্বভাব ছিল যেকোনো লেখা লিখলেই সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে সেই লেখা পড়ে শোনাতেন। ওই লেখাটাও পড়তে লাগলেন। আমি বসে আছি তাঁর পাশে। আলমগীর রহমান, মাজহার, আর্কিটেক্ট করিম- আমরা মুগ্ধ হচ্ছি তাঁর লেখায়। আমার মুখে শোনা আমার কিশোর বয়সের এক দুর্দিনের বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। সেই অংশটুকু পড়তে পড়তে আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। কী গভীর ভালো তিনি আমাকে বেসেছেন, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।

কালের কণ্ঠে তিনি বহু লেখা লিখেছেন। শুরু থেকেই। আমি গিয়ে জোর করে তাঁর লেখা নিয়ে আসতাম। একদিন বললেন, দেড়-দুই বছরে কালের কণ্ঠে যত লেখা লিখলাম, জীবনে কোনো পত্রিকায় এত অল্প সময়ে এত লেখা আমি লিখিনি। কেন লিখেছি জানো? তোমার জন্য।

আগরতলায় বেড়াতে গিয়ে পুরনো একটা মন্দির দেখতে গিয়েছি আমরা। পুরোদল। জনা ১০-১২ লোক। সেই মন্দিরের সামনে আদুরে ছেলে যেমন করে অনেক সময় পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বাবাকে, ঠিক সেভাবে দুই হাতে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনেরই গভীর আনন্দিত হাসিমুখ। মাজহার ছবি

তুললেন। হুমায়ূন ভাই হাসতে হাসতে বললেন , মনে হলো আমার একটা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের ছেলে আছে।

আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ।

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য তিনি নিউ ইয়র্কে চলে যাওয়ার পর কালের কণ্ঠের সাহিত্য ম্যাগাজিন 'শিলালিপি'তে তাঁকে নিয়ে আমি একটা ধারাবাহিক লেখা শুরু করলাম। 'হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ'। একটু নতুন আঙ্গিকে লেখা। আমার স্মৃতিচারণা আর তাঁর ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউটা 'অন্যদিন' পত্রিকায় একসময় ছাপা হয়েছিল। সেটাকেই নতুন আঙ্গিকে প রিবেশন করা। ১৩ পর্বে লেখাটা শেষ হলো।

নিউ ইয়র্কে বসে হুমায়ূন ভাই একটু রাগলেন। আমাকে নিয়ে একটা লেখা লিখলেন , 'মিলন কেন দুষ্টু'। সেই লেখায় আমাকে মৃদু বকাঝকাও করলেন। তাঁর সম্মানে কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাটা আমি ছেপে দিলাম।

কিছুদিন আগে দুই সপ্তাহের জন্য তি নি দেশে এসেছিলেন। উঠেছিলেন তাঁর প্রিয় নুহাশ পল্লীতে। সেখান থেকে এলেন ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায়। এক রাতে দেখা করতে গেছি। তিনি তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন রুমটায় চেয়ারে বসে আছেন। শাওন আছে পাশে, মাজহার আছে। একপাশে বসে আছেন স্থপতি ও লেখক শাকুর মজিদ। আলমগীর রহমান এলেন, মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা এলো। আমি বসে আছি হুমায়ূন ভাইয়ের পায়ের কাছে। তাঁর মুখটা আর আগের মতো নেই । কালো হয়ে গেছে। মাথার চুল গেছে অনেকটা পাতলা হয়ে। আর শরীরও কেমন যেন ভারী মনে হলো আমার। ওজন কি একটু বেড়েছে ?

দু-চার কথার পর হঠাৎ তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, গভীর মায়াবী গলায় বললেন, ওই লেখাটার জন্য মন খারাপ করেছিলে? বললেন এমন করে, আমি তাঁর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

হুমায়ূন ভাই, বৃহস্পতিবার রাত থেকে আপনার জন্য শুধু আমি নই , পুরো বাংলাদেশ কাঁদছে। অমিত হাবিবের কথা আপনার মনে আছে। কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রজগতের অত্যন্ত মেধাবী যুবক। মাত্র এক রাতে কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিল অমিত। আমিই তাকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাত ১টার দিকে ফোন করে অমিত কাঁদতে লাগল। ফোনের একদিকে আমি কাঁদি, আরেক দিকে অমিত। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ আপনাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে। যে আপনার কাছে গেছে, সে তো বটেই, দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেছে , আপনার লেখা পড়েছে, নাটক-সিনেমা দেখেছে, আপনার লেখা গানগুলো শুনেছে, তারা যেমন ভালো আপনাকে বেসেছে, পৃথিবীর খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এ রকম ভালোবাসা জোটে। আপনি চলে গেছেন , বাংলাদেশ আজ চোখের জলে

ভাসছে। আমাদের চারদিক অনেকটাই অন্ধকার। শ্রাবণ দিনে আপনি চলে গেলেন আর আমাদের আকাশ ছেয়ে গেল শ্রাবণ মেঘে। এই মেঘ চোখের জলের বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।

হুমায়ূন ভাই, আপনার মনে আছে, একদিন নুহাশ পল্লীতে ঢোকার মুখে , গেটের বাইরের দিকটায় দুপুরের নির্জনতায় আপনি ও আমি হাঁটছিলাম। আমাদের পায়ের কাছে ফুটে আছে কিছু সাদা রঙের ছোট ছোট বুনোফুল। তেমন গন্ধ নেই। আপনি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন , এগুলো কী ফুল, বলো তো?

প্রথমে আমি চিনতে পারলাম না। আপনি বললেন, বিভূতিভূষণ এই ফুলের কথা অনেকবার লিখেছেন।

বুঝে গেলাম। ভাঁটফুল।

আপনার নুহাশ পল্লীর গেটের কাছে বছর বছর ফুটতে থাকবে ভাঁটফুল , নুহাশ পল্লীর সবুজ মাঠ আরো সবুজ হবে বর্ষার বৃষ্টিতে, আপনার ঔষধি বাগান হয়ে উঠবে বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। নুহাশ পল্লীর ফুলের ঝোপ রঙিন হবে বসন্তকালে , গাছপালায় বইবে চৈতালী হাওয়া, আপনার পুকুরের জলে শ্বাস ফেলতে উঠবে মাছেরা, পাখিরা মুখর হবে সকাল -দুপুর-সন্ধ্যায়। গভীর রাতে দূরে ডাকতে থাকবে দুরন্ত কোকিলেরা। শিউলি ফুলের মতো জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করবে আপনার তৈরি করা এক টুকরো পৃথিবী। শ্রাবণ দিনের বৃষ্টি আপনার শোকে কাতর হবে , নুহাশ পল্লীর মাঠ ভাসবে চোখের জলে , ফুলেরা ভুলে যাবে গন্ধ ছড়াতে, মুখর পাখিরা স্তব্ধ হবে, জ্যোৎস্না রাত ম্লান হবে। দুরন্ত কোকিল আর ডাকতে চাইবে না। আমাদের বইমেলাগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে, প্রকাশকরা হারাবেন উদ্দীপনা। ঈদসংখ্যাগুলো হারাবে জৌলুস। টেলিভিশন পর্দা আলোকিত হবে না আপনার নতুন নাটকে। মাইক্রোবাস ভরে আমরা আর আড্ডা দিতে যাব না নুহাশ পল্লীতে, দখিন হাওয়া মুখর হবে না হাসি -আনন্দে। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

আপনার সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল' ১৬০ পৃষ্ঠার মতো লিখে ড. আনিসুজ্জামান , ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও আমাকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মতামত জেনে লেখা শেষ করবেন। আপনার লেখা দেয়াল উপন্যাসে ওই ১৬০ পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে লিখতে লিখতেই যেন উঠে চলে গেলেন আপনি। টেবিলে অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে আপনার কলম আর সাদা কাগজ।

সাদা কাগজ, তোমাকে কে বোঝাবে হুমায়ূন আহমেদ চলে যাননি। এই তো বাঙালি পাঠকের বুকশেলফগুলোতে রয়ে গেছেন তিনি , টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে রয়ে গেছেন, বাংলাদেশের সিনেমায় রয়ে গেছেন। তাঁর গান রয়ে গেছে সুবীর নন্দী , শাওন আর অন্যান্য শিল্পীর কণ্ঠে। আর তিনি রয়ে গেছেন বাঙালি জাতির অন্তরে।

যে অপার্থিব জগতে আপনি আছেন, সেখানে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন হুমায়ূন ভাই। পরম করুণাময় আপনাকে গভীর শান্তিতে রাখুক।

গল্পের জাদুকর
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

কোনো লেখক অন্যলোকে চলে যাওয়ার পরপরই তাঁকে নিয়ে কোনো লেখা নির্মোহ হয় না, তাতে অবধারিতভাবেই বিষাদের ছায়া পড়ে, একটা কষ্ট অথবা ক্ষোভের আস্তর জমে। কেউ সময়ের আগে চলে গেলে একটা ক্ষোভও তো জাগে মনে। আর সেই লেখক যদি হুমায়ূন আহমেদের মতো বর্ণিল কেউ হন, যিনি মানুষকে তাঁর সাহচর্যের স্মৃতি বিলাতেন , মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত উপহার দিতেন। তাহলে তাঁকে নিয়ে লেখাটাতে স্মৃতির বিষয়গুলোই তো প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। হুমায়ূন আহমেদের লেখার নিশ্চয় নানা মূল্যায়ন হবে। কেউ কেউ হয়তো একাডেমিক প্রবন্ধও লিখবেন। কিন্তু সেসব হবে উপযোগী দূরত্বের একটা সময়ে।

তাঁকে নিয়ে একটা সমালোচনা আছে এ রকম যে তিনি জনপ্রিয় সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাতে উঁচু কোনো মান ধরে রাখার চেষ্টা করেননি, যে মান নন্দিত নরকে তাঁর লেখকজীবনের শুরুতেই অর্জন করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, ওই মান রাখার দায় থেকে তিনি বরং নিজের মতো করে একটি সাহিত্য ভাষা ও গল্প বলার কৌশল রপ্ত করতেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। এবং এই গল্প বলার কৌশলটি যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেই মানে পৌঁছাতে অনেকের এক জীবন লেগে যাবে। তাঁর একটি উপন্যাস হাতে নিয়ে সমস্তটা না পড়ে রেখে দিতে পারেন না তাঁর কঠোর সমালোচকও। গল্প বলার এ শক্তিটি তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এক বিশালসংখ্যক পাঠকসৃষ্টির একক কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন , যে পাঠকেরা তাঁকে পড়া শেষ করে অন্য লেখকদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। একসময় পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ছিল যাদের প্রতিদিনের সঙ্গী, তারা হুমায়ূন আহমেদকে তাদের সঙ্গী করেছে। আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব একটি ঠিকানা তিনি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলেন। বাংলা একাডেমী প্রতি ফেব্রুয়ারি যে বইমেলার আয়োজন করে, যার অভিঘাত আমাদের সাহিত্যে পড়েছে সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ে, তার সাফল্যের পেছনে তাঁর অবদান নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

লেখাটা হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের মূল্যায়ন নয় , বরং তাঁকে নিয়ে কিছু স্মৃতির। মনে পড়ে , আশির দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তাঁর সঙ্গে এক চা-বিকেলের কথা। সে সময় তিনি নিয়মিত ক্লাবে যেতেন, দাবা খেলতেন এবং প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সমবয়সীর মতো গল্প করতেন। কথা অবশ্য প্রফেসর রাজ্জাকই বেশি বলতেন। দাবা খেলার আগে তিনি চা খাচ্ছিলেন এবং আমাকে বলছিলেন, আশার পথে একটা পোস্ট অফিসে গিয়ে তিনি বোকা বনেছেন সেটি বন্ধ দেখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে দুটি

বই তিনি পাঠাতে চাইছিলেন, একটা বড় বাদামি মোড়কে জড়িয়ে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কি তাঁকে এ রকম বড় বাদামি মোড়কে জড়িয়ে কোনো বই পাঠান ? আমার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর দুটি বইয়ের শুরুর পাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম কেটে আমার নাম লিখে দিলেন। তারপর আমার হাতে দিয়ে দাবা খেলতে চলে গেলেন এবং এই মোড়ক ছেঁড়া থেকে নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত একটা কথাও তিনি বলেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটি কেটে দেওয়াটা তাঁর প্রতি কোনো অশ্রদ্ধার প্রকাশ ছিল না, তাঁদের দুজনের বন্ধুত্বটা ছিল সারা জীবনের। কিন্তু এটি ছিল তাঁর প্রবল ঘরে ফেরার একটা ইঙ্গিত। সেই ফেরাটা বাংলাদেশের সাহিত্যকে একটা ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। শুক্রবার কাগজে দেখলাম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরই আছেন হুমায়ূন আহমেদ।' শরৎচন্দ্রের মতোই জনপ্রিয় এবং গল্পের জাদুকর।

আরেকটি কথা অনেককে বলতে শুনি, হুমায়ূনের পাঠক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণপড়ুয়ারা। বিষয়টা যেন খারাপ কিছু–এ রকম করেই বলা হয়, কিন্তু এই তরুণদের মন বুঝতে পারাটা , তাদের আনুগত্য আদায় করে নেওয়াটা তো বিশাল ব্যাপার। এই তরুণ শ্রেণীটি তো পড়েছে দৃশ্যসংস্কৃতির মায়ায় , তারা তো ছাপার জগতে একটা পা রাখতেই চায় না। তারা যখন নিজে থেকেই হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে, বইমেলায় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বাক্ষর নেয়, অনেকে যখন হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমু সেজে মেলায় ঘুরে বেড়ায়, বুঝতে হবে, হুমায়ূন এদের মনের রসায়নটা রাতে সেরেছিলেন। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। তরুণদের মনের রসায়নটা বুঝে নিতে তাঁর হয়তো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এ অসাধারণ অর্জনটি কজনের আছে, দুই বাংলায়? তাঁর অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবালও তো কাছে টেনে নিয়েছেন অসংখ্য স্কুলশিক্ষার্থীকে, খুদে পাঠককে, যারা মুগ্ধ হয়ে পড়ে তাঁর সব লেখা। তাহলে এই অর্জনটাকেও কি খাটো করে দেখতে হবে, নাকি অবাক হয়ে ভাবতে হবে, কী করে পারেন!

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয়টাও সেই রসায়নশাস্ত্রের সূত্র ধরে। নন্দিত নরকে ও তোমাদের জন্য ভালোবাসা বের হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল পাঠকদের মধ্যে। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কেউ। কে, ঠিক মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। আমি তাঁকে বললাম , 'রসায়ন আমিও পড়তে চেয়েছিলাম এবং একটি ছোট ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পড়া হয়নি।' তিনি আমাকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'বলুন তো, ঘটনাটা কী।' আমি বললাম, তিনি হাসলেন। তার পর থেকে আমাকে দেখলেই বলতেন, 'এই যে কেমিস্ট্রি-ফেল। কেমিস্ট্রি বিভাগে যে ঢুকতে পারিনি , তিনি সেটাকে ফেল বানিয়ে ফেলেছিলেন।

কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যে কৌতুকের অভাবটা বরাবরের। এই কৌতুকটা ঠিক হাস্যরস নয়, এটির একটি ভালো ইংরেজি আছে, উইট। বাংলা করলে বলা যায়, মাথা দিয়ে হাসা, তিনি মাথায় হাসি আনতেন অসংখ্য পাঠকের এবং প্রচ্ছন্ন একটা রসবোধ, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় 'হিউমার' তা তো তাঁর ছিলই। ফলে কৌতুকের অভাবটা তিনি অনেকখানিই পূরণ করেছিলেন। তবে জীবনে তিনি কৌতুক পছন্দ করতেন, প্র্যাকটিক্যাল জোক করতেন অনেককে নিয়ে। নুহাশ পল্লীতে ভূত আছে, এ রকম একটা রটনা ছিল। একরাতে এই ভূতের খোঁজে আমাকেও নামতে হয়েছিল। অনেক চিন্তাভাবনা করে ভূত উৎপাদন করার ব্যবস্থা হয়েছিল নুহাশ পল্লীতে , সেটি আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। এ জন্য ভূতের ভয়টা পাইনি বলে হুমায়ূন ভাই বেশ নিরাশ হয়েছিলেন।

২.

মে মাসের ২৮ তারিখ রাতে হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে গিয়েছিলাম ধানমন্ডির 'দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে'। বেশ প্রাণবন্তই দেখেছিলাম তাঁকে, যেন ক্যানসারটা দূরের কোনো আপদ , আপাতত তাঁর সঙ্গ ছেড়েছে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস দেয়াল নিয়ে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন। দেয়াল -এর একটি প্রেস কপি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, পড়ে মতামত দেওয়ার জন্য। অন্যপ্রকাশ-এর স্বত্বাধিকারী মাজহারুল ইসলাম, এ বইটি কতটা যত্ন নিয়ে যে হুমায়ূন আহমেদ লিখেছিলেন, যিনি তাঁর একজন সাক্ষী, আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, কিছু মন্তব্য নিয়ে যেন একটি লেখা তৈরি করি। প্রথম আলোর সাহিত্য সাম য়িকীতে সেটি বেরিয়েছিল। কিন্তু সে লেখায় সব আমি বলিনি, যেগুলো সামনাসামনি তাঁকে বলেছিলাম। বইটা নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস ছিল, আবেগ ছিল। কিন্তু আদালতের একটি আদেশে এর কিছু সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন। ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজটি তিনি করতে পারবেন কি না, এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু এসব মন থেকে ঝেড়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গে গিয়েছেন। জুয়েল আইচ, শাকুর মজিদ, আলমগীর রহমান, মাজহার এবং এস আই টুটুল—সবাই তাঁকে ঘিরে ছিলেন সেই রাতে। একসময় শাকুর ছবি তুলবেন বলে ক্যামেরা বের করলে তিনি হঠাত্ আমার পাশে বসে বললেন, 'আমাকে ধরে বসেন তো। আপনি সৈয়দ মানুষ , আপনি ধরে রাখতে পারবেন।'

আমি জুন মাসে নিউইয়র্ক থাকব জানালে ঠিক হলো , ১০ জুন তাঁর অপারেশনের পর ২২ জুন আমরা তাঁর রোগমুক্তি উদ্যাপন করব। টুটুলেরও সে সময় নিউইয়র্ক থাকার কথা।

৩.

২২ জুন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো বটে, কিন্তু বেলভিউ হাসপাতালে, রোগশয্যায়। সেদিন নিউইয়র্কের ওপর বিছিয়ে ছিল ঝকঝকে নীলাকাশ। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার প্রথম কথাটা ছিল, 'বাইরে তাকান, দেখুন, আপনার প্রিয় ঝকঝকে নীলাকাশ।' তিনি হাসলেন। কৌতুক করলেন , সঙ্গে আমার ছেলে ছিল, যাকে নিজের হাতে কিছু লিখে স্বাক্ষর দিয়ে বেশ কিছু বই তিনি দিয়েছেন , তার সঙ্গেও কথা বললেন। তাঁর মনোবলে যেন কোনো চিড় ধরেনি, যেন ক্যানসার এখনো দূরের কিছু। কিন্তু চোখের নিচে ক্লান্তির ছাপ। শরীর দুর্বল। একটা ইনফেকশন হয়েছে, তারও চিকিৎসা চলছে। হুমায়ূন আহমেদ হুমায়ূন আহমেদের মতো নেই। তার পরও একটা আশা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। একটু হেসে আমার হাত ধরে একটু চাপ দিয়েছিলেন। হয়তো বলেছিলেন, 'বিদায়।' আমি শুনিনি।

৪. হুমায়ূন আহমেদের একটি চলচ্চিত্রে একটি সিলেটি গান ছিল এ রকম: 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়।' আমার দায়, মানে আমার জন্য। বিদিতলাল দাস তাঁর অসাধারণ গলায় গানটা গেয়েছিলেন। গানটি হুমায়ূন ভাইয়ের খুব প্রিয় ছিল। সে জন্য তাঁর জন্য থাকল শুধুই ভালোবাসা।

 সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক , ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল
মোহীত উল আলম

লিখতে বসেছিলাম ১৯ জুলাই রাতে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিপুল সাফল্য নিয়ে। প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় তরুণ-তরুণীদের উচ্ছ্বাসমাখা বাঁধভাঙা আনন্দের ছবি দেখে যখন নিজের ভেতরেও তারুণ্যের পুলক অনুভব করছিলাম, তখন প্রথমে ফেসবুকে খবরটা জানলাম যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি...রাজেউন)। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পানি এসে গেল। তখন বাস্তবভাবে জিনিসটা দেখতে গিয়ে বুঝলাম যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু নয় , তাঁর জীবনকে সংযুক্তি করে দেখানোর মতো সুন্দর বিষয় আর হতে পারে না।

সারা জীবন ভালো ছাত্র ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বগুড়া জিলা স্কুল থেকে সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন মাধ্যমিক পরীক্ষায়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সম্মিলিত মেধাতালিকায় স্থান দখল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন রসায়ন বিভাগে। সেখানেও কৃতিত্বপূর্ণ ফল করে ওই বিভাগেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে আমেরিকার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার রসায়নের ওপর

বিশ্বনন্দিত অধ্যাপক গ্লাসের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে ফিরে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতে থাকতে একসময় সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়ার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন।

ওপরের এই বর্ণনায় যে হুমায়ূন আহমেদকে পেলাম, তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি ও চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও ওই কৃতী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হুমায়ূন আহমেদই আজ যে ৭৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ তরুণ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকে সফল হয়েছে, তাদের সবার, তাদের মা-বাবা ও তাদের অভিভাবকদের কাছেও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বা আইকন হয়ে থাকতেন। অর্থাত্ বাংলাদেশের অভিভাবকশ্রেণীর লক্ষ্য থাকত, তাঁদের সন্তানেরা যেন হুমায়ূন আহমেদের মতো কৃতী হয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থী দেরও অভীপ্সা থাকত, হুমায়ূন আহমেদের মতো কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক হওয়া। হুমায়ূন আহমেদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে , তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পরিবারের মধ্যে যেমন প্রত্যেক বাবা ও মা তাঁর ছেলে বা মেয়েকে হয়তো বলতেন, 'বাবা, ভালো করে লেখাপড়া করো, হুমায়ূন আহমেদের মতো ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করো।' অর্থাত্ ধরি, ১০০ বা ২০০ বা বড়জোর ৫০০টা পরিবারের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ স্রেফ তাঁর ভালো রেজাল্ট, আমেরিকার পিএইচডি ডিগ্রি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার খ্যাতির কারণে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকতেন। মা-বাবা বিমুগ্ধচিত্তে তাঁদের সন্তা নদের কাছে হুমায়ূন আহমেদকে রেফারেন্স হিসেবে টানতেন।

কিন্তু সেই হুমায়ূন আহমেদ যখন নিজের চাকরিগত ক্ষুদ্র গণ্ডি ছেড়ে লেখক , নাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেন , তখন তাঁর পরিচিতি বাংলাদেশ ও পৃথিবীর সব বাংলা ভাষাভাষী জগতের মধ্যে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লেও তিনি অভিভাবক আর শিক্ষার্থীদের কাছে আর ভালো ছাত্রের আইকন হিসেবে রইলেন না। অর্থাত্ একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া কোনো মা -বাবাই তাঁদের সন্তানদের বললেন না, 'বাবা, হুমায়ূন আহমেদের মতো লেখক হও।' হুমায়ূন আহমেদের খ্যাতি ও পরিচিতি বিশ্বব্যাপী হয়েছে, কিন্তু অভিভাবকশ্রেণীর মা-বাবার কাছে কিংবা শিক্ষার্থী নিজেদের কাছে তিনি আর মডেল ছাত্র হিসেবে রইলেন না। সেটা তিনি থাকতেন, যদি তিনি কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকের মধ্যে একজন হয়ে থাকতেন।

অর্থাত্ আমি যে কথাটা আনতে চাইছি, সেটা হলো, এই যে আমরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভালো ফল আশা করি, তা আসলে খুব একটা সীমিত অর্থে , প্রায়ই পারিবারিক বা পরিচিত মহলে একটা চাকরিধারী ব্যক্তি হিসেবে যেন তারা প্রতিষ্ঠা পায়, সেই অর্থে। পড়ালেখার জোরে ছেলে বা মেয়ে চাকরি পাবে, সংসার করবে, বাড়ি বানাবে, পদবির হাঁকডাক দেখাবে, এটাই হলো গড়পড়তা বাংলাদেশের অভিভাবকশ্রেণীর সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা। কারণ, আমাদের সমাজ একজন পড়ালেখায় ভালো চাকরিজীবীকে যতটা সম্মান করে, একজন সাহিত্যিককে তা করে না, এটাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এ

দৃষ্টিভঙ্গিটা জীবনকে ছোট করে দেখার জন্য যথেষ্ট। জীবন যেন মহাসমুদ্র নয়, জীবন যেন একটি পুকুর, যার কিনারায়-কিনারায় সাঁতরে পৌঁছানো যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল হচ্ছে , ছেলে বা মেয়ে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় ফল করে চিকিৎসক হচ্ছে টাকা কামাই করার জন্য, চিকিৎসাসেবাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। প্রকৌশলী হচ্ছে নিজের জন্য বাড়িঘর বানানোর জন্য, বাংলাদেশের সড়ক, সেতু নির্মাণ বা বিদ্যুত্ উৎপাদনের জন্য নয়। আর ইংরেজির শিক্ষক হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানচর্চা বা অনুবাদকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য নয়, কিন্তু বড় বড় কোচিং সেন্টার খোলার জন্য। সংকীর্ণ ব্যক্তিগত একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার কাছে আমাদের প্রত্যাশা। এ জীবনবোধ যে সঠিক নয়, তা বোঝা যায় এ পরিসংখ্যান থেকে, যে বাংলাদেশ ৪০ বছর ধরে যত ভালো ছাত্রছাত্রীর জন্ম দিয়েছে, সে তুলনায় বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে উন্নতি সবচেয়ে কম হয়েছে, বা হয়েছে অনুল্লেখ্য। এবার যে সাত লাখের অধিক শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়ে সমকাল পত্রিকার (১৯ জুলাই) ভাষায় 'স্বপ্নসারথি' হয়েছে, আগামী ২০ বছর পর এদের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাবে যে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র দেশসেবা বা সমাজসেবায় নিয়োজিত আছে, আর বাকিরা সবাই, এখন আমরা যা করছি, তাই করবে। স্বার্থপরতার এক একজন চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা হবে।

ঢাকা বোর্ডের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়বারের মতো রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ প্রথম হয়েছে। এর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ গোলাম হোসেন সরকার সাফল্যের পেছনে কারণ হিসেবে বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা'র সফল প্রয়োগের ফলে কলেজের এ সাফল্য এসেছে। তিনি আরও বলেছেন, 'শুধু মেধা থাকলে হয় না, মেধা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ করে দিতে হয়। '

চমৎকার পর্যবেক্ষণ। শুধু মেধা থাকলে হয় না , মেধার সঙ্গে দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি মানবপ্রেম সংযুক্ত না হলে এখনকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা কালের গর্ভে দে শ ও জাতির জন্য সম্পদ নয়, বোঝা হিসেবে পরিণত হবে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার করুণ পরিণতি তখনই হয়, যখন উচ্চ লেখাপড়া জানা শীর্ষ পদের কর্মকর্তা যে ভাষায় চিন্তা করেন বা কথা বলেন, তাঁর অধীন কেরানিও একই চিন্তা করেন ও একই ভাষায় কথা বলেন। লেখাপড়ার করুণ পরিণতি তখনই হয়, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিজ্ঞানের খোঁজ বাদ দিয়ে এমন একটি বিষয়ে নিয়ে মেতে থাকবেন, যে বিষয়ে তাঁকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীও জ্ঞান দান করতে পারবে। একজন উপাচার্য সম্পর্কে শুনেছি, যদিও তিনি অর্থনীতির বা ব্যবসায়িক বিষয়ের অধ্যাপক নন, কিন্তু তিনি নাকি সর্বক্ষণ পুঁজির বাজার বা শেয়ার মার্কেট নিয়ে আলাপে মত্ত থাকেন। এখন সমাজের যে প্রকৃত অবস্থা , রাজনৈতিক দিক থেকে তাতে মনে হচ্ছে, এখনকার কৃতী শিক্ষার্থীরা যে মেধা বিকাশের সুষম পরিবেশ পাবে , তা হয়তো হবে না।

রাজউক কলেজ বা এমন ধারার সফল কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা যে শৃঙ্খলা বা পরিবেশের মাধ্যমে ভালো ফল করে এসেছে, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যে পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে তাদের অধিকাংশের হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর উচ্চশিক্ষার প্রতি রাজনৈতিক অভীপ্সা এবং সাধারণভাবে আমাদের অভিভাবকশ্রেণীর সন্তানদের জীবনের লক্ষ্যের ব্যাপারে অভিব্যক্তির মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক বিরাজ করছে, যার ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের রাজনীতির সংস্কৃতি সাংঘর্ষিক ধারার। ছাত্ররাজনীতিতে তারই বহিঃপ্রকাশ হয়। সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সিলেট এমসি কলেজের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাস পোড়ানোর অভিযোগ উঠলে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন , সংঘর্ষটা রাজনৈতিক, কাজেই তদন্ত না করার আগে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। এর অর্থ হলো, সরকারি দল, বিরোধী দল ও অন্য দলগুলো ছাত্রসংগঠনের নেতা ও কর্মীদের প্রতিপক্ষ দলকে ঠেকানোর কাজে ব্যবহার করার অভিলাষে আশকারা দিয়ে যায়। আবার ছাত্র নামধারী সশস্ত্র ও সন্ত্রাসমুখী এসব শিক্ষার্থী বর্তমান ধারার উচ্চশিক্ষার মধ্যে কোনো চাপে থাকে না। পড়ালেখা ছেড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মেতে থাকলেও তাদের পাস বা ডিগ্রি অর্জন আটকায় না। সমগ্র ছাত্রগোষ্ঠীর তুলনায় এদের সংখ্যা কম, কিন্তু এরা রাজনৈতিক সংগঠন ও ক্ষমতাবানদের প্রশ্রয়ের কারণে কর্মসূচি নিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অচল করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের গায়ে একটি তালা ঝুলিয়ে দিতে পারলে কর্মসূচি সফল। ফলে মেধাবী , দায়িত্ববোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারে না। তারা হতাশাগ্রস্ত হয়।

নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনিশ্চয়তার কথা মনে রেখে আমরা অধিকাংশ অভিভাবক যে ভুলটা করি, সেটা হচ্ছে, সন্তানাদি কোন বিষয়ে লেখাপড়া করবে, সেটা আমরা তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করি। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী মহলের মধ্যে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে লক্ষণীয়, সেটি হচ্ছে, যার যার বিষয়ের প্রতি তার অমনোযোগিতা। এ সর্বব্যাপী অমনোযোগিতার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়ই ভুলভাবে পছন্দ করা বিষয়ের সঙ্গে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়, হয় তারা বিষয়টার কাছে পরাজিত বোধ করতে থাকে, নচেত্ ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। ফলে তারা পাঠ্যাভ্যাস না করে সময়ক্ষেপণের রাস্তা বের করতে থাকে, এবং ক্যাম্পাসে মিছিলভিত্তিক সংঘর্ষপ্রধান রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়তে তাদের তরুণরক্তে সাড়া জাগে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, অভিভাবকের চাপানো সিদ্ধান্তই হয়তো একজন শিক্ষার্থীকে এ রকম বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। এবং এ ধরনের বিষয়বিমুখ শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করার জন্য আদর্শ নামধারী কিন্তু বস্তুত সংঘর্ষমনস্ক দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি ক্যাম্পাসে তৈরি থাকে।

শিক্ষাকে মানবিক মূল্যবোধ অর্জন ও উদার জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে না দেখে শুধু সংসার যাপনের মাধ্যম হিসেবে দেখলে আজকের কৃতী শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার গহ্বরে হারিয়ে যেতে দেরি হবে না।

অধ্যাপক মোহীত উল আলম: বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি, ইউল্যাব, ঢাকা।

'যেতে নাহি দিব, তবু যেতে দিতে হয়'
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

তার নাটকের একটি চরিত্র বাকের ভাইয়ের (আসাদুজ্জামান নূর অভিনীত) যাতে ফাঁসি না হয় তার দাবিতে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র মিছিল অনুষ্ঠান ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। হুমায়ূন আহমেদ অকালে , অসময়ে চলে গেলেন; কিন্তু তিনি তার বহুমুখী সৃষ্টিকর্মের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এক ক্রান্তিলগ্নের এক সাহিত্যিক কালপুরুষ হিসেবে যে চিহ্নিত হবেন , তাতে সন্দেহ নেই

এই দুঃসংবাদটি যে কোনো সময় পাব, এ আশঙ্কাটি আমার মনে গত কয়েকদিন ধরেই ছিল। যখন শুনেছি নিউইয়র্কের হাসপাতালে হুমায়ূন আহমেদের অবস্থার অবনতি ঘটছে, তখনই মনে হয়েছে এবার বুঝি আর কোনো রক্ষা নেই। অথচ কিছুদিন আগেও এই জনপ্রিয় কথাশিল্পী যখন তার মাকে দেখার জন্য ঢাকা ঘুরে গেলেন, তখনও মনে হচ্ছিল তিনি দুরন্ত ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকবেন। তার লেখাজোখার মধ্যেও একটা ক্ষীণ আশাবাদ ও মনোবলের পরিচয় পাচ্ছিলাম।

তার বেঁচে থাকা সম্পর্কে মনে আরও বেশি ভরসা পাচ্ছিলাম এ জন্য যে, আমাদের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তো দুরারোগ্য ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করে, বসবাস করে তারপর মৃত্যুবরণ করেছেন আর হুমায়ূন আহমেদকে তো তরতাজা যুবকই বলা চলে। তার বয়স মাত্র ৬৪ বছর। ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করার তার বয়স আছে, সাহসও আছে। তাছাড়া তার রোগমুক্তি কামনা করেছেন দেশ -বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য অনুরাগী পাঠক।

তবু হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। গত পরশু (বৃহস্পতিবার , ১৯ জুলাই) বিকেলে (লন্ডন সময়) যখন টেলিফোনে খবরটা পেলাম তখন দারুণ ব্যথিত হয়েছি; কিন্তু বিস্মিত হইনি। যদিও এতদিন মনে মনে আশা করেছি, হাসপাতালে তার সফল অপারেশন হওয়ার পর তিনি আশু মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে বেঁচে যাবেন। দেশে ফিরে যাবেন এবং তার অনুরাগী পাঠকদের আরও কিছু ভালো লেখা , ড্রামা, ছায়াছবি উপহার দেবেন। দু'তিনদিন আগে হাসপাতালে পোস্ট অপারেশন তার শরীরিক অবস্থার কথা জেনে সে আশা মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার চেয়ে বয়সে ছোট কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'নারায়ণ, আমি মারা গেলে তুই আমার মুখাগ্নি করিস। ' কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার অগ্রজতুল্য কথাশিল্পীর বহু আগেই চলে গেলেন। শুনেছি তার শেষকৃত্যে এসে তারাশঙ্কর সাশ্রু নয়নে বলেছিলেন, 'নারায়ণ, কথা ছিল তুই আমার মুখাগ্নি করবি। আর সেই কাজটা তুই কিনা আমাকে দিয়ে তোর জন্য করালি ?'

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

আমি হুমায়ূন আহমেদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ১৪ বছর বয়সের ব্যবধান একটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়। ১৯৭৪ সালে আমি যখন দেশ ছেড়ে আসি, তখন হুমায়ূন আহমেদ একেবারেই উঠতি লেখক। ভালো করে নাম জানতাম না। কিন্তু মাত্র ৩৮ বছর পর ২০১২ সালে যখন তিনি মারা গেলেন তখন তিনি দুই বাংলাতেই অসম্ভব জনপ্রিয় লেখক। আমার মনে মনে একটা অসম্ভব আশা ছিল, আমি মারা গেলে হুমায়ূন আহমেদ কি চার-পাঁচ লাইন হলেও আমার একটা ওবিচুয়ারি লিখবেন? প্রশ্নটির জবাব পেলাম লন্ডনে বসে ১৯ জুলাই তারিখে। যখন তার মৃত্যু সংবাদ কানে এলো। বুঝলাম , তার ওবিচুয়ারি আমাকেই লিখতে হবে। তারাশঙ্করের মতোই মনে মনে বলেছি, হুমায়ূন এটা তো হওয়ার কথা ছিল না।

লেখক ও সাহিত্যিকদের আত্মিক বন্ধন যে আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়েও অনেক বেশি দৃঢ় , সেটা আজ হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু খবর পেয়ে আবারও বুঝতে পারলাম। তাকে জীবনে মাত্র একবার দেখেছি , তাও কয়েক মিনিটের জন্য। কিন্তু তার মৃত্যু খবর যখন পেলাম তখন মনে হলো , যেন বহুকালের চেনা এক পরম আত্মীয়ের মৃত্যু খবর পেয়েছি। টেলিফোনে মৃত্যু খবরটি পেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছি। চোখের সামনে প্রথম ও শেষবারের জন্য দেখা তার চেহারাটি ভেসে উঠেছে।

বছর দুই কি তিন আগের কথা। আমি কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম। সমকালের স্নেহভাজন সম্পাদক গোলাম সারওয়ার ঢাকা ক্লাবে আমার জন্য একটি নৈশ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে শহরের তাবৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এসেছিলেন হুমায়ূন আহমেদও। আমি বিদেশে থাকলেও তার এত বই পড়েছি এবং ফিল্ম দেখেছি যে, তার একটা ভাবমূর্তি আমার মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে তিনি বহুদিনের পরিচিতজনের মতো গ্রহণ করবেন তা বুঝতে পারিনি। তিনি তার টেবিল থেকে উঠে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, আমি আপনার একজন অনুরাগী পাঠক। কিন্তু তার আগেই হুমায়ূন আহমেদ বলে উঠলেন , 'আপনি আমাদের কিংবদন্তি। তাই আপনাকে দেখতে না এসে পারলাম না।'

আমি তার কথা শুনে বিব্রত হয়েছিলাম। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। হুমায়ূন বললেন, 'আজ আমি টেলিভিশনে খেলা দেখব (সম্ভবত ক্রিকেট খেলা)। কিন্তু আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে না এসে পারিনি। এবার আপনার কাছে ছুটি চাই। কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে বসতে পারলাম না বলে ক্ষমা চাই।' বলেই তিনি চলে গেলেন। এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমি নিজেও লেখক। তাতে ঈর্ষাবোধ করিনি। বরং গর্ব ও বিস্ময়বোধ করেছি। সম্ভবত বছর দশেক আগে আমি কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে গিয়েছিলাম। আতিথ্য নিয়েছিলাম, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার আন্দোলনের অন্য তম নেতা, ভাষা শহীদ রফিকের নামে নাম আরেক রফিক উদ্দীন সাহেবের বাসায়। হঠাৎ আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম।

সারাদিন ওষুধ খেয়ে কম্বল গায়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম। রফিক সাহেবের স্ত্রী অবশ্য সেবা-যত্নে অস্থির করে তুলেছিলেন। তাকে বললাম , ঘরে গল্প-উপন্যাস কিছু থাকলে আমাকে দিন। পড়ে সময়টা কাটাই।

তিনি আমার কথা শুনে একটু লজ্জা পেলেন। বললেন , 'আমাদের বাসায় গল্প-উপন্যাস তেমন নেই। তবে আমার ছেলে বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ে। তার কাছে দু'চারখানা থাকতে পারে, তাকে বলি।' রফিক সাহেবের ছেলে তখন স্কুলছাত্র। ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া, জীবনযাপন। সুতরাং সে ইংরেজি থ্রিলার বা সায়েন্স ফিকশনজাতীয় কিছু নিয়ে আসবে ভেবেছিলাম। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখি , সে খুবই চটি পাঁচ-ছয়টি উপন্যাস নিয়ে এসেছে এবং সব ক'টি বাংলা বই, হুমায়ূন আহমেদের লেখা।

আমি চকিত বিস্ময়ে তাকে বললাম, তুমি বাংলা জানো এবং বাংলা ব ই পড়ো? সে বলল, হ্যাঁ, আমরা তো নিয়মিত বাংলাদেশে যাই, বাংলা বইপত্র পড়ি। আমার সব বন্ধু হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ে। আমিও পড়ি। আমার খুব ভালো লাগে। আপনার ভালো লাগে না ? স্বীকার করলাম, ভালো লাগে।

সেদিন জ্বর গায়ে নিয়ে একমাত্র পথ্য ও ওষুধ খাওয়ার সময় ছাড়া বাকি সারাদিন হু মায়ূন আহমেদের উপন্যাস পড়েছি এবং ছয়টি চটি উপন্যাসই শেষ করেছি। খুবই ভালো লাগার মতো বই , কিন্তু সেগুলো মনে রাখার মতো বই নয়। সেদিন সুদূর ভ্যাঙ্কুবারে রোগশয্যায় শুয়ে উপলব্ধি করেছি , হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদূত। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে র একাধিপত্য ও অসম প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। বাংলাদেশের বাংলা বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করেছেন। বাজার সম্প্রসারিত করেছেন। বাংলাদেশের বাইরে সুদূর কানাডায় বসে এক বাঙালি টিনএজার হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের ভক্ত-পাঠক এটা আমার কাছে এক অসাধারণ ঘটনা মনে হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদকে বলা চলে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

হুমায়ূন আহমেদ কিংবা ইমদাদুল হক মিলন কত বড় লেখক তার মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি। এই মূল্যায়ন করবে মহাকাল। এককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক পরবর্তীকালে একেবারে বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে যান এমনও দেখা গেছে। এককালে যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত' বইটি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছি ল, সারাবিশ্বের বাঙালি পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আধারকরের উদ্ধৃতি থাকত অসংখ্য লেখকের লেখায়। আজ কোথায় যাযাবর, আর কোথায় দৃষ্টিপাত বইটি ? কিন্তু নবপ্রজন্মের পাঠকের কাছেও রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা কিংবা শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে বা পরিণীতা র আবেদন এখনও শেষ হয়নি।

সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের পর দেখা গেল, ঢাকাকেন্দ্রিক যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছে, তার কোনো বাজার নেই, পাঠক নেই। কলকাতার মেধাহীন লেখকরাও ঢাকার বইয়ের বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। একদিকে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎখাতের চেষ্টা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের বাঙালি লেখকদের জন্য কোনো পাঠক ও মার্কেট সৃষ্টি না হওয়া একটা ঘনায়মান সংকটের আভাস দিচ্ছিল। ষাটের দশকে তো এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, পাকিস্তান সরকার ঢাকা-কলকাতার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় কলকাতার বই ঢাকায় আসছিল না। তখন ঢাকায় কলকাতার বইয়ের এক বিরাট চোরাবাজার তৈরি হয়।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর প্রকাশক কলকাতার শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের নয় , তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদেরও লেখা বই গোপনে বাংলাদেশে মুদ্রণ করে (কখনও কখনও লাহোরে , করাচিতে চোরাগোপ্তাভাবে ছাপিয়ে) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের বাজারে কলকাতার বইয়ের প্লাবন বইয়ে দেয়। পদ্মার এপারের লেখকদের বইয়ের বাজার তৈরি হওয়া বা পাঠক তৈরি হওয়ার পথে এটা ছিল একটা বড় বাধা।

কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য শামসুর রাহমান এ সময় দুই বাংলাতেই স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন এবং নিজস্ব পাঠক সম্প্রদায়ও গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু কথা সাহিত্যে বাংলাদেশের কথাশিল্পীরা ছিলেন একেবারে কোণঠাসা। পঞ্চাশের দশকের আগের শামসুদ্দীন আবুল কালাম , শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ কিংবা পঞ্চাশের দশকের আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ শক্তিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাদের বইয়ের প্রকাশ ছিল অনিয়মিত এবং বাজার সংকুচিত। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দেশের লেখকদের পাঠক সৃষ্টি , তাদের বইয়ের বাজার প্রতিষ্ঠা এবং উভয় বাংলায় তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, সেলিনা হোসেন, হাসান আজিজুল হক এবং আরও অনেকের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদের নামটা একেবারে সামনের সারিতে আসে এ জন্য যে, তাকে গ্রেট রাইটার বলব না; কিন্তু তিনি ছিলেন এ সময়ের বাংলাদেশের বেস্ট পপুলার রাইটার। ছোট গল্প , উপন্যাস, নাটক, টেলিনাটক এবং ছায়াছবির ক্ষেত্রেও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তার প্রথমদিকের নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার চমক সৃষ্টিকারী লেখা। তার অয়োময় , বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই প্রভৃতি নাটক আমি তন্ময় হয়ে দেখেছি। তার নাটকের একটি চরিত্র বাকের ভাইয়ের (আসাদুজ্জামান নূর অভিনীত) যাতে ফাঁসি না হয় তার দাবিতে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র মিছিল অনুষ্ঠান ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। হুমায়ূন আহমেদ অকালে , অসময়ে চলে গেলেন; কিন্তু তিনি তার বহুমুখী সৃষ্টিকর্মের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এক ক্রান্তিলগ্নের এক সাহিত্যিক কালপুরুষ হিসেবে যে চিহ্নিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। গল্প, উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান, ভ্রমণ, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনীমূলক

৩২২টি বই যিনি লিখে গেছেন, গান লিখেছেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, তিনি তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন।

লন্ডন, ২০ জুলাই ২০১২, শুক্রবার

তিনি জোছনা রাতেই বনে গেছেন
আতিকুল হক চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে' গানটি দুঃখের। পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন : '... আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে/যদি আমায় পড়ে তাহার মনে/যাব না এই মাতাল সমীরণে।' এই গানটি হুমায়ূনের খুব প্রিয় গান ছিল। তিনি জোছনা ভীষণ পছন্দ করতেন। কুয়াশাও পছন্দ করতেন। বিটিভিতে তার লেখা নাটক 'খেলা' আমি প্রযোজনা করেছিলাম সেই আশির দশকে। প্রথম দৃশ্যটি ছিল কুয়াশায় ঢাকা গ্রামের একটি পথ। দৃশ্যটি ধারণের সময় হুমায়ূন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন বিটিভির স্টুডিওতে। আমি কুয়াশার আবহের মাঝখানে কিছুটা সূর্যের আলোও রেখেছিলাম। ব্যাপারটি হুমায়ূনের তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ হয়নি। কিন্তু আমি যখন তাকে বললাম, আপনার লেখায় আঁধারের মাঝে কুয়াশার মাঝেও তো সূর্য খেলা করে। হুমায়ূন তক্ষুনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আতিক ভাই এত গভীরে আপনি আমাকে দেখেছেন? ঠিক আছে। একটু আলোর ছোঁয়া না হয় থাকুক। ওকে। নো প্রবলেম।' খেলা নাটকটির আগে আমি বিটিভিতে হুমায়ূনের লেখা 'শঙ্খনীল কারাগার'ও প্রযোজনা করেছিলাম। তিনি তখন আমেরিকাতে পড়াশোনা করতেন। তার রচিত 'কুসুম' নাটকটিও ছিল আমারই প্রযোজনা। নাটকটি দেখে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। টেলিফোনে শিশুর মতো তার সে কী কান্না! 'এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না। কুসুম দেখে আমার হলের সব ছাত্র রাত ১২টায় গাছসুদ্ধ ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার হলের রুমে নিয়ে এসেছে। আমিও এখন দূর থেকে আপনার বাসায় কিছু ফুল ছুড়ছি। গ্রহণ করুন। '

বিটিভিতে হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' থেকে শুরু করে 'কুসুম', 'এই সব দিন রাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'অয়োময়', 'কেউ কোথাও নেই'র মতো অগণিত জনপ্রিয় নাটক ও সিরিজ নাটক প্রচারিত হয়েছে। এ কথা অবশ্যই বলতে হবে, স্বীকার করতে হবে যে, টেলিভিশন নাটকে তিনি একটি নিজস্ব নতুন মাত্রা 'হুমায়ূন আহমেদীয়' মাত্রা বা ঘরানা সফলতার সঙ্গে সংযোজনা করেছেন। তিনি টিভি নাটক জনপ্রিয় করেছেন। সমৃদ্ধ করেছেন। তার নির্মিত চলচ্চিত্র _ 'আগুনের পরশ মণি', 'শ্যামলছায়া', 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'দুই দুয়ারী', 'চন্দ্রকথা' চলচ্চিত্রকার হিসেবেও তাকে আমাদের কাছে অমর করে রাখবে। তার গল্প ও উপন্যাসের তো তুলনাই নেই। তার বুদ্ধিদীপ্ত আবেগ , উইট হিউমার ও তার সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি পাঠকদের নিবিষ্ট করে রাখত, আকৃষ্ট করে রাখত। বলতে গেলে একমাত্র হুমায়ূন আহমেদই এ দেশে

বাংলা বইয়ের অগণিত পাঠক তৈরি করে গেছেন। হুমায়ূন আহমেদ জীবনের চার দেয়ালের শঙ্খনীল কারাগারে থেকেও দোয়েলের শিস দিয়ে গেছেন। সূর্য কিরণ নয় , মশালও নয় তিনি মায়াবী চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে গেছেন আমাদের সাহিত্যাকাশে। কঠোর আবহেও তিনি কোমল সুর তুলেছেন। ঢেলে দিয়েছেন পূরবীর শান্ত করুণ রস। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আর জীবনানন্দ দাশের কবিতার সমন্বয়ে এক অদ্ভুত তৃতীয় রসায়নের তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তার বহুমাত্রিক শিল্প ও সাহিত্যকর্মে। নি ন্দিত নরককেও তিনি নন্দিত নরকে পরিণত করতে চেয়েছেন সেখানে একটি ভালোবাসার শান্ত স্নিগ্ধ সবুজ উদ্যান রচনা করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো দুঃখ-কষ্ট-বেদনার জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝেও তিনি মায়া-মমতার সহানুভূতি ও সহমর্মিতার রেশমি সুতোয় জীবনের কোমল নকশিকাঁথা বুনে গেছেন। হুমায়ূন আহমেদের রচনায় যেন অলৌকিক আনন্দের নান্দনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মনন ও মেধার এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে। আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে, হুমায়ূনের ভুবনে বুঝি একজন ঝপযড়ষধৎ এরঢ়ংু , একজন আধুনিক বাউলের বোধহয় আসা -যাওয়া ছিল, বিচরণ ছিল। হলুদ রঙ তো চিরযৌ বনের রঙ। আলোর অভাবেই রাতে ছায়া দেখা যায় না। কিন্তু অন্তরের আলোটি থাকলে ছায়াকে দেখা না গেলেও বোঝা যায়। অনুভব করা যায় চারপাশে সে ছায়ার উপস্থিতি। হুমায়ূন আহমেদের লেখার মধ্যে এই আলোটি ছিল বলেই ছায়ার এই মায়ায় বোধহয় সারাক্ষণ অনুভব করা যেত। বিরহ দহন , দুঃখ ও মৃত্যুর মাঝেও হুমায়ূন বোধকরি 'রবীন্দ্রনাথের সেই শান্তি ও আনন্দলোকের' সন্ধানই করে গেছেন তার সারা জীবন। গভীর দুঃখকেও হালকা করতে চেয়েছেন নিজেকে আড়ালে রেখে। হুমায়ূনের মৃত্যুর সময় নিউইয়র্কের আকাশে উজ্জ্বল সূর্য কিরণ ছিল না, ছিল না গভীর রাতে পূর্ণ চাঁদের আলো ; কিন্তু কবি যে, লেখক যে, সে তো স্বাপ্নিক স্বপ্ন দেখে সারাক্ষণ। তাই হুমায়ূন হয়তো হাসপাতালের বেডে চোখ বুজে জোছনা রাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তার স্বপ্নের জগতে সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছেন। বাংলার এই কালজয়ী ক্ষণজন্মা লেখকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

হুমায়ূন আহমেদ বৃষ্টি ও জ্যোছনার এপিটাফ
বেলাল চৌধুরী

শ্রাবণ আসতে না আসতেই ঝড়ের তা-বে সব ল-ভ- হওয়ার জো। আজকাল আবার ঝড়ের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়ে থাকে। এবারের ঝড়ের নাম হুমায়ূন ঝড়। বিধ্বংসী তো বটেই। তবে এই ধ্বংসের মধ্যে ছিল প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, অনুরাগ, মায়া-মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা, সমীহ, সম্ভ্রম আর বিহ্বলতা, বুকভাঙ্গা হাহাকার, রোদন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুরের ঝকঝকে আলোর বিচ্ছুরণ। অনেকটা কোনো এক ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল/প্রথম প্রেম বিতরণ মাধুরী ফেলেছিল। এ মুকুল হায়রে। হুমায়ূন আহমেদ কিংবদন্তি কথাটাকে ছাপিয়ে অনেক অনেক দূর অবধি ছড়ি য়ে গিয়েছিলেন। এমন অক্লান্ত অদম্য পরিশ্রমী উদ্যোগী পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। হুমায়ূন হারা শুধু আত্মীয়স্বজনরাই নয় সাধারণ মানুষ যেভাবে উতলা হয়ে

পড়েছে তা স্মরণকালের মধ্যে এমনটা দেখা যায়নি। শুধু বাঁধা ছন্দের বাইরে গদ্য লিখে যে আসর জমানো যায় তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুমায়ূন ঝড়। সুশ্রী-কুশ্রী, ভালো-মন্দ তার রচিত আঙিনায় এসে ঠেলাঠেলি করে আকাশে উঠে পড়ল গদ্য বাণীর মহাদেশ/কখনো ছড়ালো অগ্নিনিঃশ্বাস/কখনো ঝরালে জলপ্রপাত। কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল, কোথাও দুর্গম অরণ্য ... হুমায়ূন ঝড়ে রবীন্দ্র সহায় না মেনে এক কদমও যে চলা যায় না সে তো হুমায়ূন নিজেই বাৎলে গেছেন তার বিপুল বিশাল রচনা সম্ভারে। এমন কি দৈনন্দিন জীবন যাত্রাতেও যত্রতত্র খুঁজে পাওয়া যায় হুমায়ূনের চিন্তা প্রবাহে রবীন্দ্রনাথকে। 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে। বাতাসে তারে উড়িয়ে নে যায়। মাটি মিশায় মাটিতে/গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা/ভালোবাসা দিয়ে গেল ... ' নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে... এমনি কত শত পঙ্ক্তিতে হুমায়ূন বিদ্যুতায়িত হয়েছিলেন যে তা আর বলার নয়। নিত্যদিনে জীবনযাপনেই কেবল নয়, তার রচনাতেও যে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুব হয়ে আছেন সে কথা বলা বাহুল্য জেনেও বলতে হয় যেমন যারা হুমায়ূনের গল্প নিয়ে বলছেন বা লিখছেন তারা কি জানেন, এক্ষেত্রেও রবীন্দ্র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। যেমন তিনি বলছেন 'গল্প ফুরোয় না, গল্প বানিয়ের দিন ফুরোয়।' এর পরেই আছে_ শুধু শিশু বয়সের নয়, সকল বয়সেই মানুষ হলো গল্পপোষ্য জীব। পশুপাখির জী বন হলো আহার নিদ্রা, সন্তান পালন, মানুষের জীবন হলো গল্প। কত বেদনা , কত ঘটনা, সুখ-দুঃখ, রাগবিরাগ, ভালোবাসার কত ঘাত প্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। এখানেই শেষ নয় আরো আছে 'নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন- কী হলো হে, কী খবর, তার পরে।' এই তার পরের সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবীজুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী। তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস। আবার সেই সঙ্গে আরো বলছেন , 'বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তাহলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।' না এখানেই শেষ নয়। নিত্যদিনের লীলা খেলার বিষয়েও দুটি উদ্ধৃতি না দিলে কেমন হয়। একজন আসে যুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে যুক্তিতে ... তিনি যে গাহিতেছেন। আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি। তারপরে প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এইতো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। হুমায়ূন কোনো এপিটাফ লিখে গেছেন কি না আমার জানা নেই। তবে সে এপিটাফে যে বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, রজনী শংকল ঘন ঘন দেয়া গরজন/রিমঝিম শব্দে বরিয়ে। থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তখন কথা থেকে গেলেও বলা থামে না। বাংলাদেশের এখন তদনুরূপ অবস্থা। শ্রাবণ , তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে/পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে।/কেয়া কাঁদে, 'যায় যায় যায়।'/কদম ঝরে 'হায় হায় হায়।' দখিন-হাওয়া কয় ওর তো আর সময় ছিল না বাকি আর।

স্মৃতিসত্তায় নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ

ফরিদ আহমদ দুলাল

সকাল সাতটা থেকে নাট্যজন আবুল হায়াত ও ডলি জহুর -এর হুমায়ূন-তর্পণ শুনছিলাম আর হুমায়ূন আহমেদ-এর সাথে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলাম। সকাল ন'টায় অনুষ্ঠান শেষে টেলিভিশনে বিশেষ সংবাদ হিসেবে নিচে লেখা এলো, 'নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ-এর মরদেহ ঢাকায় পৌঁচেছে'। সংবাদটি মনিটরে দেখে বুকের ভেতরে হাহাকার করে উঠলো। হুমায়ূন আহমেদ -এর সাথে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা কোনোদিনই ছিলো না, আমি তাঁর তেমন অনুরক্ত পাঠকও ছিলাম না , যারা হুমায়ূন আহমেদ-এর বই পেলেই গোগ্রাসে গেলেন; বরং বলতে পারি যখন হুমায়ূন আহমেদ খুবই স্বল্প পরিচিত লেখক সে সময় তাঁর সাথে আমার সামান্য পরিচয় ছিলো, সে পরিচয়কেও ঘনিষ্ঠতা বলা যাবে না কিছুতেই। তবু কেন বুকটা হাহাকার করে উঠলো ! কেন মনে হলো তাঁর উদ্দেশে কিছু নিবেদন করি ? হুমায়ূন আহমেদ-এর সৌভাগ্য এবং আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা দেখে একজন সামান্য সাহিত্যকর্মী হিসেবে আমার বুকে কখনো ঈর্ষা উঁকি দেয়নি এমন কথা বললে মিথ্যাচার হবে; কিন্তু তাঁকে নাগাল পাওয়া যে আমার সাধ্যের অতীত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না; তবু কেন লেখার উদ্যোগ? হুমায়ূননামা লিখে নিজেকে পরিচিত করতে চাই? তা-ও বোধকরি নয়। তাহলে আগেই লিখতাম। আর যেখানে লিখছি তা আমার নিজের পাঠ সীমার বাইরে। লিখছি বুকের হাহাকারকে সান্তনা দিতে।

হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় লেখক ছিলেন সন্দেহ নেই, তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু সমকালেই নয় বরং বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের ইতিহাসেই উল্লেখ করার মতো ঘটনা হয়ে থাকবে। আর আজকের বিপুলমিডিয়া নিজেদের স্বার্থেই হুমায়ূন আহমেদ-এর পাশে আছে । তাঁর লেখার জাদুকরী শক্তি যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো সম্মোহনী ক্ষমতা, যেমন ছিলো বৈচিত্র্য, তেমনি ছিলো প্রসাদগুণ। সবচেয়ে বড় কথা মানুষ হিসেবে হুমায়ূন ছিলেন আকর্ষণীয় স্বভাবের অধিকারী একজন, যেকাউকে মুহূর্তে আপন করে নেবার সামর্থ তাঁর ছিলো অপরিসীম। আজ যখন তাঁর মরদেহ ঢাকায় পৌঁছলো তখন তাঁর সাথে আমার স্বল্প পরিচয়ের স্মৃতিগুলোই যেন মহার্ঘ্য হয়ে বেজে উঠলো হৃদয়ের তন্ত্রীতে। হুমায়ূন আহমেদ-এর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। ধারণা ছিলো শনিবার সন্ধ্যায় অথবা রবিবার সকালে মরদেহ ঢাকায় পৌঁছে যাবে, আমিও সবার সাথে শহীদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে আসতে হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই আমার পড়া হয়েছিলো তাঁর নন্দিত নরকে এবং শঙ্খনীল কারাগারে উপন্যাস দুটি। এরপর তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিও পড়েছিলাম একটি। ১৯৭৩-এ তিনি বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন চাকরী করেছেন জানতাম, কিন্তু পরিচয় হয়নি। পরবর্তীতে যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন

একবার পরীক্ষক হিসেবে আনন্দমোহন কলেজে এসেছিলেন। আমি তখন আনন্দমোহন থেকে অনার্স শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.কম ফাইনাল পরীক্ষার্থী, উঠতি লেখক এবং সাহিত্য সংগঠক। আনন্দমোহন কলেজের রসায়ন বিভাগের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। আনন্দমোহনের লাইব্রেরিয়ান আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি লেন; আমার সম্পর্কে কিছুটা বাড়িয়েই বলেছিলেন। যে কারণে তিনিও আমাকে কিছুটা আমল দিয়েছিলেন হয়তো -বা। তা নাহলে তো আমি তাঁর ছাত্রই ছিলাম। কিছুদিন পর , ১৯৮৪-র দিকে হবে, হুমায়ূন আহমেদ ময়মনসিংহে এসেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে, যে অনুষ্ঠানে আমার থাকা হয়নি। অনুষ্ঠানের দিন আমি কিশোরগঞ্জে ছিলাম। পরদিন ট্রেনে ফিরেছি। স্টেশনে নেমে দেখলাম এক নম্বর প্লাটফর্মে হুমায়ূন পায়চারী করছেন পেছনে হাত রেখে। ঢাকায় ফিরবেন, গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন। কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। সামান্য কুশল বিনিময়ের পর তিনি কপট রাগ করে বললেন, 'আমি ময়মনসিংহে আসছি আপনি জানতেন না!' বললাম, 'জানতাম'। উনি ইয়ার্কি করে বললেন, 'তাহলে আপনাকে অনুষ্ঠানে দেখলাম না কেন - আমি আপনার চেয়ে বড় লেখক না?' আমি বললাম,'শুধু বড় লেখক নন, আপনি আমার বয়সেও বড়- জ্ঞানেও বড়। দুঃখিত আমি আসলে শ্বশুরালয়ে গিয়েছিলাম, ফিরতে পারিনি।' হুমায়ূন আহমেদ আরো একটু মজা করার জন্য হয়তো বললেন, 'শুনেন ফরিদ, নাটকেও আমি আসছি। আপনার বারোটা বাজিয়ে দেবো।' আমিও ঠাট্টা করে বললাম, 'নাটকে কিন্তু আমি আপনার চেয়ে অনেক আগেই এসেছি।' তীর্যক ভঙ্গিতে বললেন, 'কোনো সন্দেহ নেই। আমি তো ভাবছি আপনার কাছে নাটকে তালিম নেবো।' হাসতে হাসতেই বললেন কথাগুলো তিনি। আমি তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ফিরলাম। এর পর আরো দু'চারবার দেখা হয়েছে, কুশল বিনিময়ের বেশি কিছু হয়নি। সম্ভবত ১৯৯০ অথবা ১৯৯১-এ আমরা ময়মনসিংহে তাঁর শততম গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে মুসলিম ইনস্টিটিউট -এর পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে আমার ভূমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকদিন পর তাঁর সাথে দেখা হলো। তিনি প্রথমে আমাকে চিনতেই পারলেন না। যখন পরিচয় দিলাম তিনি অবাক বিস্ময়ে বললেন, 'ফরিদ, আপনার স্বাস্থ্য এতো খারাপ হলো কেন!' আমি জানালাম আমার অসুস্থতার কথা। তিনি আরো অবাক হয়ে বললেন , ' বলেন কী! হ্যাপাটাইটিস-বি! এ রোগে তো মানুষ বাঁচে না!' আমার অতটা জানা ছিলো না, বললাম, 'তাই নাকি?' বললেন,'নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট!' এবার আমি হেসে বললাম, 'ঐ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছি।' হুমায়ূন আহমেদ সিরিয়াস, বললেন, 'খুব সাবধান থাকবেন, হ্যাপাটাইটিস-বি ভয়ংকর রোগ।' আমি কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম এবং খাদ্য গ্রহণে সাবধানীও হয়েছিলাম। উনি অবশ্য আমাকে বিলিরোবিন নর্মাল হয়েছে কি-না পরীক্ষা করাতে বলেছিলেন, আমি করাতে পারিনি। আরো পরে যখন তাঁকে দেখেছি বই মেলায় অথবা অন্য

কোথাও তখন তাঁর আমার দিকে তাকাবার ফুরসতই হয়নি, তাকাতে পারলে হয়তো চিনতেন অথবা চিনতেন না। তাতে কিছু এসে যায় না।

তবে আমার এক ধরণের ভালোলাগা ছিলো এই ভেবে যে হুমায়ূন আহমেদ আমাদেরই লোক। আমাদের কোনো এক সাক্ষাতে তিনি আমায় বলেছিলেন তাঁর নাটকে তিনি 'ফরিদ' নামটি ব্যবহার করেছেন আমার নাম মাথায় রেখে; কথাটি অবশ্য তিনি ঠাট্টা করে বলে থাকতে পারেন; আমি কিন্তু আমার প্রথম উপন্যাস শৃঙ্খল-এ 'গুলতেকিন' নামটি ভাবীর নাম মাথায় রেখেই লিখেছিলাম। সেকথা আমি তাঁকে একবার জানিয়েও ছিলাম। তিনি কিছু বলেন নি , সামান্য রহস্যের হাসি হেসেছিলেন, যেমনটি তিনি হেসে থাকতেন।

আজও হুমায়ূন আহমেদ ঢাকায় এলেন না ফেরার দেশে চলে যেতে, আজও আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পারলাম না। এখন তো হুমায়ূন কতো বড়, আকাশের ওপারে আকাশের চেয়েও অনেক বড়। আর আমি এতোটাই ছোট যে দূরে থেকে কেবল তাঁর জন্য শুভকামনা জানাতে পারি ; যে শুভকামনার ধ্বনি ইথারে ঘুরবে কিন্তু কারো বিবেচনা পাবে না; কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই তা টের পাবেন। কেননা তিনি যে আজ অনেক বড়র চেয়েও বড়। তাঁর সম্পর্কে আমার তেমন কিছু বলার নেই , তাঁর আশপাশে যারা আছেন তাদের উদ্দেশে বলবো, হুমায়ূন আহমেদ সত্যিই অনেক বড়, তাঁর গায়ে যেন কোনো সংকীর্ণতার কালি না লাগে।

প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ
ইমদাদুল হক মিলন

বাবার মৃত্যুর পর আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

চার দিন কথা বলতে পারিনি। নিঃশব্দে চোখের জলে ভেসেছি। ১৯৭১ সালের কথা। সেই ঘটনার ৪১ বছর পর গতরাত (বৃহস্পতিবার, ১৯ জুলাই) থেকে আমি বলতে গেলে বাকরুদ্ধই হয়ে আছি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো থেকে অবিরাম ফোন এসেছে, কত বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন ফোন করেছেন, ফোন ধরার পরই গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। চোখের জলে গাল ভাসতে শুরু করেছে।

হুমায়ূন ভাই নেই, এই বেদনা আমি নিতে পারছি না।

গত কয়েক দিন নানা রকমের খবর রটছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল প্রচার করছিল তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। 'কালের কণ্ঠে' সংকটাপন্ন শব্দটা লিখতে আমি মানা করলাম। এই শব্দ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বুধবার সন্ধ্যায় আমেরিকায় ফোন করে মাজহারের কাছে খবর নিয়েছি। তিনি বলেছেন ,

অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে। শুনে চাপ ধরা বুক খানিকটা হালকা হলো। বৃহস্পতিবার বাসায় ফিরছি, রাত ৯টার দিকে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ ফোন করলেন। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। হুমায়ূনের খবর কী , বলো তো? মন খারাপ করা সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

আগের দিন শোনা মাজহারের উদ্ধৃতি দিলাম। তার পরও মন ভারাক্রান্ত হলো। তখনই নিউ ইয়র্কে মাজহারকে আবার ফোন করলাম। মাজহার আগের মতোই বললেন, অবস্থা তেমনই। আমি মামুন ভাইকে ফোন করে বললাম। তিনি যেন হাঁপ ছাড়লেন। থ্যাঙ্কস গড।

রাত ১১টার দিকে ফরিদুর রেজা সাগর ফোন করে বললেন, যখন তখন অশুভ সংবাদটা আসবে। মন শক্ত করো।

ঘণ্টাখানেক পর সেই সংবাদ এলো। টেলিভিশন স্ক্রলে উঠতে লাগল, নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ...

এর পর থেকে আমার চারপাশে শুধুই হুমায়ূন আহমেদ। মাথা শূন্য হয়ে গেল , বুক ফাঁকা হয়ে গেল। চোখজুড়ে শুধুই হুমায়ূন আহমেদের প্রিয়মুখ। কত দিনের কত ঘটনা মনে এলো , আমাদের কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনার দিন। যে বেলভ্যু হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, ১০-১২ বছর আগে আমরা কয়েকজন তাঁকে সেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর হার্টের সমস্যা। এনজিওগ্রাম করাবেন। আর্কিটেক্ট করিম ভাই, অন্যপ্রকাশের মাজহার, কমল আর আমি, আমরা গেলাম তাঁর সঙ্গে।

যাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলাটার কথা আমার মনে আছে। আমরা সবাই ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে তাঁর দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে। হুমায়ূন ভাই দলামোচড়া করে দু-তিনটা শার্ট-প্যান্ট ভরলেন একটা ব্যাগে, পাসপোর্ট-টিকিট হাতে নিলেন, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বললেন, চলো।

আমি অবাক। আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন, না কুতুবপুর?

নিউ ইয়র্কে তখন একটা বইমেলারও আয়োজন করেছিল মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদার গেছেন। হুমায়ূন ভাই আর আমিও অতিথি। একই হোটেলে উঠেছি সবাই। কী যে আনন্দে কাটল কয়েকটা দিন। এনজিওগ্রাম করানো হলো হুমায়ূন ভাইয়ের। এক রাত হাসপাতালে থাকতে হবে। কিন্তু ওই একটা রাত একা হাসপাতালে থাকবেন তিনি, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। শিশুর মতো ছটফট করতে লাগলেন, চঞ্চল হয়ে গেলেন। আমরা নানা রকমভাবে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে একটা রাত বেলভ্যুতে রাখতে পেরেছিলাম। চারপাশে বন্ধুবান্ধব ছাড়া তিনি

থাকতেই পারতেন না। একা চলাফেরা করতে পারতেন না। তিনি চলতেন সম্রাটের মতো। চারপাশে আমরা কয়েকজন তাঁর পারিষদ।

হুমায়ূন ভাই, যে জগতে আপনি চলে গেলেন, সেখানে একা একা আপনি কেমন করে থাকবেন? সেখানে তো আপনার পাশে আপনার মা নেই, শাওন নেই, নিষাদ-নিনিত নেই, মাজহার নেই, আমরা কেউ নেই।

আমার ৫০তম জন্মদিনে আমাকে নিয়ে 'প্রথম আলো'তে একটা লেখা লিখলেন হুমায়ূন ভাই, 'কী কথা তাহার সাথে'। (এই নামে 'এনটিভি'তে আমি তখন একটা প্রোগ্রাম করতাম। হুমায়ূন ভাইকে নিতে চেয়েছি, তিনি যাননি। শাওনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।) তাঁর স্বভাব ছিল যেকোনো লেখা লিখলেই সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে সেই লেখা পড়ে শোনাতেন। ওই লেখাটাও পড়তে লাগলেন। আমি বসে আছি তাঁর পাশে। আলমগীর রহমান, মাজহার, আর্কিটেক্ট করিম- আমরা মুগ্ধ হচ্ছি তাঁর লেখায়। আমার মুখে শোনা আমার কিশোর বয়সের এক দুর্দিনের বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। সেই অংশটুকু পড়তে পড়তে আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। কী গভীর ভালো তিনি আমাকে বেসেছেন, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।

কালের কণ্ঠে তিনি বহু লেখা লিখেছেন। শুরু থেকেই। আমি গিয়ে জোর করে তাঁর লেখা নিয়ে আসতাম। একদিন বললেন, দেড়-দুই বছরে কালের কণ্ঠে যত লেখা লিখলাম, জীবনে কোনো পত্রিকায় এত অল্প সময়ে এত লেখা আমি লিখিনি। কেন লিখেছি জানো? তোমার জন্য।

আগরতলায় বেড়াতে গিয়ে পুরনো একটা মন্দির দেখতে গিয়েছি আমরা। পুরোদল। জনা ১০-১২ লোক। সেই মন্দিরের সামনে আদুরে ছেলে যেমন করে অনেক সময় পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বাবাকে, ঠিক সেভাবে দুই হাতে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনেরই গভীর আনন্দিত হাসিমুখ। মাজহার ছবি তুললেন। হুমায়ূন ভাই হাসতে হাসতে বললেন , মনে হলো আমার একটা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের ছেলে আছে।

আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ।

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য তিনি নিউ ইয়র্কে চলে যাওয়ার পর কালের কণ্ঠের সাহিত্য ম্যাগাজিন 'শিলালিপি'তে তাঁকে নিয়ে আমি একটা ধারাবাহিক লেখা শুরু করলাম। 'হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ'।

একটু নতুন আঙ্গিকে লেখা। আমার স্মৃতিচারণা আর তাঁর ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউটা 'অন্যদিন' পত্রিকায় একসময় ছাপা হয়েছিল। সেটাকেই নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা। ১৩ পর্বে লেখাটা শেষ হলো।

নিউ ইয়র্কে বসে হুমায়ূন ভাই একটু রাগলেন। আমাকে নিয়ে একটা লেখা লিখলেন , 'মিলন কেন দুষ্টু'। সেই লেখায় আমাকে মৃদু বকাঝকাও করলেন। তাঁর সম্মানে কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাটা আমি ছেপে দিলাম।

কিছুদিন আগে দুই সপ্তাহের জন্য তিনি দেশে এসেছিলেন। উঠেছিলেন তাঁর প্রিয় নুহাশ পল্লীতে। সেখান থেকে এলেন ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায়। এক রাতে দেখা করতে গেছি। তিনি তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন রুমটায় চেয়ারে বসে আছেন। শাওন আছে পাশে, মাজহার আছে। একপাশে বসে আছেন স্থপতি ও লেখক শাকু র মজিদ। আলমগীর রহমান এলেন, মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা এলো। আমি বসে আছি হুমায়ূন ভাইয়ের পায়ের কাছে। তাঁর মুখটা আর আগের মতো নেই। কালো হয়ে গেছে। মাথার চুল গেছে অনেকটা পাতলা হয়ে। আর শরীরও কেমন যেন ভারী মনে হলো আমার। ওজন কি একটু বেড়েছে ?

দু-চার কথার পর হঠাৎ তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, গভীর মায়াবী গলায় বললেন, ওই লেখাটার জন্য মন খারাপ করেছিলে? বললেন এমন করে, আমি তাঁর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

হুমায়ূন ভাই, বৃহস্পতিবার রাত থেকে আপনার জন্য শুধু আমি নই , পুরো বাংলাদেশ কাঁদছে। অমিত হাবিবের কথা আপনার মনে আছে। কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রজগতের অত্যন্ত মেধাবী যুবক। মাত্র এক রাতে কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিল অমিত। আমিই তাকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাত ১টার দিকে ফোন করে অমিত কাঁদতে লাগল। ফোনের একদিকে আমি কাঁদি, আরেক দিকে অমিত। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ আপনাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে। যে আপনার কাছে গেছে, সে তো বটেই, দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, আপনার লেখা পড়েছে, নাটক-সিনেমা দেখেছে, আপনার লেখা গানগুলো শুনেছে, তারা যেমন ভালো আপনাকে বেসেছে, পৃথিবীর খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এ রকম ভালোবাসা জোটে। আপনি চলে গেছেন, বাংলাদেশ আজ চোখের জলে ভাসছে। আমাদের চারদিক অনেকটাই অন্ধকার। শ্রাবণ দিনে আপনি চলে গেলেন আর আমাদের আকাশ ছেয়ে গেল শ্রাবণ মেঘে। এই মেঘ চোখের জলের বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।

হুমায়ূন ভাই, আপনার মনে আছে, একদিন নুহাশ পল্লীতে ঢোকার মুখে , গেটের বাইরের দিকটায় দুপুরের নির্জনতায় আপনি ও আমি হাঁটছিলাম। আমাদের পায়ের কাছে ফুটে আছে কিছু সাদা রঙের ছোট ছোট বুনোফুল। তেমন গন্ধ নেই। আপনি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন , এগুলো কী ফুল, বলো তো?

প্রথমে আমি চিনতে পারলাম না। আপনি বললেন, বিভূতিভূষণ এই ফুলের কথা অনেকবার লিখেছেন।

বুঝে গেলাম। ভাঁটফুল।

আপনার নুহাশ পল্লীর গেটের কাছে বছর বছর ফুটতে থাকবে ভাঁটফুল , নুহাশ পল্লীর সবুজ মাঠ আরো সবুজ হবে বর্ষার বৃষ্টিতে, আপনার ঔষধি বাগান হয়ে উঠবে বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। নুহাশ পল্লীর ফুলের ঝোপ রঙিন হবে বসন্তকালে , গাছপালায় বইবে চৈতালী হাওয়া, আপনার পুকুরের জলে শ্বাস ফেলতে উঠবে মাছেরা, পাখিরা মুখর হবে সকাল -দুপুর-সন্ধ্যায়। গভীর রাতে দূরে ডাকতে থাকবে দুরন্ত কোকিলেরা। শিউলি ফুলের মতো জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করবে আপনার তৈরি করা এক টুকরো পৃথিবী। শ্রাবণ দিনের বৃষ্টি আপনার শোকে কাতর হবে , নুহাশ পল্লীর মাঠ ভাসবে চোখের জলে, ফুলেরা ভুলে যাবে গন্ধ ছড়াতে, মুখর পাখিরা স্তব্ধ হবে, জ্যোৎস্না রাত ম্লান হবে। দুরন্ত কোকিল আর ডাকতে চাইবে না। আমাদের বইমেলাগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে, প্রকাশকরা হারাবেন উদ্দীপনা। ঈদসংখ্যাগুলো হারাবে জৌলুস। টেলিভিশন পর্দা আলোকিত হবে না আপনার নতুন নাটকে। মাইক্রোবাস ভরে আমরা আর আড্ডা দিতে যাব না নুহাশ পল্লীতে, দখিন হাওয়া মুখর হবে না হাসি -আনন্দে। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

আপনার সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল' ১৬০ পৃষ্ঠার মতো লিখে ড. আনিসুজ্জামান , ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও আমাকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মতামত জেনে লেখা শেষ করবেন। আপনার লেখা দেয়াল উপন্যাসে ওই ১৬০ পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে লিখতে লিখতেই যেন উঠে চলে গেলেন আপনি। টেবিলে অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে আপনার কলম আর সাদা কাগজ।

সাদা কাগজ, তোমাকে কে বোঝাবে হুমায়ূন আহমেদ চলে যাননি। এই তো বাঙালি পাঠকের বুকশেলফগুলোতে রয়ে গেছেন তিনি , টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে রয়ে গেছেন, বাংলাদেশের সিনেমায় রয়ে গেছেন। তাঁর গান রয়ে গেছে সুবীর নন্দী , শাওন আর অন্যান্য শিল্পীর কণ্ঠে। আর তিনি রয়ে গেছেন বাঙালি জাতির অন্তরে।

যে অপার্থিব জগতে আপনি আছেন, সেখানে ভালো থাকুন , আনন্দে থাকুন হুমায়ূন ভাই। পরম করুণাময় আপনাকে গভীর শান্তিতে রাখুক।

কেন হুমায়ূন আহমেদ
বিশ্বজিৎ ঘোষ

জনপ্রিয় একজন লেখকের প্রয়াণে গোটা জাতি যে আবেগসিক্ত হবে, নিমজ্জিত হবে শোকসাগরে- এটা খুবই স্বাভাবিক। নন্দিত লেখক এবং চলচ্চিত্র ও নাটক নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু আমাদের সেকথা আরেক বার স্মরণ করিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কীভাবে ভেঙে পড়েছিল কলকাতা শহর তা

আমরা দেখিনি। তবে বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাসে তার এক নিপুণ ছবি পাওয়া যায়। হুমায়ূনের শবযাত্রা দেখে, শহীদ মিনারে লক্ষ জনতার শোক-বিহ্বলতা দেখে আমার বারবার মনে পড়েছিল বুদ্ধদেবের সেই বর্ণনা। এত মানুষ, এত অশ্রু, এত ভালোবাসা- আমি কখনো দেখিনি। হুমায়ূন আহমেদ তা আমাদের দেখার সুযোগ করে দিলেন।

কেন হুমায়ূন আহমেদ? কী কারণে মানুষের বাঁধ-ভাঙা এই উচ্ছ্বাস, কী কারণে এত শোক অশ্রু ভালোবাসা? একজন লেখকের জন্য এত ভালোবাসার বন্যা তো আগে আমরা কখনো দেখিনি। হুমায়ূন তা দেখাতে পারলেন কোন গুণে? কোন কারণে তার উপন্যাস কিনতে, ছবি দেখতে, নাটক উপভোগ করতে ক্রেতা ও দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়তো? আর কেনই-বা তাকে বলা হতো যাদুকর? এত অশ্রু এত মাতমের মুখেও এসব প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

হুমায়ূনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি এদেশের মানুষকে এদেশের তরুণ-তরুণীকে গ্রন্থমুখী করতে পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। যারা পাঠ করতেন দস্যু বনহুর কিংবা মোহন সিরিজের বই , রোমেনা আফাজ ছাড়া যাদের গত্যন্তর ছিল না, তারা হঠাৎ হাতে পেল নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, জোছনা ও জননীর গল্প- তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো হিমু শুভ্র মিসির আলীরা - আর মুহূর্তেই সবার মন জয় করে নিল হুমায়ূন। তরুণ সমাজকে হুমায়ূন অলৌকিক শক্তি দিয়ে টেনে নিলেন তার গ্রন্থভুবনে- যারা ডাংগুলি খেলত আর আড্ডা দিত গলির মোড়ে- তারা হুমায়ূনের বই পেয়ে অভ্যস্ত হলো পাঠে। বোঝা যায়, একজন লেখকের শক্তির খেলাটা কোথায়?

অন্য একটা দিক থেকেও বিষয়টাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা যায়। হুমায়ূন তার লেখনীর মাধ্যমে একটা জাতীয় রুচি তৈরি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন জাতীয়- সম্পদ। কীভাবে? যদি না থাকতো তার উপন্যাস, তাহলে উৎসাহী পাঠক অন্যের লেখা উপন্যাসের দিকে হাত বাড়াতেন। বিদেশি উপন্যাস বিক্রি হতো- লাগতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সেসব বই আমদানির জন্য। অতএব , এভাবে হুমায়ূন যে অলক্ষ্যে কী কাজটা করে গেছেন, একবার ভেবে দেখা যায় তো। তার বই মুদ্রন -বাঁধাই সে-ও তো এক অর্থনৈতিক কাজ। কত মানুষ জড়িত ছিলেন এই কাজে। কেবল হুমায়ূনের বই মুদ্রন বাঁধাই বিপণন করেই অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি টিকে ছিলেন এই বাংলাদেশে। আজকের এই পণ্যপূজাশাসিত পৃথিবীতে , পণ্যায়নের চোখ দিয়ে বিবেচনা করলে লেখক হুমায়ূন আহমেদের রচনা- সম্ভারের দিকে চোখ বুলালে এভাবে তো একটা মাত্রার কথা বলা যায়।

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্মের একটা বড় জায়গা মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি নানাভাবে নানামাত্রায় তার উপন্যাস-নাটক-চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার

বাহিনীর হাতে শহীদ হন তার পিতা। ওই অভিজ্ঞতাই ওই স্মৃতিই ধারণা করি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিল্পকর্মে তাকে নিয়ত তাড়া দিতো।

উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, চলচ্চিত্রে তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি অখণ্ড ইতিহাস আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। তার এসব শিল্পকর্ম দেখে ও পাঠ করে এদেশের তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পেরেছে, জানতে পেরেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা। সে হিসেবে, কালান্তরে হুমায়ূনের এসব শিল্পকর্ম কেবল শিল্পই থাকবে না, হয়ে উঠবে ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান।

হুমায়ূন আহমেদ খুব সরল ভাষায় উপন্যাস রচনা করতেন। মানুষের হৃদয়ে পৌঁছবার অভূতপূর্ব এক শক্তি ছিল তার। বোধ করি শরৎচন্দ্রও এখানে হার মানবেন তার কাছে। হাস্য-কৌতুক রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে অবলীলায় ঢুকে যেতেন হুমায়ুন আহমেদ। তার নাটক দেখতে বুঁদ হয়ে বসে যেত গোটা জাতি, তার চলচ্চিত্র দেখতে গোটা পরিবার ঢু কতো সিনেমা হলে। মধ্যস্তরের মানুষের মনস্তত্ত্বকে হুমায়ুন আহমেদ তার করতলে নিয়ে খেলতে জানতেন, খেলাতে পারতেন। তার কৌতুক নির্মল , তার হাস্যরস অমল মধুর। এই নির্মল অমল- মধুর হাস্যরসজ্ঞানই, আমার বিবেচনায়, তার সৃষ্টিকে এতটা জনপ্রিয় করেছে। পাঠকচিত্তে তিনি সঞ্চার করেন মঙ্গলচেতনা, তাদের করে তোলেন মানবতামুখী। পাঠকের সামনে মঙ্গলের বার্তাবহ কল্যাণের প্রতীক হয়ে হাজির হয় হুমায়ূনের হিমু শুভ্র মিসির আলীরা। তার পাঠকেরাই হয়ে ওঠে একজন হিমু, একজন শুভ্র, কিংবা অনেক জন মিসির আলী। সৃষ্টিকর্মে কল্যাণ মঙ্গল আর মানবতার কথা বলেন বলে হুমায়ূনের রচনা, তার নির্মাণ পাঠক-দর্শকের কাছে লাভ করে এত সহানুভূতি , এত ভালোবাসা!

আখ্যান বর্ণনায় হুমায়ূন তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজস্ব একটা ঢং, বৃত্তান্ত বয়ানে তিনি আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র একটা কৌশল। ঢং আর কৌশলটা এতটাই সম্মোহনী ছিল যে, দুই শতাধিক উপন্যাস লিখেও সেখান থেকে তিনি বের হতে পারেননি, কিংবা বের হতে চাননি। একবার, মাত্র একবার, প্রবল পরাক্রম নিয়ে স্বরচিত ওই ঢং আর কৌশল ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্রষ্টা হুমায়ুন আহমেদ জোছনা ও জননীর গল্প উপন্যাসে। আবেগের এই মুহূর্তে বেদনার এই সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়েও আমি বলবো , জোছনা ও জননীর গল্প উপন্যাসের জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নয়, হুমায়ূন আহমেদ টিকে যাবেন বাংলাভাষী পাঠকের কাছে। এ উপন্যাসে হুমায়ূন ইতিহাসকে দান করেছেন উপন্যাস- অবয়ব। জোছনা ও জননীর গল্প উপন্যাসে হুমায়ূন ইতিহাস ও কল্পনার আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে শিল্প সৃজনে ঈর্ষণীয় সি দ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার সত্যের জৈব ঐক্য মিলনই আলোচ্য উপন্যাসের শৈল্পিক

সার্থকতার প্রধান শক্তি-উৎস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত মহাকাব্যিক এই উপন্যাসটিই হুমায়ূন আহমেদকে অনাগতকাল ধরে পাঠকের কাছে বাঁচিয়ে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

হুমায়ূন আহমেদ নিবেদিত প্রাণ লেখক। লেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরিও তিনি অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছেন, সৎ থাকতে চেয়েছেন নিজের কাছে সমাজের কাছে। মাঙ্গলিকচেতনা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা হুমায়ূনের সৃষ্টিকর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। এমন সৎ ও দায়বদ্ধ লেখকের মৃত্যু সব সময়ই অকাল মৃত্যু। গোটা একটি প্রজন্ম তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ , গোটা জাতি মাতমবিহ্বল, একজন লেখকের এ প্রাপ্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। পাঠকের হৃদয়েই যে বেঁচে থাকেন জেগে থাকেন লেখক, হুমায়ূনের মৃত্যু সে-কথাই আমাদের পুনর্বার জানান দিয়ে গেল।

আমার মা
হুমায়ূন আহমেদ

আমার মা ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম সন্তান। শ্যামলা ধরনের একহারা গড়নের মেয়ে। অতি আদরের মেয়ে। কেমন করে জানি সবার ধারণা হলো, এই মেয়ে তেমন বুদ্ধিমতী হয়নি। তাঁকে বুদ্ধিমতী বানানোর জন্য ছোট বয়সেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো বারহাট্টায়। বারহাট্টায় আমার মা'র মামার বাড়ি। মা'র নানিজান অসম্ভব বুদ্ধিমতী। তিনি যদি ট্রেনিং দিয়ে এই মেয়েকে কিছুটা মানুষ করতে পারেন।

তাঁর ট্রেনিংয়ে তেমন কাজ হলো না। মা'র বুদ্ধি বিশেষ বাড়ল না। তবে ক্লাস টুতে তখন সরকারি পর্যায়ে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হতো। মা এই পরীক্ষা দিয়ে মাসে দুই টাকা হারে বৃত্তি পেয়ে চারদিকে চমক সৃষ্টি করে ফেললেন। একি কাণ্ড! মেয়েমানুষ সরকারি জলপানি কী করে পায় ?

মা'র দুর্ভাগ্য, বৃত্তির টাকা তিনি পাননি। কারণ তাঁকে উপরের কোনো ক্লাসে ভর্তি করানো হলো না। মেয়েদের পড়াশোনার দরকার কি! চিঠি লিখতে পারার বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়েমানুষের এত চিঠি লেখালেখিরই বা কি প্রয়োজন ? তারা ঘর-সংসার করবে। নামাজ-কালাম পড়বে। এর জন্য বাংলা-ইংরেজি শেখার দরকার নেই। তারচেয়ে বরং হাতের কাজ শিখুক। রান্নাবান্না শিখুক , আচার বানানো শিখুক, পিঠা বানানো শিখুক। বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

আমার মা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এসব কাজ অতি যত্নের সঙ্গে শিখতে লাগলেন। তা ছাড়া নানিজান প্রতি বছর একটি করে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিয়ে ঘর ভর্তি করে ফেলছেন। তাঁর সর্বমোট বারোটি সন্তান হয়। বড় মেয়ে হিসেবে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার কিছু দায়িত্বও মা 'র ওপর চলে আসে।

এই করতে করতে একদিন তাঁর বয়স হয়ে গেল পনেরো। কি সর্বনাশের কথা! পনেরো হয়ে গেছে এখনো বিয়ে হয়নি! বারহাট্টা থেকে কঠিন সব চিঠি আসতে লাগল, যেন অবিলম্বে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হয়। চারদিকে সুপাত্র খোঁজা চলতে লাগল। একজন সুপাত্রের সন্ধান আনলেন মায়ের দূরসম্পর্কের চাচা , শ্যামপুরের দুদু মিয়া। দুদু মিয়াও পাগল ধরনের মানুষ। বিএ পাস করেছেন। দেশ নিয়ে মাথা ঘামান। কী করে অশিক্ষিত মূর্খ মুসলমানদের রাতারাতি শিক্ষিত করা যায় , সেই চিন্তায়ই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। শ্যামপুরের অতি দুর্গম অঞ্চলে তিনি ইতিমধ্যে একটা স্কুল দিয়ে ফেলেছেন। সেই স্কুলে একদল রোগাভোগা ছেলে সারা দিন স্বরে অ, স্বরে আ বলে চেঁচায়। যে মানুষটি এসব কর্মকাণ্ডের মূলে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর খুব আস্থা রাখা যায় না। তবু আমার নানাজান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয় :

ছেলে কী করে?

কিছু করে না। করার মধ্যে যা করে তা হলো ন্যাশনাল লাইব্রেরি তে বসে সারা দিন বই পড়ে।

তুমি তাকে চেন কী করে?

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে কলকাতার এক মেসে ছিলাম। তাকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বাড়ির অবস্থা কী?

বাড়ির অবস্থা শোচনীয়।

ছেলের নামকরা আত্মীয়স্বজন কে আছেন?

কেউ নেই। সবাই হতদরিদ্র। তবে ছেলের বাবা উলা পাস। বড় মৌলানা_অতি সজ্জন ব্যক্তি।

অতি সজ্জন ব্যক্তি দিয়ে কাজ হবে না। ছেলের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখছি না। রাতদিন যে ছেলে বই পড়ে সে আবার কেমন ছেলে? বই পড়লে তো সংসার চলে না।

দুদু মিয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এত ভালো ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি। এইটুক বলতে পারি।

দেখতে কেমন?

রাজপুত্র!

কী বললে?

রাজপুত্র!

ছেলে দেখতে রাজপুত্রের মতো, শুধু এই কারণেই নানাজান ছেলের বাবার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আমার দাদা মৌলানা আজিমুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবি-ফারসিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অতি বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি হাত তুলে যে প্রার্থনা করেন তার থেকে মানুষটির চরিত্র স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন _

"হে পরম করুণাময়, আমার পুত্র-কন্যা এবং তাদের পুত্র-কন্যাদের তুমি কখনো অর্থবিত্ত দিও না। তাদের জীবনে যেন অর্থকষ্ট লেগেই থাকে। কারণ টাকা-পয়সা মানুষকে ছোট করে। আমি আমার সন্তান - সন্ততিদের মধ্যে 'ছোট মানুষ' চাই না। বড় মানুষ চাই।"

আমার দাদার চরিত্র আরো স্পষ্ট করার জন্য আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কেমন করে যেন পরীক্ষায় খুব ভা লো করে ফেলি। পাঁচটি লেটার নিয়ে বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যাই। টেলিগ্রামে দাদাকে এই খবর পাঠানো হয়। যে পিওন দাদাকে টেলিগ্রামটি দেন দাদা তাঁকে বসতে বলেন।

পিওন বসে আছেন। দাদা ভেতরবাড়ি চলে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, শোকরানা নামাজ পড়ার জন্য খানিক বিলম্ব হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভাই, আমি অতি দরিদ্র একজন মানুষ, এই মুহূর্তে আমার কাছে যা টাকা -পয়সা ছিল সবই আমি নিয়ে এসেছি। আপনি এই টাকা গ্রহণ করলে আমি মনে শান্তি পাব। কারণ আজ যে খবর আপনি আমাকে দিলেন এত ভালো খবর এই জীবনে আমি পাই নাই।

এই বলে দাদা নগদ টাকা এবং ভাঙতি পয়সায় প্রায় ৪০ টাকা একটা রুমালে বেঁধে বিস্মিত পিওনের হাতে দিলেন। শুধু তাই না, বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি খুব খুশি হবো আপনি যদি দুপুরে চারটা ডালভাত আমার সঙ্গে খান।

তার কিছুদিন পরেই আমি দাদার একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখলেন _'তোমাকে ছোটবেলায় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি জবাব দিতে পার নাই। আমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি তেমন নাই। আজ তুমি তা ভুল প্রমাণিত করিয়াছ। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই সময়ে তোমার কারণে মনে প্রবল সুখ পাইলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তুমি সুখী করিয়াছ_আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ সবাইকে সবার প্রাপ্য দেন।'

যে প্রশ্নটির জবাব শৈশবে দিতে পারিনি সেটা বলি। তখন ক্লাস টুতে পড়ি। সিলেটের বাসায় দাদা বেড়াতে এসেছেন। অসহ্য গরম। হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'এই শোন, পাখার ভেতর তো বাতাস ভরা নেই। তবু পাখা নাড়লেই আমরা বাতাস পাই কিভাবে ? বাতাসটা আসে কোত্থেকে?'

আমি সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, আমার ধারণা ছিল তুই পারবি। তুই তো আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।

প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি_আবার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

ছেলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে শুধু ছেলের বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই নানাজান একজন বেকার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন।

মেয়েকে 'বিবাহিত জীবন কী' তা বোঝানোর জন্য বর্ষীয়ান মহিলারা দূর দূর থেকে নাইওর চলে এলেন। নকশি পিঠা তৈরি হয়ে টিনবন্দি হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় হাতে গড়া সেমাই তৈরি করতে করতে পাড়ার বৌ'রা মিহি গলায় বিয়ের গীত গাইতে লাগল।

নানাজান কী মনে করে চলে গেলেন ময়মনসিংহে। ছেলে নাটক-নভেল পড়ে, মেয়েকেও তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দু-একটা নাটক-নভেল পড়া থাকলে মেয়ের সুবিধা হবে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন, ভালো একটা নভেল দিন তো। আমার মেয়ের জন্য_বুঝেশুনে দেবেন।

লাইব্রেরিয়ান গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েছেলেকে নাটক-নভেল বই দেওয়া ঠিক না, একটা ধর্মের বই নিয়ে যান_তাপসী রাবেয়া।

জ্বি না, একটা নভেলই দেন।

দোকানদার একটা বই কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল। নানাজান মায়ের হাতে সেই বই তুলে দিলেন। মা 'র জীবনে এটাই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের নাম 'নৌকাডুবি'। লেখক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম উপন্যাস পড়েই মা মোহিত। একবার, দুবার, তিনবার পড়া হলো, তবু যেন ভালোলাগা শেষ হয় না।

বাসর রাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো বই-টই পড়েছ? এই ধরো, গল্প-উপন্যাস।

মা লাজুক ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

দুই-একটা বইয়ের নাম বলতে পারবে?

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, নৌকাডুবি।

গভীর বিস্ময়ে বাবা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারলেন না। এই অজপাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ে কি-না রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পড়ে ফেলেছে!

সেই রাতে বাবা-মা'র মধ্যে আর কি কথা হয়েছে আমি জানি না। জানার কথাও নয়। তাঁরা আমাকে বলেননি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ আমি এবং আমার অন্য পাঁচ ভাইবোন তো তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। লুকিয়ে ছিলাম তাঁদের ভালোবাসায়।

গ্রামের যে বোকা ধরনের মেয়ে বিয়ের পর শহরে চলে এলো, আমার ধারণা সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই একজন। আমি এখনো তাঁর বুদ্ধির ঝলকে চমকে চমকে উঠি। মা শুধু যে বুদ্ধিমতী তাই না , অসম্ভব সাহসী এবং স্বাধীন ধরনের মহিলা।

১৬ ডিসেম্বরের পর মা আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। এই অবস্থায় পুরানা পল্টনে বাড়ি ভাড়া করলেন। আমাদের সবাইকে একত্র করে বললেন , তোরা তোদের পড়াশোনা চালিয়ে যা। সংসার নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে আমাদের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমুতাম। কেউ বেড়াতে এলে তাকে মেঝেতেই বসতে হতো।

মা নানান সমিতিতে ঘুরে ঘুরে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করলেন। দিনরাত মেশিন চালান। জামা -কাপড় তৈরি করেন। সেলাইয়ের রোজগারের সঙ্গে বাবার পেনশনের নগণ্য টাকা যুক্ত হয়ে সংসার চলত। তিনি শুধু যে ঢাকার সংসার চালাতেন তাই না , মোহনগঞ্জে তাঁর বাবার বাড়ির সংসারও এখান থেকেই দেখাশোনা করতেন। অনেককাল আগে গ্রামের এই বোকা বোকা ধরনের লাজুক কিশোরী মেয়েটি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি কী কঠিন সংগ্রামময় জীবন অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। যুদ্ধক্লান্ত এই বৃদ্ধা এখন কী ভাবেন আমি জানি না। তাঁর পুত্রকন্যারা না নানভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে। তিনি তাদের সে সুযোগ দিতে চান না। আমার ছোট ভাই ড. জাফর ইকবাল আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে লিখল_মা, আপনি আসুন, আপনাকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাব । আপনার ভালো লাগবে।

মা বললেন, যে জিনিস তোমার বাবা দেখে যেতে পারেননি, আমি তা দেখব না।

আমি বললাম, আম্মা, আপনি কি হজে যেতে চান? যেতে চাইলে বলুন, ব্যবস্থা করি।

না।

ছোটবেলায় দেখেছি আপনি জরি দিয়ে তাজমহলের ছবি এঁকেছিলেন। তাজমহল দেখতে ইচ্ছা করে?

না। আমি একা একা কিছু দেখব না।

বাবা যেসব জিনিস খেতে পছন্দ করতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোনোদিন সেই খাবার বাসায় রান্না করেননি। সেই সব খাবারের একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে গরুর গোশত। আর একটি বরবটির চচ্চড়ি। আহামরি কোনো খাবার নয়।

আমি একবার বললাম, আমাদের জন্য আপনার কি কোনো উপদেশ আছে?

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, উপদেশ নয়, একটি আদেশ আছে। আদেশটি হচ্ছে_কেউ যদি কখনো তোমাদের কাছে টাকা ধার চায় তোমরা 'না' বলবে না। আমাকে অসংখ্যবার মানুষের কাছে ধারের জন্য হাত পাততে হয়েছে। ধার চাওয়ার লজ্জা এবং অপমান আমি জানি।

(অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি) মা'র অসাধারণ ইএসপি বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল। প্রায় সময়ই ভবিষ্যতে কী ঘটনা ঘটবে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন। মা'র এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। মা'কে তিনি ঠাট্টা করে ডাকতেন 'মহিলা পীর'। মা'র এই ক্ষমতা বাবার মৃত্যুর পরপরই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।*

* 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর কী মনে করে জানি মা আমেরিকা যেতে রাজি হলেন। ছয় মাস সেখানে কাটিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে আমাকে বললেন , হজ করতে চান।

আয়েশা ফয়েজের আত্মজীবনীর অংশ
জীবন যে রকম

কাজল

বাচ্চার নাম রাখা হলো কাজল। কাজলের জন্মের খবর জানিয়ে তার বাবাকে টেলিগ্রাম করা হলো পরদিন ভোরে। তার তখন খুব কাজের চাপ , আসতে পারল না। অন্যেরা এলো।

আমার নানি এসে কাজলকে মানুষ করার কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে নানা রকম গাছগাছালির পাতা ছেঁচে রস, মধু আর একটুকরো লোহা তার সাথে গরম করে সেই তরলটুকু খাইয়ে দিলেন। তারপর খানিকটা শর্ষের তেল, নিজে ঘানি থেকে ভেঙে এনেছেন। বিদঘুটে সেই জিনিস খেয়ে কাজলে র সে কি চিৎকার! আমি বাচ্চা মানুষ করা নিয়ে কত বই পড়ে রেখেছি , কোথাও তো এসব দেখিনি! কাজলের

চিৎকার দেখে বুকটা ভেঙে যাবার অবস্থা , এক সময় না পেরে বলেই ফেললাম, নানিজান এসব খাওয়ানো ঠিক না।

নানি চোখ কপালে তুলে বললেন , কেন?

বাচ্চা কষ্ট পায়।

শুনে নানির সে কি হাসি, চিৎকার করে বললেন, তোমরা শুনে যাও, আমার নাতনি কী বলে। আমি নাতির ঘরে পুতি দেখছি আর আমি নাকি বাচ্চা মানুষ করতে জানি না!

শুনে সবার সে কি হাসাহাসি। আমি আর কী করি, মুখ ভার করে সরে গেলাম। শুধু যে কাজলের ওপর অত্যাচার তাই না, আমার উপরেও অত্যাচার। ঠাণ্ডা পানি খেতে পারব না, গরম পানি খেতে হবে। তাও একদিন, দুদিন নয়, পুরো চল্লিশ দিন। সাথে আতপ চালের নরম ভাত , ঘি আর আলু সেদ্ধ আদা দিয়ে মেখে। রাতের খাওয়া সেরে নিতে হতো সন্ধ্যার আগে, কবুতর না হয় মুরগির বাচ্চা আলাদা করে রান্না করা হতো আমার জন্য। রাতে শুধু দুধ। তার ওপর ছিল সেঁকা। আমার জন্যে সেঁক, কাজলের জন্যে সেঁক। কাজলের নাভি পড়ার আগে এক রকম সেঁক, নাভি পড়ার পর আবার অন্য রকম সেঁক।

কাজলের বয়স যখন নয়দিন তখন নাপিত এলো তার মাথা কামানোর জন্য। মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে সেটি নাকি নাপাক, মাথায় রাখা ঠিক না। নাপিত এলে তাকে পান খেতে দেয়া হলো। নাপিত নতুন ধুতি পরে পান খেয়ে মুখ লাল করে চুল কামাতে বসে। তার সাথে সবার রসিকতার সম্পর্ক , ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ক্ষুর চালিয়ে কাজলের মাথা ন্যাড়া করার সময় তার কোচ খুলে তাকে রাজ্যের জিনিস বেঁধে দেয়া হয়েছে। সে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না, তাই দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি! কাজ শেষ হলে নাপিতকে ডালা ভরা চাল, পান, সুপারি আর একটা রুপার টাকা দিয়ে বিদেয় করা হলো। তখন আমি কাজলকে নিয়ে ঘর থেকে বের হবার অনুমতি পেলাম। সবাই মিলে আমাকে সাজিয়েছে , কাজলকে সাজিয়েছে আরো বেশি, আমি যাচ্ছি আর আমার সামনে ধানের খই ছিটিয়ে দিচ্ছে সবাই।

রাতে আরো বড় হৈ চৈ। ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া করে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হলো। ঘরে দোয়া-কালাম লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ রাত বারটায় ফেরেশতারা কাজলের ভাগ্য লিখতে আসবেন। ভুল করে আবার যদি ভূত-প্রেত এসে পড়ে তখন? আমার শাশুড়ির দেখাদেখি এখানেও তৈরি হয়েছে ভূতের ঝাড়ু, সেটাও ঝুলছে এক কোণায়। ভূত-প্রেতের সাধ্যি কি ভেতরে ঢুকে!

রাত বারটায় আমি জেগে আছি। কপালে ভাগ্য লিখছেন ফেরেশতারা। আহা, ভালো কিছু যেন লিখে দেয় আমার সোনার কপালে।

শামসুর রহমান

কাজলের বাবা বাচ্চা দেখতে আসার সুযোগ পেল এক মাস পর। তার খুব মেয়ের শখ ছিল। আমার ছোটভাই নজরুল তখন সিলেটে থেকে পড়াশোনা করত। তাকে বলে রেখেছিল দেশ থেকে টেলিগ্রাম এলে অফিসে নিয়ে যেতে। যদি ছেলে হয় সে পাবে দশ টাকা, সাথে রংমহলে একটা সিনেমা। যদি মেয়ে হয় তাহলে পাবে বিশ টাকা আর রংমহলে দুইটা সিনেমা!

কাজলের বাবা মোহনগঞ্জে পেঁৗছাল রাতের ট্রেনে। সবাই স্টেশনে হাজির। বাড়ির বৌ-ঝিরাও সবাই জেগে নতুন বাবা তার বাচ্চাকে দেখে কী করে দেখবে। সবার ধারণা ছিল হয়তো একটু লজ্জা পাবে , মুখ ফুটে বেশি কিছু বলবে না। কিন্তু কিসের লজ্জা। বাড়ি পেঁৗছেই আমার মাকে বলল , আম্মা, কোথায় বাচ্চা দেখান তাড়াতাড়ি।

আমার নানি সাবধানে কাজলকে তার হাতে তুলে দিলেন , অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে তার সে কি আদর!

দেখে আমার নানির সে কি হাসি!

নানি তার পরদিন বাড়ি চলে গেলেন। দুদিন পর খবর পেলাম কলেরা হয়ে আমার ছোট মামা আর নানি মারা গেছেন।

সে রাতে অবশ্যি বাড়িতে আনন্দ আর হৈ চৈ। জামাইকে ঘিরে সবাই বসে আছে, গল্প-গুজব হচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতে প্রায় রাত শেষ হবার অবস্থা। আমার সাথে যখন প্রথম নিরিবিলি দেখা হলো , প্রথমেই বলল, কাজলের ভাগ্য গণনা করে ফেলেছি!

কী ভাবে করলে?

বইপত্র কিনে পড়াশোনা করেছিলাম।

কী আছে ভাগ্যে?

অনেক বিখ্যাত হবে তোমার ছেলে! জান রানী এলিজাবেথের ছেলে আর তোমার ছেলের জন্ম একই দিনে, একই লগ্নে?

আমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলাম , কোথায় রানী এলিজাবেথ আর কোথায় আমি!

কাজলের বাবা গম্ভীর হয়ে বলল, রানীর ছেলে বিখ্যাত হবে বাবা-মায়ের নামে, আর আমার ছেলে বিখ্যাত হবে তার নিজের যোগ্যতায়! তুমি দেখে নিও।

তখন তার কথা বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিইনি। সব বাবা-মাই তো ভাবে তার ছেলে অনেক বড় হবে, সেটা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তার বলার ধরনটি ছিল অন্য রকম, কেমন জানি বিশ্বাস নিয়ে বলত। আজ সত্যিই তার ছেলে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পী হয়ে পরিচিত, দুঃখ সেই মানুষ সেটি দেখে যেতে পারল না।

কাজলের বাবার ছুটি ছিল অল্প কয় দিনের, সে চলে গেল দুদিন পরেই। আমি সিলেট ফিরে গেলাম যখন কাজলের বয়স আড়াই মাস তখন। যাবার সময় কয়দিন শ্বশুরবাড়ি থেকে গেলাম, সেখানে আবার সেই একই রকম আনন্দ-উৎসব! আমার এক চাচাশ্বশুর কাজলকে দেখে বললেন, বলেছিলাম না ছেলে হবে? এই বংশে বার সিঁড়ি প্রথম সন্তান ছেলে।

শাশুড়ি বললেন, বউমা, তুমি ছেলের মুখের দিকে বেশি তাকাবে না। নজর লেগে যাবে তাহলে। বাবা -মায়ের নজর কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাগে। ফয়জুর রহমানকেও না করবে। সে তো কোনো কথা শোনে না , দুই পাতা বই পড়ে মনে করে দুনিয়ার সব কিছু জেনে গেছে।

আমার বাবা আর শ্বশুর আমাকে সিলেট পেঁৗছে দিলেন। দুজনের খুব খাতির ছিল। কোনো সুযোগ পেলেই একসাথে বের হয়ে পড়তেন! বাড়ি ফিরে যাবার আগে দুজনে অনেক চিন্তাভাবনা করে কাজলের ভালো নাম রাখলেন শামসুর রহমান।

তারা চলে যাবার পরপরই কাজলের বাবা কী ভেবে তার নাম পাল্টে রেখে ফেলল হুমায়ূন আহমেদ। ভাগ্যিস রেখেছিল তা না হলে সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পীকে আলাদা করতে হতো একটি মাত্র আকার দিয়ে! একজন হতেন কবি শামসুর রাহমান , আরেকজন হতো কথাশিল্পী শামসুর রহমান!

আমার শাশুড়ি অবশ্যি কখনোই হুমায়ূন নামটাকে গ্রহণ করেননি। শেষদিন পর্যন্ত আমাকে ডেকে গেছেন শামসুর মা!

ইকবাল

আমার মেজো ছেলের জন্ম হয় সিলেটের মীরাবাজারে। ডিসেম্বর মাসের এক ভোরে, সকাল ৬টা সাড়ে বাইশ মিনিটে। কাজলের বাবার ডায়রিতে এই নিখুঁত সময়টি লেখা ছিল , কীভাবে এই নিখুঁত সময়টি বের করেছে আমার জানা নেই।

এর আগে দুই সন্তানই হয়েছে বাবার বাড়িতে, অসংখ্য লোক ছিল আশপাশে। এবার নিজেদের লোক নেই, বন্ধুবান্ধব এবং কাদম্বিনী নার্স। সেই নার্স জন্মের পর তাকে ধুয়েমুছে তার বাবার হাতে তুলে দিল , বাবা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল তার ছেলের দিকে।

ছেলে জন্মালে আজান দিতে হয় (মেয়ে হলে কেন নয়?) তাই তার চাচা আজীজ বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিল। আজান শুনে বুঝতে কারো বাকি নেই , ছুটে এলো সবাই। বাচ্চাকে দেখে কারো আর আশ মেটে না, ধবধবে গায়ের রং, বড় বড় হাঁসের ডিমের মতো চোখ, নাদুস-নুদুস চেহারা।

খরব পেয়ে আমার বাবা এলেন, শ্বশুর এলেন। দুজনেই নাতিকে দেখে মহা খুশি। শ্বশুর বললেন , আমি বুঝেছিলাম তোমার ছেলে হয়েছে , তোমার শাশুড়ি স্বপ্নে দেখেছে আকাশে মস্ত এক চাঁদ উঠেছে, তখন বুঝেছি তোমার নিশ্চয়ই একটা ছেলে হয়েছে।

শ্বশুর যাবার আগে আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, মনে আছে তো আমি খোদার কাছে ধন চাই নাই, শুধু জন চেয়েছি। এই দেখ খোদা জন দিছে। দোয়া করি এরা মানুষ হোক।

আজীজ বাচ্চাদের খুব আদর করত। সে অনেক ভাবনাচিন্তা করে ছেলের নাম রাখল ইকবাল আহমেদ। বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ, মেজো ছেলে ইকবাল আহমেদ, কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তখন হঠাৎ কাজলের বাবা নিউমারোলজিতে ঝুঁকে পড়ল। কাগজে আঁকিবুঁকি করে , হিসাবপত্র করে বলল, না, নাম ঠিক হয় নাই। নাম পাল্টাতে হবে।

আমি বেঁকে বসলাম, ইকবাল নামটা আমার পছন্দ, কিছুতেই পাল্টাতে দেব না।

অনেক হিসাবপত্র করে সে নামটা ইকবাল আহমেদ থেকে পাল্টে করে দিল জাফর ইকবাল। আমি ডাকি ইকবাল।

বড় দুজন জন্ম থেকে দুরন্ত, সে তুলনায় ইকবাল খুবই শান্ত। আমার ধারণা ছিল দুজন চালাক -চতুর বাচ্চার পর সে হয়তো একটু বোকাই বের হয়েছে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। বড় দুজনকে যখন জোর করে পড়াতে বসাই সে কাছে চুপ করে বসে থেকে দেখে। একদিন দেখি সে নিজেও বই নিয়ে বসেছে, ভাবলাম ছেলেমানুষি শখ , পড়ার ভান করবে। হঠাৎ দেখি পড়ার ভান নয়, সত্যিই পড়ে যাচ্ছে। তাকে তখনো কোনো অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়নি। নিজে নিজে পড়া শিখে গেছে। বুঝলাম ছেলেটা চুপচাপ হতে পারে , তবে বোকা নয়!

একবার কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম , কি রে, তুই কথা বলিস না কেন?

চার বছরের বাচ্চা গম্ভীর হয়ে বলল, বেশি কথা বলে কী লাভ?

শুনে তার আব্বার সে কি হাসি!

কাজল ছেলেবেলা দুষ্টুমি করে কাটিয়ে একটু বড় হয়ে পড়ায় মন দিয়েছে। ইকবাল ছেলেবেলা থেকেই মনোযোগী। পড়াশোনায় ভালো, সারাজীবনই বৃত্তি পেয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর সর্বস্ব হারিয়ে আবার যখন নতুন করে জীবন শুরু করেছি সে তখন আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। প্রাইভেট টিউশনি করেছে, খবরের কাগজে কার্টুন এঁকেছে, টেলিভিশনে বিজ্ঞানের ওপর অনুষ্ঠান করেছে। এমএসসি পাস করার পরের দিন সে আমেরিকা চলে গেল পিএইচডি করতে, তার প্লেনের ভাড়াটাও আমাকে দিতে হয়নি, তার ছেলেবেলার বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছে।

শাহীন

আমার তৃতীয় ছেলের জন্মের পরপরই আমরা সিলেট ছেড়ে চলে যা ই দিনাজপুরের এক প্রান্তে, জগদল নামে একটা নির্জন জায়গায়। মানুষজন নেই , চারদিকে আমবাগান, তার মাঝে বিশাল এক প্রাচীন জমিদার বাড়ি, সেখানে থাকি। বাসায় একজন পুরনো বাসিন্দা রয়ে গেছে , জমিদারের এক সম্ভ্রান্ত কুকুর। প্লেটে করে না দেয়া পর্যন্ত সে কিছু খেত না , এ ধরনের বড়লোকি হাবভাব থাকলেও কুকুরটি ছিল ভালো। আমার সবচেয়ে ছোট ছেলেটার প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেটা একবার একটা সাপকে কামড়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাপের কামড়ে মুখে ঘা হয়ে পাগল হয়ে যাবার জন্য এই সম্ভ্রান্ত কুকুরটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল।

ছোট ছেলের নাম রাখা হলো শাহীন। তখন বিজ্ঞানী কুদরতে খোদা পাঠশালা থেকে পার্টেক্স বের করে অনেক নাম করেছেন, কাজলের বাবা তার নামানুসারে শাহীনের ভালো নাম রাখল কুদরতে খোদা। দীর্ঘদিন পর ছেলেমেয়ে বড় হয়ে নামটি নিয়ে আপত্তি করল, যার নাম রাখা হয়েছে তিনি নমস্য ব্যক্তি কিন্তু তার নামটি প্রাচীনকালের, এ যুগে হাল ফ্যাশনের নাম দরকার। শাহীন যখন ক্লাস ফোরে পড়ে তখন তার নাম আবার পাল্টানো হলো, এবারে নাম ইবনে ফয়েজ মুহম্মদ আহসান হাবীব , যার অর্থ ফয়েজের পুত্র আহসান হাবীব। কাজলের আব্বার মাথায় তখন ইবনে ফয়েজ শব্দ দুটি ঘুরছে , অন্যদের নামের আগেও সেটা জুড়ে দিতে চাইছিল, কিন্তু তখন তারা বেশি বড় হয়ে গেছে তাই রাজি হলো না! শাহীনের নাম তো দীর্ঘদিন ছিল ইবনে ফয়েজ মুহম্মদ আহসান হাবীব। ঠিক বলতে পারব না কোনো এক সময়ে সে ইবনে ফয়েজ ছেড়ে ফেলে নিজেই তার নাম সংক্ষিপ্ত করে আহসান হাবীব করে ফেলেছে!

আমার এই ছেলেটি অন্যদের থেকে বেশি কষ্ট করেছে। স্বাধীনতার পর অভিভাবকহীন সংসারে নিজে খুঁজে খুঁজে স্কুল বের করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মাঝে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়

গিয়েছে, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তুলেছে, বাজার করেছে_এর মাঝে আবার পড়াশোনা করে মানুষ হয়েছে! ছোট ছেলে হলে তাদের অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। একটা উদাহরণ দিই।

আমরা তখন বাবর রোডে থাকি, দিন-দুপুরে একটা চোর ধরা পড়েছে। চোর ধরা পড়লে তাকে শক্ত মার দেয়া হয়। নিচে বেঁধে তাকে অমানুষিকভাবে পেটানো হচ্ছে। আমাদের নিচের তালায় একজন মেজর থাকতেন, তিনি খানিকক্ষণ পিটিয়ে এসে আমাকে বললেন, বুঝলেন খালাম্মা, সকালে ডেইলি দুইটা করে ডিম খাই, আমি পর্যন্ত কাবু করতে পারলাম না, টায়ার্ড হয়ে গেলাম!

অসহনীয় দৃশ্য! আমি ছুটে গিয়ে অনেক বলে সবাইকে থামালাম, চোর চুরি করে থাকলে তাকে থানায় দিতে হবে, নিজেরা কেন এত অমানুষের মতো তাকে মারধর করবেন? আমার কথায় শেষ পর্যন্ত সবাই থামল। এখন চোরকে থানায় দিতে হবে।

থানায় ফোন করা হলো। কিন্তু পুলিশ বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদের এ ছিঁচকে চোর নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। বলল থানায় নিয়ে আসতে।

থানায় নিয়ে যাবার কথা শুনে একজন একজন করে সবাই কেটে পড়ল, কাজেই ভার পড়ল আহসানের ওপর। ছোট ছেলে হবার এই হচ্ছে যন্ত্রণা!

চোরকে পিটিয়ে রক্তারক্তি করে ফেলেছে। থানায় নেয়ার আগে তাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আহসান তাকে নিয়ে রওনা দিল হাসপাতালে। একটা রিকশা ডেকে থামানো হলো, চোর উদাস গলায় বলল, রিকশা? ভাই, আমি তো স্কুটার ছাড়া যাতায়াত করি না!

আহসান তো চোরের মর্যাদার হানি করতে পারে না, তাকে স্কুটারে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল আমি জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছিল কিনা আমার জানা নেই।

আহসানও তার অন্য ভাইবোনের মতো ছবি আঁকতে পারে। আর্ট কলেজে পড়েনি, কিন্তু ঘরে বসে ছবি আঁকতে আঁকতেই বেশ ছবি আঁকা শিখে গেছে। আজকাল সে চমৎকার কার্টুন আঁকে, এমনিতে উন্মাদ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক। ব্যাংকের ভালো চাকরি পেয়েছিল, করতে রাজি হলো না। দশটা-পাঁচটা গৎবাঁধা জীবন তার ভালো লাগে না!

একান্ত সাক্ষাৎকারে আয়েশা ফয়েজ

আমার ছেলেদের লেখক হতে আলাদা কোনো পরিবেশ লাগেনি

দেশের শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিজগতের তিন নক্ষত্র হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও আহসান হাবীব। তিন ছেলে বিখ্যাত হওয়ার আগে মা আয়েশা ফয়েজকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছে এই শহীদ পরিবার। পুলিশ অফিসার স্বামী ফয়জুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আয়েশা ফয়েজের জীবনসংগ্রামের কথা, তিন ছেলের লেখক হয়ে ওঠার খণ্ডস্মৃতি এবং আত্মজীবনী লেখার পটভূমি উঠে এসেছে একান্ত সাক্ষাৎকারে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তায়েব মিল্লাত হোসেন

[২০০৮ সালের কথা। তখনো গণমাধ্যমে আমাদের বন্ধুমহলের অবস্থান তেমন শক্ত হয়নি। আবার পেশার চাপে বৈষয়িক জ্ঞানও পেকে ওঠেনি। কর্মস্থলে পেশাগত দায়িত্বের বাইরে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে এটা-ওটা করার চেষ্টা লেগেই ছিল। সেই সূত্রে 'ঢাকা ত্রৈমাসিক' নামে একটা পত্রিকা বের করার প্রস্তুতি চলছে। প্রথম সংখ্যাটা হবে ঢাকা নগরের বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্মৃতি নিয়ে 'ঢাকার স্মৃতি সংখ্যা'। দেশের শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের তিন নক্ষত্র হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও আহসান হাবীবের মা আয়েশা ফয়েজের ঢাকা র স্মৃতিও রেখেছিলাম এই সূচিতে। এ রত্নগর্ভার স্মৃতি সংগ্রহের দায়িত্ব বর্তায় আমার কাঁধে। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহও কম ছিল না। কারণ ওই বছর একুশে বইমেলায় আয়েশা ফয়েজের আত্মজীবনী 'জীবন যে রকম' বের হয়। যার জন্য একটি পত্রিকার হয়ে এ আত্মজীবনী রচনার পটভূমি জানতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও নিতে হয় আমাকে। তাই দুই ঘরানার বিষয় নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে পল্লবীর ২৪/৪ নম্বর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। মনে পড়ে, তখনকার দোতলা বাড়ির সামনে একচিলতে খালি জায়গা। এখানে বসেই শীতের সকালে রোদের ওম নিচ্ছিলেন আয়েশা ফয়েজ। তাঁর পাশে আমার বসার ব্যবস্থা করলেন শাহীন ভাই (আহসান হাবীব)। দুপুর-অব্দি চলল আলাপচারিতার মতো করে আমাদের সাক্ষাৎকার। যার প্রকাশ-অপ্রকাশ সবটুকুই আমার একান্ত সংগ্রহে ছিল। বন্ধুপ্রতিম নওশাদ জামিল আর অনেক দিনের চেনা মাসুদ ভাইয়ের (মাসুদ হাসান, শিলালিপি সম্পাদক) সাদর আহ্বানে এবার পুরোটাই পাঠকের দরবা রে পেশ করা হলো।]

তায়েব মিল্লাত হোসেন : ১৯৭১ সালে আপনার স্বামী ফয়জুর রহমান আহমেদ পিরোজপুর মহকুমার সাব - ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে পুলিশের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে ২০০ রাইফেল স্থানীয় জনগণকে তিনি দিয়ে দেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে হত্যা করে ৫ মে। এমন একটা সময়ে ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার অবস্থা কী?

আয়েশা ফয়েজ : যুদ্ধের সময় জীবনের ওপর দিয়া ঝড় -তুফান গেছে। পিরোজপুরে মিলিটারির হাত থেকে বাঁচতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে থেকেছি। শেষে আব্বা আমাদের মোহনগঞ্জে নিয়া এলেন। স্বাধীনতার পরে প্রথমে পিরোজপুরে গেলাম কাজলের (হুমায়ূন আহমেদ) বাবার কবর দেখতে। কবরটা ছিল রাধানগর নদীর পারে। ইকবাল (মুহম্মদ জাফর ইকবাল) তার বাবার কবর খুঁড়ে ডেডবডি বের করে। ডেডবডি পিরোজপুরে আনা হয়। সেখানে জানাজার পর মাটি দেওয়া হয়।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : আপনি নাকি মামলা করেছিলেন...।

আয়েশা ফয়েজ : তখন পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে প্রমাণসহ ১২টা কেস হইছিল। একটা ছিল আমার। কাজলের বাবার হত্যাকারী কর্নেল আতিক রশীদ ও মেজর এজাজের বিরুদ্ধে কেস করছিলাম। তারা দাঁড়াইয়া থাইকা আমাদের বাড়িঘর লুট করাইছে। তারাই কাজলের বাবারে গুলি কইরা মারছে। কিন্তু কি ছুই হয়নি। সরকার সবারে ছেড়ে দিল। সব সরকারের কাছে আমি এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে যাব।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : সন্তানদের নিয়ে ঢাকায় আসেন কবে? কোথায় উঠেছিলেন?

আয়েশা ফয়েজ : ১৯৭২ সালে প্রথম ঢাকায় আসি। সে সময় সন্তানদের নিয়ে অনেকটা উদ্বাস্তু-জীবন গেছে। পিরোজপুরের ঘরবাড়ি আগেই লুট করছিল। আমার টাকাপয়সা , গয়নাগাঁটি কিছু ছিল না , ছিল বই। বইগুলো আলমারি খুলে নিয়ে গেছে , যার যা খুশি। স্বাধীনতার পরে শহীদ পরিবার হিসেবে মোহাম্মদপুরে বাড়ি দিল সরকার। তিন দিন পর সেই বাড়িতে রক্ষীবাহিনী এসে হাজির। আমার মতো মানুষরে উচ্ছেদ করতে ট্রাকভর্তি অস্ত্রশস্ত্র আনছে! সুবেদার মেজর হাফিজ আমাদের বাসার পর্দাটর্দা ছিঁড়া ফেলল। অশালীনভাবে আমাদের উচ্ছেদ করল। এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াইল আহমদ ছফা। রক্ষীবাহিনীর অন্যায়ের প্রতিবাদে কেরোসিন ঢাইলা নিজের গায়ে আগুন ধরাইয়া দেওয়ার হুমকি দিল সে। পাশের বাসাতেই থাকতেন ডা. মনোয়ার হোসেন। রাতে তাঁর বাড়িতে রইলাম। পরের দিন একটা বাসা খুঁজে সেই ভাড়া বাসায় উঠে গেলাম। আহমদ ছফা সরকারি বাড়ি পাওয়ার জন্য তখনো চেষ্টা করছিল। তার উদ্যোগেই কাজ হলো। কয়েক দিন পর মনোয়ার হোসেন আমার বাসায় এলেন। বললেন, 'আমি আপনাকে নিতে এসেছি। রক্ষীবাহিনীর হেড নুরুজ্জামান আপনাকে সালাম দিছেন।' আমি যেতে চাইলাম না। ডাক্তার সাহেব আমাকে বোঝালেন, 'এখন মান-অভিমানের সময় নয়। আমারও বাবা মারা গেছে অল্প বয়সে। কত ঝামেলা গেছে আমার ওপর দিয়া। বাচ্চাকাচ্চাদের দিকে চাইয়া আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখেন।' রক্ষীবাহিনীর প্রধান ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি ভদ্রভাবে বলাতে ওই বাসারই ওপরতলায় কিছুদিন রইলাম। এরপর আবার ওপরতলা নিয়া লাগল। এ আসে, সে আসে বাড়ির দাবি নিয়া। নানাভাবে বেইজ্জত করছে দেখে সরকারি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাবর রোডেই বাসা ভাড়া নিলাম। এর পরও অনেকে সরকারি বাড়ির চেষ্টা করতে লাগল। সরকারি বাড়ির শখ তত দিনে আমার মিটে গেছে। তাই আমি তাদের মানা

করি। তারা বিরক্ত হয়ে বলে, 'সরকার শহীদ পরিবারের সম্মানে বাড়ি দিছে। আপনি নেবেন না কেন?' তারা আমার সইটই জোর করে নিয়ে যায়। ওই সময়কার আইজি বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন, সরকার থেকে আপনাকে বাড়ি দেওয়া হবে।' সরকারি কোনো বাড়ি আমাদের জন্য রেডি হইলেই অন্য কোনো শহীদ পরিবার আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করত, আমি তাদের দিয়ে দিতাম। আমার ছেলেরাও বলত, অনেকেই তো সরকারি বাড়ি পায়নি। সেসব শহীদ পরিবার সরকারি বাড়ি ছাড়া টিকে থাকতে পারলে আমরা পারব না কেন! ১৯৮৮ সালে সরকার পল্লবীর এই দোতলা বাড়িটা দিছে। অ্যালটমেন্ট আছে, কিন্তু পুরোপুরি বুঝাইয়া দেয়নি। আমার ছেলেরা কারও কাছে সমস্যার কথা কোনো দিন বলবে না। এইডা নিয়া আমিই ঝুইলা আছি (এখন সম্ভবত বাড়িটা পুরোপুরি বুঝে পেয়েছে তারা , তাই দোতলা বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করা হয়েছে)।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : ঢাকায় যখন এলেন, তখন আপনার পরিবারে রোজগারের কেউ নেউ, তখন সংসার চলত কী করে?

আয়েশা ফয়েজ : ঢাকায় আমার সব ভয়ংকর ভয়ংকর স্মৃতি। এখনো বসে বসে ভাবি, কিভাবে তখন সময় গেছে। আমার বাবা এবং তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী আমার ছোট ভাই নজরুল ৮ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের একটি দলের হাতে মারা যান। পাকিস্তানি মিলিটারিরা বাবাকে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হতে বাধ্য করেছিল। সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল, তারা গা-ঢাকা দিল। বাবা গা-ঢাকা দিলেন না। তিনি তাদের কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং অসংখ্য মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়ে ছেন, অনেককে মুক্তিযুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছেন ; তাঁদের কেউ কেউ মুক্তিবাহিনীতে যোগও দিয়েছেন। তিনি কেন গা-ঢাকা দেবেন? আমি বাবাকে কাছ থেকে দেখেছি। তাই জানি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার বাবা , ভাই মারা গেছেন, সব অন্ধকার। ঢাকায় এসে প্রথমে দেখা করেছিলাম পুলিশের আইজি খালেক সাহেবের সঙ্গে। তিনি বললেন , 'আপনার স্বামী ভালো মানুষ ছিলেন। জানি, উনি ১০ টাকাও আপনাদের জন্য রেখে যাননি। আপনি চিন্তা করবেন না; পেনশন, গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের টাকা যেন তাড়াতাড়ি পেয়ে যান তার ব্যবস্থা করব। ' তখনই দুই হাজার টাকার একটা চেক দেওয়া হলো। পেনশনের টাকা তোলার জন্য কাগজপত্র নিয়ে আবার গেলাম। এবার কাজলের আব্বার পরিচিত একজন এআইজি তাঁর অধস্তন অফিসারকে ডেকে আমার সব বুঝিয়ে দিলেন। পরে সেই অধস্তন অফিসারের কাছে গিয়েছি, তিনি কাগজপত্রে চোখ বুলানোর আগেই রাগে ফেটে পড়লেন। বল লেন, 'আপনার বেশি ক্ষমতা হয়েছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন? ভাবেন ওপরওয়ালারা বললেই কাজ হবে? মনে রাখবেন, টাকা এত সহজে পাওয়া যায় না।' একটা ফাইল হাতে তুলে বললেন , 'এই দেখেন, পাঁচ বছর আগে মারা গেছে, এখনো টাকাপয়সা পায় নাই। টাকাপয়সা পাওয়া এত সোজা না। টাকা যদি চান তাহলে এখানে এসে কান্নাকাটি করবেন, খরচাপাতি করবেন। বড় সাহেবদের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই।'

পেনশনের টাকা তোলার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু হলো। আমার সঙ্গে থাকে ইকবাল , না হয় ছোট ভাই রুহুল। কাজলকে নেওয়া যায় না, এসব বৈষয়িক দায়িত্ব থেকে কেমন করে যেন পিছলে বের হয়ে যায়। এক অফিস থেকে আরেক অফিস, এক অফিসার থেকে আরেক অফিসার। এভাবে ঘুরে ঘুরে কত রকমের মানুষ যে দেখলাম। হুমায়ূনের নাম নিয়াও ঝামেলা হইল। ওর বাবা প্রথমে নাম রাখছিলেন শামসুর রহমান। সেই নামটাই ছিল ওর বাবার অফিসের কাগজপত্রে। কিন্তু পরে আবার নাম রাখে হুমায়ূন আহমেদ। এসব ঝামেলা শেষে একসময় পেনশন পাইলাম। মাসে ১৪২ টাকা। ২০০ টাকা দিত আরেকটা কী যেন, এই ছিল আয়। ঢাকায় মানুষের অনেক খারাপ ব্যবহার পেয়েছি। টাকাপয়সার জন্য যার কাছে গেছি, সে-ই খারাপ ব্যবহার করছে। কাজলের বাবার পেনশনের দুই হাজার টাকা তুলতে গেলে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হতো। তবে প্রতিবেশী ডা . মনোয়ার হোসেন ওই সময়ে আমার অনেক উপকার করছেন।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : পেনশনের বাইরে আর কোনো আয় ছিল না? আপনি নিজে কোনো কাজ করতেন?

আয়েশা ফয়েজ : আমি সেলাই করতাম। প্রচুর সেলাই করতাম। একটা সমিতি থেকে ১০০ থেকে ১২০টি কম্বল দিত। সেগুলো কেটে বাচ্চাদের শীতের পোশাক বানাইতাম। দিনে নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতাম, রাতে সেলাই করতাম। সেলাইকাজ করে যখন যা পেতাম সংসারে খরচ করতাম। ইকবাল টিউশনি করত, টিভিতে প্রোগ্রাম করত, কিভাবে টাকাপয়সা ম্যানেজ করা যায় সেই চেষ্টা করত। ইকবাল যখন পাস করে আমেরিকা গেল, তখন আমাদের একটু দাঁড়ানোর জায়গা হয়ে ছে। পরের বছর হুমায়ূন গেল। তারা টাকা দিতে আরম্ভ করল। ইকবাল তো ১৮ বছর দেশের বাইরে ছিল। হুমায়ূন ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করেছে। তখন টাকাপয়সার কষ্ট কমে গেছে। মনের কষ্ট ছাড়া আর কোনো কষ্ট ছিল না। ওই সময় হুমায়ূনের বিয়ে বহুদিন পরে আমাদের আনন্দ এনে দিয়েছিল। দুঃখ-কষ্ট ভুলে একটা নতুন জীবন শুরু করেছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা দাঁড়াইছে। ওরা কোনো দিন প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়েনি। ওরা স্বার্থপর না। হুমায়ূন তো ভাইবোনের জন্য যতটুকু ওর সামর্থ্য ছিল করছে। বাবা না থাকার কষ্টটা ভোলানোর জন্য ভাইবোনকে ঘোরানো-বেড়ানো সবই করছে।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : একাত্তর-পরবর্তী সময়ে আপনার সন্তানদের জীবনচিত্র কেমন ছিল? এ নিয়ে একটু বলুন।

আয়েশা ফয়েজ : তখন দেশের মধ্যে খুব অরাজকতা। পাড়ার বেশির ভাগ ছেলেপেলেই উচ্ছৃঙ্খল। যখন - তখন বাসায় ঢুকে পড়ে। আমার চিন্তা , দলবলের সঙ্গে মিশে ছেলেরা না জানি কী হয়! তবে ওরা পড়াশোনা করত। আমি বলতাম, তোমরা সংসারের চিন্তা কোরো না, পড়াশোনা করো। সংসার আমি দেখব। আমি ধর্মভীরু মানুষ। ওদের জন্য খতম -টতম পড়তাম, দোয়াটোয়া করতাম। আল্লাহ আমার দোয়া কবুল

করেছেন। কাজলের আব্বা বেঁচে থাকলেও ওরা এর বেশি আর কী করত। তাঁরও শখ ছিল ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে। আমাদের যুগে তো পড়াশোনার গুরুত্ব অত ছিল না , আমি খুব বেশি পড়াশোনা করিনি। তিনি আমাকেও পড়াশোনা করতে বলতেন। তিনি বলতেন, 'বাচ্চারা যখন ইংরেজিতে কথা বলবে, তখন তো তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে।' এসব বিষয় নিয়ে মজা করতেন। তিনি পুলিশ অফিসার হলেও খুব রসিক ছিলেন। উনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন। আমরা, বিশেষ করে আমি বিশ্বাস করতাম না। পরে দেখলাম, যা যা বলছেন তার অনেক কিছু হইছে। হুমায়ূন সম্পর্কে বলতেন , 'অনেক বিখ্যাত হবে তোমার ছেলে! জান, রানি এলিজাবেথের ছেলে আর তোমার ছেলের জন্ম একই দিনে, একই লগ্নে।' আমি বলতাম, কই রানি এলিজাবেথ আর কই আমি। তিনি বলতেন, 'রানির ছেলে বিখ্যাত হবে তার বাবা-মায়ের নামে। আমার ছেলে হবে নিজের যোগ্যতায়।' হুমায়ূনের যেকোনো দুষ্টুমির মধ্যেও বিশেষ কারণ খুঁজে পেতেন ওর বাবা। হুমায়ূন সারা দিন কই কই ঘুরত। আমি কিছু বললে ওর বাবা বলতেন , 'প্রমথনাথ বিশি এরকম ছিলেন, কাজলের ভেতরে অন্যরকম কিছু আছে।' 'নন্দিত নরকে'র পাণ্ডুলিপি ওর আব্বাও পড়েছিলেন। দেখে বলেছেন, 'তোর হবে।' তখন হুমায়ূন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইছে। আজকে ওরা আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছে না আইসা ওর আব্বার কাছে আসলে কত কিছু বলতেন! কত খুশি হইতেন!

তায়েব মিল্লাত হোসেন : আপনাদের বাসায় পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চার পরিবেশ কী আগে থেকেই ছিল?

আয়েশা ফয়েজ : মুক্তিযুদ্ধের সময় শাহীন (আহসান হাবীব) তো বাচ্চা ছিল। যুদ্ধের পরে কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি বা ভাড়া বাড়ি কয়েকবার চেঞ্জ করতে হইছে। মোহাম্মদপুর , কল্যাণপুর, বেইলি রোড, দিলু রোড_কত জায়গায় থাকছি! সাতটা স্কুল চেঞ্জ করে শাহীন ম্যাট্রিক পাস করছে। নিজে খুঁজে খুঁজে স্কুল বের করে ভর্তি হইত। শাহীন অনেক কষ্ট করছে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তুলেছে , বাজার করেছে_এর মধ্যে আবার পড়াশোনা করে মানুষ হইছে! আমার সব ছেলেমেয়েই ছবি আঁকতে পারত। স বাই বই পড়ত। ইকবালের প্রিয় লেখক ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন বাসায় এসে জানাল, মানিকসমগ্র বের হইছে, পুরো সেট ৩০০ টাকা। ৩০০ টাকা তখন অনেক টাকা। কিনতে পারবে না বলে সে হাতাইয়া আসছে। আমি ইকবালকে টাকা দিলাম। বাসায় মানিকসমগ্র আসার পর অন্যরকম এক পরিবেশ। আমি, আমার ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সবাই মানিকের বই পড়ছি। আমার ছেলেদের লেখক হওয়ার জন্য আলাদা কোনো পরিবেশ লাগেনি। বাচ্চারা আশপাশে খেলাধুলা করলেও তাদের লেখালেখিতে কোনো সমস্যা হয় না।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : এখনকার ঢাকার মানুষের জীবন আর আগের ঢাকার জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পান?

আয়েশা ফয়েজ : এখন দেখি মায়েরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়া ব্যস্ত। আমাদের সময় এ রকম ছিল না। আমার ছেলেমেয়েদের কোনো প্রাইভেট টিউটর ছিল না। তারা প্রাইভেট টিউটর ছাড়া এমনেই ভালো রেজাল্ট করছে। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, আমি ঘুমাইছি আর ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ছেলেমেয়েরা সব মানুষ হইয়া গেছে। এখনকার মায়েদের মধ্যে দেখি প্রাইভেট টিউটর নেওয়ার প্রতিযোগিতা। সকালবেলা বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে দৌড়াচ্ছে। নিজেরা স্কুলে বসে থাকে। এখনকার মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে পেরেশান।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : ছেলেমেয়েরা যখন ছোট, তখন ঢাকার কোথাও বেড়াতে যেতেন না?

আয়েশা ফয়েজ : তখন ঢাকায় আমাদের তেমন কোনো বেড়ানোর জায়গা ছিল না। কোনোদিন কোনো পার্কে, জাদুঘরে বেড়াতে যাইনি। যাত্রাবাড়ীতে ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে যেতাম। আমার এক মামা ছিলেন, উনি জীবন বীমায় চাকরি করতেন। তাঁর বাসায়ও বেড়াতে যেতাম। এখন তো একই বিল্ডিংয়ের কেউ কাউকে চিনে না। আমার সঙ্গে অনেক প্রতিবেশীর পরিচয় ছিল। আমার সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল না। জীবনে অনেক ভালো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হইছে।

তায়েব মিল্লাত হোসেন : আপনার বই 'জীবন যে রকম' নিয়ে কিছু বলুন। আত্মজীবনী হঠাৎ করেই লিখেছেন, নাকি আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল?

আয়েশা ফয়েজ : ১৯৯১ সালে আমেরিকায় ইকবালের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সারা দিন করার কিছু থাকত না। ইকবালের মুক্তিযুদ্ধের একটা বই কম্পোজ করে কম্পিউটারে লেখা শিখে ফেললাম। তখন ইকবাল বলল, আপনার জীবনে তো অনেক ঘটনা, সেগুলো লিখে ফেলেন। হুমায়ূনের আব্বা থাকতেই গল্প লেখতাম। সেসব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও পুলিশের পত্রিকা 'ডিটেকটিভ'-এ ছাপাইত। পটুয়াখালীতে ঘরবাড়ি লুট হওয়ার সময় সব হারিয়ে গেছে। হুমায়ূনের আব্বার বিভিন্ন লেখার পাণ্ডুলিপিও জ্বালাইয়া দিছে। আমেরিকায় থাইকাই বইটা লিখছিলাম। পাণ্ডুলিপি বহুদিন আমার কাছেই ছিল। হঠাৎ ইকবালের মাথায় এলো, বই ছাপি। কোনো দিন ভাবি নাই বই হবে। ছেলেরা লেখে, আমারও বই বের হলো। আমার শরম লাগে! সবাই চাপ দিচ্ছে বাকি জীবনের ঘটনা লেখার জন্য। নতুন করে লিখতে পারব বলে মনে হয় না। তখন কম্পিউটার শিখে শখে শখে লিখছি। এখন কোনো কাজ নাই, বইটই পড়ে সময় কাটে। আগে নাতি-নাতনিদের আমিই মানুষ করছি। আমার বইটা পড়ে শাহীনের মেয়ে এষা বলতেছে , তুমি আমাদের কথা লেখ নাই। লিখব কী, তখন তো তাদের জন্মই হয় নাই। বড় মেয়ে শেফুর মেয়ে (অপলা হায়দার) ফোন করে কাঁদছে, নানার মৃত্যুর ঘটনা পড়ে তার খুব কষ্ট হইছে।

আয়েশা ফয়েজের আত্মজীবনী জীবন যে রকম

নওশাদ জামিল

ঘটনা দুটির কাকতালীয় মিল বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ স্বামীর কফিন যিনি আগলে ধরেছিলেন, অনেক পরে সেই তিনিই জড়িয়ে ধরেছিলেন প্রথম সন্তানের কফিন। একজন মায়ের জন্য এটা যে কত বড় দুঃখের, তা ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে উঠল।

একাত্তরে শুধু স্বামী নন, তিনি হারিয়েছেন তাঁর বাবাকে; হারিয়েছেন ভাইকেও। একজন মানুষ আর কত দুঃখ সইতে পারেন? এর পরও সহিষ্ণু, নিরলস ও সার্থকভাবে তিনি পালন করেছেন সব দায়দায়িত্ব। নিজের জন্য নয়, ঠিক ছোট সংসারের জন্যও নয়_প্রকাণ্ড বড় একটা বিমিশ্র সংসারের জন্য কঠিন ব্রত পালন করেছেন। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে সাধারণ জননী থেকে অসাধারণ এক জননীতে পরিণত হয়েছেন আয়েশা ফয়েজ। এ জন্য তাঁকে কত চোখের জল ফেলতে হয়েছে, কত অমানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, জননী হৃদয়ের সেই গভীরতর ব্যথা নিকটজন ছাড়া তা বোঝার নয়।

আয়েশা ফয়েজের আত্মজীবনী 'জীবন যে রকম' বইটি পড়তে পড়তে আমরা হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু তা খুব সামান্য , অতীব সামান্য। মানুষের সত্যিকারের উপলব্ধি পরিমাপের কোনো যন্ত্র নেই, অনুভব মাপার 'থার্মোমিটার' টাইপের কোনো যন্ত্রও নেই, তবুও এটা বলা যায় , বইটি পড়তে গিয়ে পাঠকের চোখ ভিজে উঠবে। মনের গহীন থেকে একটা প্রবল দুঃখবোধ মোচড় দিয়ে জেগে উঠবে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ছয় ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন এই শহীদজায়া। জীবনে তিনি সুখ পেয়েছেন , চোখের সামনেই দেখেছেন ছেলেদের উজ্জ্বল দিনগুলো। আবার তাঁকেই পরম মমতায় আগলে ধরতে হয়েছে ছেলের কফিন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে গগণশিরীষের গাছগুলোর ছায়ায় তিনি যখন হুমায়ূন আহমেদের কফিন জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন, তখন হয়তো তাঁর মনে পড়ছিল প্রথমবার দেখা শিশু কাজলের মুখটি। সদ্য জন্ম নেওয়া রাজপুত্রের মুখ দেখেই তাঁর বুকের ভেতর নড়েচড়ে গিয়েছিল স্বর্গীয় আনন্দে, শেষবার শহীদ মিনারে তিনি দেখলেন সদ্য প্রয়াত সন্তানের মুখ। একমাত্র মাতৃহৃদয় জানে, তখন কী গভীর বেদনায় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল তাঁর বুক। কী অসীম শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করেছিল সমস্ত পৃথিবী। সন্তানকে অসংখ্যবার দেখলেও সে দুই দেখার মাঝে কত তফাত, কত বিষাদ!

শহীদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কয়েক ঘণ্টা রাখা হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের কফিন। আয়েশা ফয়েজ কফিনের পাশে দীর্ঘক্ষণ বসেছিলেন। এই ছেলেই তো হরহামেশা আশ্রয় খুঁজত তাঁর বুকে। বড় হয়েও তো কত অবলীলায় মাকে জড়িয়ে ধরত ছেলেটা। শহীদ মিনারে আয়েশা ফয়েজই জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে, ছেলের কফিনকে। যেন অনুভব করার চেষ্টা করলেন নিথর ছে লের অস্তিত্ব।

ছেলের কফিন জড়িয়ে ধরে তখন হয়তো তাঁর প্রথম মা হওয়ার কথা মনে পড়ছিল? 'জীবন যে রকম' বইটির কিছু পৃষ্ঠা উল্টালেই পাঠক খুঁজে পাবেন নতুন মা হওয়ার একটি খবর । আয়েশা ফয়েজ মা

হয়েছেন। তাঁর ওই শিশুটি এখন আমাদের হুমায়ূন আহমেদ। বইয়ে এর পরের অংশগুলোয় উঠে এসেছে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের হুমায়ূন আহমেদের নানার বাড়ির কিছু ঘটনা। প্রথমে ছেলেটির নাম রাখা হলো কাজল। সেই কাজলের আসল নাম রাখা হলো শামসুর রহমান। কাজলের দাদা ও দাদি এ নামটি রাখেন। কিন্তু কাজলের বাবা ফয়জুর রহমান এ নামটি গ্রহণ করেননি। তিনি নাম বদলে রাখলেন হুমায়ূন আহমে দ।

এরপর একে একে বইটিতে উঠে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের শৈশবের দুরন্তপনাসহ নানা ঘটনা। দুই ছেলের ছেলেবেলা নিয়ে তিনি বলেছেন, ছোটবেলা থেকেই ইকবাল ছিল পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী, কিন্তু কাজল দুষ্ট প্রকৃতির।

শহীদজায়া আয়েশা ফয়েজের লেখা 'জীবন যে রকম' কোনো দুঃখজাগানিয়া উপন্যাস নয়, সেটা তিনি লেখেনওনি, লিখেছেন জীবনেরই ঘটে যাওয়া কিছু গল্প। কয়েকটি মাত্র সত্য ঘটনা। অত্যন্ত সহজ -সরল ভাষায় লিখেছেন এমন কিছু স্মৃতির কথা , যা তিনি ভুলতে পারেননি।

দেশের দুই জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ কিংবা মুহম্মদ জাফর ইকবালের শুধু জন্মদাত্রী নন , ছয়টি সন্তানের মা তিনি। বাবাও কী নন? মায়ের স্নেহ দিয়েছেন, বাবার অভাবও তো তাঁকেই পূরণ করতে হয়েছে। ছয়টি সন্তানকেই তিনি দেশসেরা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। সন্তানরা নিজ নিজ অবস্থানে মহীরুহ। চোখের সামনে কত কী দেখেছেন, কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে, তবুও তিনি না দেখার ভান করেননি, মাথানত করেননি। দৃঢ় মনোবল নিয়ে মোকাবিলা করেছেন , লড়াই করেছেন। জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

বইটির নানা অংশে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা। ফয়জুর রহমানের বদলির চাকরি সূত্রে তিনিও পরিবার নিয়ে ঘুরেছেন নানা জায়গায়। ঘুরেছেন সিলেট , পচাগড়, রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, বগুড়া, কুমিল্লা এবং অবশেষে পিরোজপুর। বইটিতে আছে সেসব স্থানের ঘটনাবহুল জীবন।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও হুমায়ূন আহমেদের মা রত্নগর্ভা আয়েশা ফয়েজের লেখা 'জীবন যে রকম' বইটির মুখবন্ধে তিনি লিখলেন , ১৯৯১ সালে তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায় মেজ ছেলে ইকবালের বাসায়। সেখানে বসেই অনেকটা খেয়ালের বশে লিখে ফেললেন এ বইটি। আত্মজীবনীর শুরুতেই তিনি ১৯৪৪ সালের একজন বেকার ছেলের গল্প দিয়ে শুরু করেছেন। ঠিকই মনে রেখেছেন ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে একজন বেকার ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। লোকটির নাম শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান। বইটির শেষ দিকে আছে আমেরিকায় যাওয়া উপলক্ষে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের পক্ষ থেকে ঘরোয়া আনন্দানুষ্ঠানের বর্ণনা। সে অনুষ্ঠানেই তাঁর ছেলেমেয়ে , নাতি-নাতনিরা তাঁকে চমকে দিয়ে গলায় পরিয়ে দেন 'আয়েশা ফয়েজ সার্থক মা পদক'। এ পদক পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। পরিবার

শুধু নয়, সারা দেশের লাখো মানুষ সার্থক জননীকে তুলে দিয়েছেন হৃদয়ের অর্ঘ্য , তুলেছেন মায়ের জন্য সন্তানের ভালোবাসা।

হুমায়ূন আহমেদের দুটি উপন্যাস
মধ্যাহ্ন
কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর

মধ্যাহ্ন নামের উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের শেষ দিকে হুমায়ূন আহমেদ লিখলেন, 'মানবজাতি অপেক্ষা করে না। তার পরও তাকে সব সময় অপেক্ষা করতে হয়। ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা, ঘৃণার জন্য অপেক্ষা, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা, আবার মুক্তির জন্য অপেক্ষা।' আমরা কী জন্য অপেক্ষা করছি, প্রিয় হুমায়ূন? এই উপন্যাসটি দিয়ে কিছুরই মীমাংসা হয়তো করা যায় না । তবু মানব -মন নানা আশঙ্কা, ভালোবাসা, ক্রোধ, লজ্জা, এমনকি ঘৃণাও আবিষ্কার করে। মানুষ যে অনেক কিছুই খুঁজে নেয় বা সাজায় কিংবা কোনো কিছুর জন্য পথ পানে চেয়ে থাকে।

মধ্যাহ্নের এ খণ্ডটি (দ্বিতীয় খণ্ডে আছে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ) শেষ হয় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে মাত্র। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড মিলে জার্মানি আক্রমণ করেছে। এ আক্রমণের অনেক ইতিহাস, অনেক কথা এতে আছে, তিনি আমাদের জানিয়ে রাখেন, তাঁর পছন্দ তখনকার জাপানের পক্ষ নেওয়া, সুভাষ বসুকে সাপোর্ট করা; এতে এশিয়া, শুধু এশিয়াকেই সাপোর্ট করছে না, বিপ্লবের এক অমীমাংসিত রাস্তাকে তার মৌল-স্বাধীনতা দিয়ে তিনি যেন আলাদা এক জগৎ নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এ উপন্যাসের শুরু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কালে। ধর্ম নিয়ে তাতে অনেক ধরনের কথা থাকলেও তিনি কোন ধর্মকে ভালোবেসেছেন তা বলা যায় না। তবে তিনি উপন্যাসে বরাবরই দুর্বলের পক্ষে ছিলেন। নিপীড়িত মুসলমানের পক্ষে যেমন ছিলেন , নিপীড়িত হিন্দু বা একেবারে নিম্নবর্গীয় মানুষকেও ভুলে থাকেননি। এটি পড়তে পড়তে মনে হয় , এই একটিমাত্র উপন্যাসে কত কথা, কাহিনী, ধর্মসংস্কার, জমিদারি প্রথার ভয়াবহতা, গ্রামীণ সংস্কার, ল্যাবিরিন্থ, মানুষের স্বোপার্জিত স্বাধীনতার যেন এক সারাৎসার হয়ে গেছে। তিনি বরাবরের মতোই এখানেও কোনো মতবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হননি। এমনকি সংস্কার, ঘৃণা, ক্রোধ বা ভালোবাসাকেও আচ্ছামতো জমাট বাঁধতে দেননি। কখনো মনে হয়, জীবন ভালোবাসার এক অপূর্ব বন্ধন , আবার তা মনে হতে হতেই যেন তিনি জানাতে থাকেন, জীবন কিছুই না, সবই অসার, দুই দিনের খেলা মাত্র।

এতে কিছু চরিত্র এত বহুরূপিতা নিয়ে এসেছে যে তাদের পাঠ করতে করতেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। তাদের ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে জুলেখা বা চান বিবি। এটিকে হিমু বা মিসির আলির মতো হুমায়ূনের বিশেষ ধারার সৃষ্টি মনে হয়। সে সোলেমানের সাদামাটা বৌ, তবে অপূর্ব সুন্দরী। এই

সৌন্দর্যই চরিত্রটিকে যেন নানা ঘাটে ভেড়ায়। সোলেমান তাকে ত্যাগ করে, কারণ কিছুই না, ভিন্ন ধর্মের লোকের সঙ্গে তার রহস্যময় মেলামেশা কেন? তার ছেলে জহিরও হরিচরণের পিছেই থাকতে চায়। শশী মাস্টারকে হয়তো তার ভালোবাসার প্রতীক মনে করে। কিন্তু তার আশ্রয় হয় রঙিলাবাড়ি নামের দেহব্যবসার স্থানে।

তিনি যেন পূর্ববঙ্গের অতি মধুর এক ভাষাযোগে ধর্মের অপ্রাতিষ্ঠানিক এক জগৎকে একেবারে উজ্জ্বল করে তুলেছেন! গ্রামীণ প্রকৃতি , বিশেষ করে বর্ষা, জোছনা একেবারে তার প্রাণ খুলে হুড়াহুড়ি শু রু করে। আর ভাষার সহজতা, বিশেষ করে লোকায়ত বৈঠকি আমেজ এত মাধুর্য নিয়ে যে এতে আছে , তা এক কথায় অসাধারণ। মৃত্যুও যে এ উপন্যাসটির আরেক দিক। সবচেয়ে বড় কথা , বিশ শতকের প্রথম দিকের চারটি দশক, বিশেষ করে সর্ববঙ্গীয় আর্থসামাজিক-লৌকিক জীবন চমৎকারভাবে এতে প্রকাশিত হয়েছে এবং একেবারে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ছিলেন সদামনময় কথাঅলা।

জোছনা ও জননীর গল্প
ইমদাদুল হক মিলন

'ভোরের কাগজ'-এর সাহিত্য পাতায় হুমায়ূন আহমেদ ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর মনোজগৎ আচ্ছন্ন করে থাকা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস 'জোছনা ও জননীর গল্প'। ১৭-১৮ বছর আগের কথা। হুমায়ূন আহমেদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিশাল ক্যানভাসের উপন্যাসটি লেখার জন্য স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আরো কয়েক বছর আগে তাঁকে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি খাতা উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখতে শুরু করেন হুমায়ূন আহমেদ। কিন্তু কয়েক কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ করে দেন। 'নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী কমলাপুর রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। ' এই লাইনটি দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়ে কিছুদূর এগোয়, তারপর আর খবর নেই। লেখা বন্ধ। পত্রিকার সম্পাদক একটু ফাঁপরে পড়েন। তারপর কিছুদিনের গ্যাপে আবার শুরু হয় লেখা। কয়েক কিস্তির পর আবার বন্ধ। ঈদ সংখ্যার লেখা, বইমেলার লেখা, নাটক-সিনেমা_সবই লিখছেন হুমায়ূন আহমেদ, শুধু 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখছেন না।

কেন?

তাঁর লাখ লাখ পাঠকের মতো আমার মনেও প্রশ্নটি ঘুরঘুর করে। দুবারে লেখা কয়েক কিস্তি পড়ে অস্থির হয়ে আছি। কবে শেষ হবে এই উপন্যাস? কবে পুরোটা পড়া যাবে?

দেখা হলে জিজ্ঞেস করি। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মজা করেন। 'জোছনা ও জননীর গল্প' প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। সময় কাটে সময়ের মতো। হৃদয়ে দুর্যোগ নামে লেখকের। সিঙ্গাপুরে গিয়ে বাইপাস করান।

অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগমুহূর্তে অ্যানেসথেশিয়ার কারণে অবচেতন হওয়ার মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে একটি কাজ বাকি রয়ে গেল, 'জোছনা ও জননীর গল্প' লেখা। মাতৃভূমির ঋণ শোধ করা হলো না। ফিরে এসে লেখা শুরু করেন। এবার আর কিস্তি কিস্তি নয়, কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিক নয়; সরাসরি লেখা শেষ করা, বই বের করা। এবার তিনি থামলেন না, লেখা শেষ করলেন।

হুমায়ূন আহমেদের পাঠকরা জানেন, লেখায় এক ধরনের ঘোর তৈরি করেন তিনি, এক ধরনের মায়া বিস্তার করেন। একবার তাঁর লেখার ভেতরে ঢোকার অর্থ হচ্ছে সেই মায়ার জগতে বন্দি হওয়া। পড়া শেষ হওয়ার পরও ঘোর সহজে কাটতে চায় না। পাঠক আচ্ছন্ন থাকে অনেক দিন।

'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছি আমি।

তবে লেখায় শুধু যে পাঠককেই আচ্ছন্ন করেন হুমায়ূন আহমেদ তা নয় , তিনি নিজেও আচ্ছন্ন হন। লেখার সময় তাঁর নিজের মধ্যেও তৈরি হয় আশ্চর্য রকমের এক ঘোর। 'জোছনা ও জননীর গল্প' লেখার সময় তাঁকে এ রকম ঘোরে পড়তে দেখেছি আমি। দিনভর মাথা নিচু করে লিখছেন, চা খাচ্ছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, প্রুফ দেখছেন, লেখা বদলাচ্ছেন, কাটাকাটি করছেন আর পড়ছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা-ইংরেজিতে লেখা হেন বই নেই, হেন পত্রপত্রিকা নেই, যা তিনি না পড়েছেন। সন্ধ্যার পর সাধারণত লেখেন না তিনি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেন। সেই আড্ডার সময়ও লক্ষ করেছি, সবার সঙ্গে থেকেও কোন ফাঁকে তিনি যেন একা হয়ে গেছেন। তাঁর মন চলে গেছে ১৯৭১-এ। মনে মনে জোছনা ও জননীর গল্পের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো সাজাচ্ছেন তিনি। নিজের মধ্যে প্রবল ঘোর তৈরি না হলে তিন-চার মাসের মধ্যে ৪৯৩ পৃষ্ঠার এ রকম একটি মহৎ উপন্যাস লিখে শেষ করা যায় না। সঙ্গে আছে ছয় পৃষ্ঠার চমৎকার একটি ভূমিকা। আর ব্যাপক পড়াশোনার কথা তো আগেই বললাম।

এতক্ষণে পাঠক সংগত কারণেই আশা করবেন উপন্যাসটির ভালোমন্দ নিয়ে আমি কিছু কথা বলব , কিছু সমালোচনা করব, উপন্যাসটির দোষত্রুটি ধরব, অমুক জায়গায় তমুক হলে ভালো হতো , ওই চরিত্রটি যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে, অমুক অমুক তথ্যে গণ্ডগোল আছে ইত্যাদি। সবিনয়ে বলি , ওটি আমার কাজ নয়। ওই কাজটি করবেন গবেষক-সমালোচকরা। আমি গবেষক কিংবা সমালোচক নই। যদিও জোছনা ও জননীর গল্পের পূর্বকথায় ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ : 'জোছনা ও জননীর গল্প কোনো ইতিহাসের বই নয়, এটি একটি উপন্যাস। তার পরও ইতিহাসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা আমি করেছি। সেখানেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। হওয়াটা স্বাভাবিক। উপন্যাস যেহেতু কোনো আসমানি কিতাব না, এসব ভুলভ্রান্তি দূর করার উপায় আছে।

উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে সেই সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষজন এনেছি। এই স্বাধীনতা একজন ঔপন্যাসিকের আছে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় কোনো ভুল যদি করে থাকি , তার জন্যে আগেভাগেই ক্ষমা চাচ্ছি। অতি বিনয়ের সঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি_একজন লেখক যা লিখবেন, সেটাই সত্যি।

সেই সত্য যা রচিবে তুমি , ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

কবি, তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো

উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্যি। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেওয়া। প্রকাশিত হওয়ার আগেই এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অনেককে পড়িয়েছি। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি (এই প্রজন্মের পাঠকের কথা বলছি) তারা পড়ার পর বলেছে _উপন্যাসের অনেক ঘটনাই তাদের কাছে কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, এ রকমও কি হয়?

তাদের কাছে আমার একটাই কথা_সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগৎ। সবই বাস্তব আবার সবই অবাস্তব। আমি সেই ভয়ংকর সুন্দর স্যুরিয়ালিস্টিক সময় পার করে এসেছি। তার খানিকটাও যদি ধরে থাকতে পারি, তাহলেই আমার মানবজীবন ধন্য।'

খানিকটা নয়, প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ, আপনি প্রায় সবখানিই ধরেছেন। 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখে আপনি আপনার লেখকজীবন পূর্ণ করেছেন। এ রকম একটি উপন্যাস লেখার পর একজন লেখকের আর কিছু চাওয়ার থাকে না।

হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য লেখার সঙ্গে 'জোছনা ও জননীর গল্প' একেবারেই মেলে না। এ একেবারেই অন্য ধাঁচের রচনা। অতি সরল ও আশ্চর্য রকমের নিরাসক্ত, ঘরোয়া ভাষায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছেন তিনি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ_এই তিনটি কালকে কখন যে একাকার করে দিয়েছেন গল্পের ভেতর, কখন যে পাঠককে নিয়ে গেছেন স্বপ্নে, কখন ফিরিয়ে এনেছেন বাস্তবে, টেরই পাওয়া যায় না। উপন্যাস রচনার কোনো প্রচলিত রীতি তিনি মানেনইনি। যেভাবে লিখে আনন্দ পেয়েছেন, যেভাবে পাঠককে বোঝাতে পেরেছেন, গল্প সেভাবেই এগিয়ে গেছে। যেখানে যে তথ্যের প্রয়োজন নির্বিকারভাবে তা ব্যবহার করেছেন, ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন তথ্যসূত্র। কোথাও কোথাও মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন যেখানে যা প্রয়োজন, যেমন করে সাজালে উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ হবে , তা-ই করেছেন। বহু টুকরোটাকরা গল্প , ঘটনা-চরিত্র আর ইতিহাসের উপাদানকে মহৎ শিল্পীর ভঙ্গিতে জোড়া দিয়ে দিয়ে যে সময়কে তিনি সম্পূর্ণ তুলে ধরেছেন , সেই সময়ের নাম ১৯৭১। ফলে এই উপন্যাস

একাধারে আমাদের সবচেয়ে গৌরবময় সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং মূল্যবান দলিলও। হুমায়ূন আহমেদ শুধু উপন্যাসই লেখেননি, মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস লেখার মহৎ দায়িত্বটিও পালন করেছেন।

এই উপন্যাসে চরিত্র হয়ে এসেছেন মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো, টিক্কা খান; অর্থাৎ সেই সময়কার সব শ্রদ্ধেয় ও নিন্দিত মানুষজন। ভারতীয় বাহিনীর চরিত্ররা এসেছে যে যার ভূমিকায়। মুক্তিযোদ্ধারা এসেছেন, রাজাকাররা এসেছে, শর্শিনার পীর সাহেব এসেছেন আর এসেছে সমগ্র দেশের নানা স্তরের নানা রকম মানুষ। ছোটবড় ও ঐতিহাসিক এত চরিত্রের সমাহার আর কোনো বাংলা উপন্যাসে এভাবে এসেছে কি না, এত সার্থকভাবে চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

'ইরতাজউদ্দিন তখন মাওলানা সাহেবকে চিনলেন_ইনি মওলানা ভাসানী! পত্রিকায় কত ছবি দেখেছেন। এই প্রথম সামনাসামনি দেখা।

ইরতাজউদ্দিন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, ঘুম ভালো হয়েছে? যেন কতদিনের চেনা মানুষ।

ইরতাজউদ্দিন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, জি।

আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, কিছু মনে করবেন না।

ইরতাজউদ্দিন আরো লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। এ রকম একজন বিখ্যাত মানুষের সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা যায় না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এই ইরতাজউদ্দিন হুমায়ূন আহমেদের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পরাধীন দেশে জুমার নামাজ হয় না , জুমার নামাজ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। এই কারণে ক্যাপ্টেন বাসেত তাঁ কে নীলগঞ্জ স্কুল ও বাজারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করায়। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেওয়ার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন ও দরজিকে মাগরেবের নামাজের পর সোহাগী নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহপাক, যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল তুমি তার প্রতি দয়া করো। তুমি তার প্রতি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। '

পরদিন প্রবল বৃষ্টিতে জীবনের মায়া ত্যাগ করে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার মনসুর সাহেব আর তাঁর পাগল স্ত্রী আসিয়া সোহাগী নদীর পাড় থেকে ইরতাজউদ্দিনের লাশ টেনে আনার সময় এলাকার কোনো বাঙালি নয়, বেলুচ রেজিমেন্টের সেপাই আসলাম খাঁ তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। কলমের সামান্য আঁচড়ে আঁকা আসলাম খাঁ চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক বোঝালেন, পাকিস্তান আর্মিতেও দু-একজন হৃদয়বান মানুষ ছিল।

'শেখ সাহেব হেসে ফেলে বললেন, তুই তো তোর গোপন কথা সবই বলে ফেললি। তুই আইবির লোক , তুই তোর পরিচয় গোপন রা খবি না?

আমি সরকারের হুকুমে আসলেও আমি ডিউটি করি আপনার। আমি খেয়াল রাখি যেন কেউ আপনার কোনও ক্ষতি করতে না পারে।

আমার ডিউটি করিস কী জন্যে?

কারণ আপনিই সরকার।

শেখ মুজিব এই কথায় খুবই তৃপ্তি পেলেন। মোবারক হোসেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন , তুই আমার জন্যে কী করতে পারবি?

আপনি যা করতে বলবেন, করতে পারব। যদি বলেন ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়। আমি পড়ব।

তোর নাম কী?

মোবারক হোসেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর।

দেশের বাড়ি কোথায়?

কিশোরগঞ্জ।

ভালো জায়গায় জন্ম। বীর সখিনার দেশ। ছেলেমেয়ে কী?

তিন মেয়ে এক ছেলে। তিন মেয়ের নাম_মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা আর ছেলের নাম ইয়াহিয়া।

কী বলিস তুই? ছেলের নাম ইয়াহিয়া?

আমার দাদিজান রেখেছেন। নবির নামে নাম।

আয় আমার সঙ্গে।

স্যার, কোথায় যাব?

তোকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠব। তারপর তোকে হুকুম দেব ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে। দেখি হুকুম তামিল করতে পারিস কি না।

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, স্যার চলেন।

শেখ মুজিব মোবারক হোসেনকে নিয়ে দোতলায় এলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন , এই আমাদের দুজনকে নাশতা দাও। এ হলো আমার এক ছেলে।'

্অতি সামান্য এক ঘটনায়, মাত্র কয়েক লাইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের প্রধান দিকটা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুললেন হুমায়ূন আহমেদ। মানুষের প্রতি এই মহান নেতার তীব্র ভালোবাসা। অন্যদিকে তাঁর জন্য সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। জীবন দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।

জিয়াউর রহমানের চরিত্রটি এলো এভাবে_'তাঁর চোখ কালো চশমায় ঢাকা। গায়ে ধবধবে সাদা হাফহাতা গেঞ্জি। বসেছেন ঋজু ভঙ্গিতে। বাঁ হাতের কব্জি তে পরা ঘড়ির বেল্ট সামান্য বড় হয়ে যাওয়ায় হাত নাড়ানোর সময় ঘড়ি উঠানামা করছে। এতে তিনি সামান্য বিরক্ত, তবে বিরক্তি বোঝার উপায় নেই। যে চোখ মানবিক আবেগ প্রকাশ করে, সেই চোখ তিনি বেশির ভাগ সময় কালো চশমায় ঢেকে রাখতে ভালোবাসেন। মানুষটার চারপাশে এক ধরনের রহস্য আছে।

তাঁর নাম জিয়াউর রহমান।'

'মেজর জিয়া এস ফোর্সের অধিনায়ক কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে এক বৈঠকেও খোলাখুলি নিজের এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা হলো , গেরিলা ধরনের এই যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন নেই। আমাদের দরকা র কমান্ড কাউন্সিল। সবচে' বড় কথা সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কেউ সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারেন না।'

জোছনা ও জননীর গল্পে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কথা লেখা হয়েছে এইভাবে_'নিয়াজীর ফোঁপানো একটু থামতেই জেনারেল নাগরা তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানুষটির সঙ্গে নিয়াজীর পরিচয় ক রিয়ে দিলেন। শান্ত গলায় হাসি হাসি মুখে বললেন, এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।

জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জামশেদ অবাক হয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে। তাঁদের স্তম্ভিতভাব কাটতে সময় লাগল। এক সময় নিয়াজী করমর্দনের জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে।

কাদের সিদ্দিকী হাত বাড়ালেন না। তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, নারী এবং শিশু হত্যাকারীদের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না।'

এ রকম বহু স্মরণীয় উদ্ধৃতি তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে। কত চরিত্র , কত ঘটনার কথা মনে পড়ছে! শাহেদ, আসমানী, জোহর, মোবারক, গৌরাঙ্গ, নাইমুল, মরিয়ম, শাহ কলিম, রুনি, বি হ্যাপি স্যার, ধীরেন্দ্র রায়চৌধুরী, কংকন। আর অতি ছোট্ট চরিত্র হারুন মাঝি। যে ছিল একজন ডাকাত। একটি উত্তাল সময় কিভাবে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল স্বাধীনতার দিকে , কিভাবে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল মানুষ, এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে সেই কথা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন স্তরের মানুষ, কখনো একজন ঠেলাগাড়িঅলা, কখনো হুমায়ূন আহমেদের নিজ পরিবার, মা-বাবা, ভাই-বোন, পাঙ্খাপুলার রশিদ, নানা স্তরের নানা মানুষ, কারো সঙ্গে কারো হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই, আবার সবাই যেন সবার সঙ্গে যুক্ত। যে সুতোয় সব মানুষকে একত্রে গেঁথে 'জোছনা ও জননীর গল্প' নামের এই মহৎ মালাটি হুমায়ূন আহমেদ গেঁথেছেন, সেই মালার নাম ১৯৭১-এর বাংলাদেশ। এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে একাত্তরের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যাবে , ক্রোধে আবেগে ঘৃণায় মমতায় এবং চোখের জলে ভাসবে মানুষ।

'তারও অনেক পরে ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনে দাড়ি -গোঁফ ভর্তি এক যুবক এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, সিঁড়িতে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে কি আমি চিনি? দীর্ঘকায় এই যুবক দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম চিৎকার করে বলল, মা দেখ, কে এসেছে! মাগো দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। যুবকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে _আহা, এইভাবে সবার সামনে আমাকে ধরে আছ কেন? আমাকে ছাড় তো। আমার লজ্জা লাগে।

নাইমুল কিন্তু তার স্ত্রীকে ধরে ছিল না। তার হাত এখনো প্রসারিত। কঠিন হাতে নাইমুলকে জড়িয়ে ধরেছিল মরিয়ম নিজেই।

পাঠক, মহান বিজয় দিবসে যে গল্প শেষ হবে সেই গল্প আনন্দময় হওয়া উচিত বলেই আমি এ রকম একটা সমাপ্তি তৈরি করেছি।

বাস্তবের সমাপ্তি এ রকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখেনি। সে ফিরে আসতে পারেনি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানে না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে। তাতে কিছু যায় -আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনার রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহা রে! আহা রে!'

হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প' শুধু উপন্যাস নয়, উপন্যাসের চেয়ে বেশি কিছু। এ হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত এক মহাকাব্য। এত সার্থক সুন্দরভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আর কিছু রচিত হয়নি। বাঙালির ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ অত্যন্ত যত্নে ও মায়ায় রক্ষিত হবে। কোনো কোনো জোছনা রাতে বাংলার গ্রাম-প্রান্তরের দাওয়ায় বসে একজন তাঁর উদাত্ত গলায় পড়বেন এই উপন্যাসের একেকটি অধ্যায় আর তাঁর চারপাশ ঘিরে বসে থাকা শ্রোতারা চোখের জলে ভাসবে। এই উপন্যাস তাদের ফিরিয়ে নেবে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের সেই মিশ্র সময়ে_ ১৯৭১।

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট চরিত্র

হিমু-মিসির আলি-বাকের ভাই

লেখকের সেরা সাফল্য তাঁর চরিত্র। নাটক-উপন্যাসে অনেক জনপ্রিয় চরিত্র জন্ম দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। সবচেয়ে আলোচিত হিমু , মিসির আলি আর বাকের ভাই। এই তিন চরিত্র নিয়ে লিখেছেন আহমেদ রিয়াজ

হিমু

আসল নাম হিমালয়। নামটি তার বাবার রাখা। পরিচিতি হিমু না মেই। নামের কারণে জীবনে সহপাঠীদের নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল ও। ওর দাদা অবশ্য অন্য নাম রাখতে চেয়েছিলেন , কিন্তু বাবার দেওয়া নামটাই ধারণ করে সে। হিমুর বাবার বিশ্বাস , প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, তাহলে মহাপুরুষও বানানো সম্ভব। মহাপুরুষ তৈরির একটা স্কুল ছিল তাঁর। আর সেই স্কুলের একমাত্র ছাত্র হিমু।

হিমুর পোশাক হচ্ছে পকেটবিহীন হলুদ পাঞ্জাবি। তার ট্রেডমার্ক। তার অন্যতম কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো। যদিও নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে বলে ও মনে করে না , কিন্তু কখনো কখনো সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়। ওর আচরণ খুবই বিভ্রান্তিকর। অন্যদের বিভ্রান্ত করতে সে খুব ভালোবাসে। ওর কিছু ভক্ত আছে , যারা মনে করে, ও একজন মহাপুরুষ। এদের মধ্যে আছে খালাতো ভাই বাদল, মেস ম্যানেজার, হোটেল মালিক, পুলিশ। ওর একজন বান্ধবীও আছে। নাম রূপা। অসম্ভব রূপবতী।

হিমুর নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই _১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। দেখতে সুন্দর নয়। জীবনযাপন বেশ অদ্ভুত_বাউণ্ডুলে ধরনের। বন্ধুদের সঙ্গে মেসে থাকে। পেশাও নেই কোনো। বেকার যুবক। ওর সম্পদ বলতে আছে কিছু বিত্তবান আত্মীয়স্বজন। তাদের কাছ থেকে উপহার আর অর্থ সাহায্য পায় সে। সবচে য়ে বড় গুণ

হচ্ছে, প্রায়ই ও যুক্তিবিরোধী মতানুসারে কাজ করে। ওর এই অযৌক্তিক ব্যক্তিত্বের জন্য অনেকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষাও পেয়ে যায়। আর সে কারণেই মানুষ ওকে মহাপুরুষ ভাবতে চায়।

হিমুর উদয় 'ময়ূরাক্ষী' নামের উপন্যাসে ১৯৯০ সালে। দারুণ সফল হয় হিমুকেন্দ্রিক উপন্যা সটি। এরপর প্রকাশিত হয় দরজার ওপাশে, হিমু, এবং হিমু, চলে যায় বসন্তের দিন, সে আসে ধীরে, হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরীসহ ২৪টি হিমু কাহিনী। হিমু কোনো সত্যিকারের চরিত্র নয় , তবু অনেক পাঠক সেটা মেনে নিতে পারেন না। তাঁদের কাছে হিমু মোটেই কাল্পনি ক কোনো চরিত্র নয়। কোনো কোনো হিমুভক্ত পাঠক তো নিজেকে হিমু হিসেবে দাবিও করেন। নিজেকে হিমু ভাবা পাঠকরা ঘোরাঘুরি করেন হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে। কাল্পনিক হিমু বাস্তবে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেশের অনেক পাঠককে। কখনো কখনো কাল্পনিক হিমুও পাঠকের কাছে বড় হয়ে ওঠে ব্য ক্তি হুমায়ূন আহমেদের চেয়ে। ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু নেই হিমুর। কারণ হিমু চিরকাল বেঁচে থাকবে হিমুদের মাঝে।

মিসির আলি

হুমায়ূন আহমেদের সিংহভাগ পাঠকই হিমু হতে চায়। আর হুমায়ূন নিজে হতে চান মিসির আলি। বলেওছেন বেশ কয়েকবার_'পুর্নজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে মিসির আলি হয়ে পৃথিবীতে আসতে চাই। ' কেন? জবাবটাও চটপট দিয়েছিলেন, 'লজিক। মিসির আলী লজিক্যাল লোক। আমার লজিক পছন্দ।'

কে এই মিসির আলি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক মিসির আলি। বয়স ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে। লম্বাটে মুখ। এলোমেলো দাড়ি, উসকো-খুসকো কাঁচা-পাকা চুল। প্রথম দেখায় মনে হবে ভবঘুরে আর কিছুটা আত্মভোলা। শিশুসুলভ সুন্দর হাসি তাঁর। তুখোড় স্মৃতিশক্তি। মানুষের মন , আচরণ, স্বপ্ন ও নানা রহস্যময় ঘটনা নিয়ে অসীম আগ্রহ।

যুক্তিনির্ভর মানুষ বলেই তাঁর অসম সাহস। ভূতাশ্রিত জায়গাতেও রা ত কাটাতে পিছ পা হন না এ জন্য যে রহস্যময়তার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারবেন। তাঁর অনেক গুণ। অনেক ধরনের কাজ করতে পারেন। ঠিকানাওয়ালা মানুষকে খুব সহজে অজানা স্থানেও খুঁজে বের করতে পারেন। এ জন্য টেলিফোন ডিরেক্টরি , গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর, টিভি-বেতার লাইসেন্স নম্বর, পুলিশ কেস রিপোর্ট, হাসপাতালের মর্গের সুরতহাল রিপোর্ট_এসবের সাহায্য নেন। প্রকৃতির বিস্ময়ে বিস্মিত হলেও প্রকৃতিতে রহস্য বলে কিছু নেই বলে বিশ্বাস করেন। সন্দেহবাদী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন।

ধূমপায়ী মানুষ মিসির আলি। প্রায়ই চেষ্টা করেন সিগা রেট ছেড়ে দেওয়ার। রোগাটে আর রোগাক্রান্ত শরীর তাঁর। যকৃত প্রায় পুরোটাই অকেজো , অগ্নাশয়ের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, রক্তের উপাদানে গড়বড়, হৃদপিণ্ড ড্রপ বিট দেয়। এ জন্য যেকোনো সাধারণ রোগই তাঁকে কাহিল করে ফেলে। প্রায়ই রোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যান। তবে শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন।

মিসির আলি হাজির হয়েছেন হুমায়ূন আহমেদের ২০টিরও বেশি বইয়ে। তাঁকে নিয়ে নাটকও হয়েছে বেশ কয়েকটি। সব নাটক আর প্রায় সব উপন্যাসেই মিসির আলি নিঃসঙ্গ মানুষ। কেবল 'অন্য ভুবন' উপন্যাসে বলা আছে, মিসির আলি বিয়ে করেছেন। তবে পরের উপন্যাসগুলোতে আবার তাঁকে নিঃসঙ্গ হিসেবে হাজির করা হয়। এ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ নিজেই কবুল করেছেন যে এটি বড় ধরনের ভুল ছিল। মিসির আলির বিবাহিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। পরের উপন্যাসগুলোতে সে ভুল শুধরে নিয়েছেন।

হুমায়ূন পাঠকরা মিসির আলির প্রথম দেখা পান 'দেবী'তে। আর হুমায়ূন আহমেদ মিসির আলির ধারণা পান যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরে। স্ত্রীর (গুলতেকিন) সঙ্গে তিনি ওইদিন গাড়িতে ঘুরছিলেন। চরিত্রটির ধারণা মাথায় এলেও মিসির আলি চরিত্রের প্রথম উপন্যাস লেখেন ঘটনার অনেকদিন পর।

'নিশিথিনী', 'নিষাদ', অন্যভুবন, বৃহন্নলা, মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য, আমিই মিসির আলি, মিসির আলি আনসলভড ইত্যাদি মিসির আলিকে নিয়ে লেখা উপন্যাস। একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'ভয়'-এ 'ভয়', 'জ্বিন কফিল' ও 'সঙ্গিনী' নামে তিনটি গল্প আছে।

বাকের ভাই

১৯৯৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। বাকের মাস্তানের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয় আদালতের রায়ে। কিন্তু তার আগ থেকেই বাকের ভাইয়ের ফাঁসির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে সারা দেশ। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফাঁসির প্রতিবাদে মিছিল-সমাবেশও শুরু হয়ে যায়। এমনকি বাকের ভাইয়ের কুলখানির দাওয়াতও পেয়ে যান আবদুল কাদের। আবদুল কাদেরের সাক্ষ্য দেওয়ার কারণেই বাকের ভাইয়ের ফাঁসির রায় হয়। রাস্তাঘাটে বেরুলে বাকের ভাইয়ের কোন ভক্ত কী করে বসে তার কি ঠিক আছে? এ ভয়ে থানায় জিডিও করেছিলেন তিনি।

নাহ্! বাকের ভাইকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন তিনি সত্যিকার কোনো মানুষ নন। তিনি 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের বাকের ভাই। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেই সাহিত্য থেকে উঠে আসা কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে তোলপাড় হয়েছে নানা সময়ে। কিন্তু বাকের ভাই নামের এই নাট্য চরিত্রকে ফাঁসি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র

করে দর্শকদের মাঝে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া, সেটা বিস্ময়করই শুধু নয়, বিরলও। নাটকের বাকের ভাই ছিলেন আসাদুজ্জামান নূর। তখন বাকের নামের কাছে অনেকটা ই আড়াল হয়ে গিয়েছিল আসাদুজ্জামান নূর নামটি।

নব্বইয়ের দশকের ওই সময়টাতে, যেদিন 'কোথাও কেউ নেই' প্রচার হতো, সেদিন ফাঁকা হয়ে যেত রাস্তাঘাট। সবাই ঘরের দিকে ছুটতে শুরু করত। যারা সময়মতো পৌঁছতে পারত না , তারা দাঁড়িয়ে পড়ত রাস্তার পাশে কোনো টেলিভিশন বিক্রয়কেন্দ্রে। মাস্তান হয়েও নাটকের বাকের ভাই জয় করেছিল দর্শক হৃদয়। বাকের ভাইয়ের ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে পোস্টারও লাগানো হয়েছিল কিছু কিছু এলাকায়। সংবাদপত্রেও উঠে এসেছিল বাকের ভাইয়ের খবর। আর যেদিন নাটকের শেষ পর্ব প্রচার হয়, সেদিন লেখক হুমায়ূন আহমেদের বাড়ির সামনে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। নাটকের চরিত্র হয়েও সে বছর বাকের ভাই ছিল দেশের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র।

একান্ত সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ
যখন সময় হবে চলে যাব

হুমায়ূন আহমেদের ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে ধানমণ্ডিতে তাঁর 'দখিন হাওয়া' বাড়িটিতে গিয়েছিলাম ২০১০ সালের ১৩ নভেম্বর। আড়ম্বরহীন ঘরোয়া আয়োজন ছিল সেদিন। উপহার হিসেবে কেউ আনছে ফুল, কেউ বই, কেউ মিষ্টি, কেউ বা বিরিয়ানি। ওই দিন ঘরোয়া আড্ডার ফাঁকে ফাঁকেই প্রায় দুই ঘণ্টা কথা হয় হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে। এটা সেই কথোপকথনেরই নির্বাচিত অংশ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফিরোজ এহতেশাম

ফিরোজ এহতেশাম : আপনি তো ১০০ বছর বাঁচতে চান। ৬২তম জন্মদিনে এসে কি মৃত্যুচিন্তা কাজ করছে?

হুমায়ূন আহমেদ : মৃত্যুচিন্তা আমার বহু আগে থেকে কাজ করে। যেকোনো সুস্থ মানুষের ভেতরেই মৃত্যুচিন্তা থাকবে। আজ (শনিবার) ৬২তম জন্মদিন বলে যে মৃত্যুচিন্তাটা বেশি বেশি কাজ করছে , তা না। আমার বয়স যখন ৩২ ছিল, তখনো আমার মৃত্যুচিন্তা কাজ করত। তখনো আমার মনে হতো যে আমি চলে যাব, পৃথিবী থাকবে পৃথিবীর মতো, সেখানে জোছনা হবে, বৃষ্টি হবে, আনন্দ থাকবে, গান থাকবে_সব কিছু থাকবে; কিন্তু আমি থাকব না_এটি ৩২ বছর বয়সেও নিতে পারতাম না, ৬২ বছর বয়সেও নিতে পারি না।

ফিরোজ এহতেশাম : আজ আপনার ৬২তম জন্মদিন। প্রতিক্রিয়া কী?

হুমায়ূন আহমেদ : জন্মদিনের এই মুহূর্তে আমার বিশেষ কোনো ভাবনা বা প্রতিক্রিয়া নেই। তবে আমার প্রায়ই মনে হয়, কচ্ছপের মতো অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী, সে বেঁচে থাকে ৩০০ বছর। অথচ মানুষের মতো এত মেধাসম্পন্ন একটি প্রাণী, তার আয়ু ৬০ হলেই সবাই মনে করে সব বুঝি গেল_এটা আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। আরেকটা বোধ কাজ করে , জীবনের একটা বছর চলে গেল। মনে হয় যেন শেষের পথে, চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

ফিরোজ এহতেশাম : এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোনো স্মৃতি বা ঘটনার কথা মনে পড়ে?

হুমায়ূন আহমেদ : ১৯৭১ সালের জুন মাসের পর, তারিখটা নির্দিষ্টভাবে মনে নেই, জুলাই-আগস্টের দিকে আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলাম। আমি আমার লেখায়ও সেটা লিখেছি। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুবই কাকতালীয় ও বিস্ময়করভাবে আ মি বেঁচে যাই। তার পর থেকে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দময় ও বিশেষ ঘটনা।

ফিরোজ এহতেশাম : এতটা বয়স শেষে কোনো অপূর্ণতাবোধ কাজ করে ?

হুমায়ূন আহমেদ : সব মানুষের জীবনেই অপূর্ণতা থাকবে। অতি পরিপূর্ণ যে মানুষ , তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও অতি দুঃখের সঙ্গে তার অপূর্ণতার কথা বলবে। অপূর্ণতা থাকে না শুধু বড় বড় সাধক ও মহাপুরুষদের। আমি কোনো বড় সাধকও না , আমি মহাপুরুষও না। কিন্তু আমার মধ্যে কোনো অপূর্ণতার বোধটা নেই। অপূর্ণতা হয়তো আছে।

ফিরোজ এহতেশাম : আপনি এতটাই জনপ্রিয় যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই অনেকের কাছে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আপনার দিকে কেউ যখন অবাক বিস্ময়ে তাকায়, তখন কেমন অনুভূতি হয়?

হুমায়ূন আহমেদ : একটা বয়সে খুবই ভালো লাগত , নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হতো। এখন সেটা মনে হয় না। এখন মনে হয়, কেন, আমি তো আর দশটা মানুষের চেয়ে কোনোভাবেই আলাদা কিছু না। লেখার যে প্রতিভা, সেটা আমি ওপর থেকে নিয়ে এসেছি, এই প্রতিভার জন্য অহংকার করার ক্ষমতা বা অধিকারও কিন্তু আমার নেই।

ফিরোজ এহতেশাম : আপনি যেহেতু মনে করেন , লেখার প্রতিভাটা ওপর থেকে নিয়ে এসেছেন, সেহেতু আপনার অহংকার হয় না; কিন্তু যদি মনে করতেন, এ প্রতিভা একান্তই আপনার নিজস্ব অর্জন, তাহলে কি অহংকার হতো?

হুমায়ূন আহমেদ : জানি না। হয়তো বা অহংকার হতো।

ফিরোজ এহতেশাম : কেউ যখন আপনার উচ্চ প্রশংসা বা তীব্র নিন্দা করে, তখন তা আপনার ওপর কেমন প্রভাব ফেলে?

হুমায়ূন আহমেদ : তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না। তাহলে একটা ঘটনা বলি, শোনো। আমার একটা সিনেমার অফিস ছিল কাকরাইলে। একদিন অফিসে আমি বসে আছি। কোনো কাজ-কাম নেই। সময় কাটানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই। অফিসের দরজা খোলা। অফিসের বাইরের করিডরে কয়েকটা চেয়ার। সেখানে বসে কয়েকটা ছেলেপেলে আড্ডা দিচ্ছে। বসে এরা উচ্চৈঃস্বরে বলছে, যাতে আমার কানে আসে যে হুমায়ূন আহমেদ একজন বড় লেখক ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি শুনতেছি। শোনার একটা পর্যায়ে মনে হলো, এরা যে কথাগুলো বলছে, এতে আমার কিচ্ছু যাচ্ছে-আসছে না। তারপর মনে হলো_আচ্ছা, এরা যদি বসে আমাকে গালাগাল করত, তাতেও কি আমার কিছু যেত -আসত? হঠাৎ লক্ষ করলাম, এতেও আমার কিছু যেত-আসত না।

ফিরোজ এহতেশাম : এখন কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

হুমায়ূন আহমেদ : এই মুহূর্তে আমি 'ঘেটু পুত্র কমলা' নামে একটি ছবি বানাচ্ছি। দুই ভাগে ছবিটার কাজ সম্পন্ন হবে। প্রথম ভাগের কাজ শেষ, দ্বিতীয় ভাগের কাজ ডিসেম্বরের ২২ তারিখ থেকে শুরু হবে। এখন পুরোপুরি এটা নিয়েই ব্যস্ত আছি। 'পুফি' নামের একটি উপন্যাস, যা কালের কণ্ঠ পত্রিকার সাহিত্য ম্যাগাজিন 'শিলালিপি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটা লেখার কাজ আপাতত অসমাপ্ত রেখে ছবির কাজ করছি। ছবি শেষ করে 'পুফি' লেখার কাজে ফিরে যাব।

ফিরোজ এহতেশাম : বাংলাদেশকে নিয়ে আপনার কোনো স্বপ্ন আছে?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি খুবই আশাবাদী মানুষ। বাংলাদেশ যখন অত্যন্ত খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তখনো আমি মনেপ্রাণে আশা করেছিলাম যে বাংলাদেশ বহুদূর যাবে। এখন বাংলাদেশ ভালো সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, আরো ভালো সময়ের মধ্য দিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, আমরা বহু বহু দূর যাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফিরোজ এহতেশাম : আপনার একটা লেখায় পড়লাম যে কোনো একটা বিষয়ে লেখার জন্য আপনি কিছু নোট নিয়ে রেখেছিলেন শর্টহ্যান্ডে, এখন আর তা থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারছেন না।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, শর্টহ্যান্ডে লিখেছি, পরে দেখি মেমোরিতে আসছে না। অনেকবারই চেষ্টা করেছি ওইভাবে টুকে রাখতে, পরে দেখি ওই সব আর রাখতে পারি না, হারিয়ে যায়, আর যা থাকে তা থেকেও কিছুই উদ্ধার করতে পারি না। তাই আর কিছু টুকে রাখি না। আর ঘুমের মধ্যে হয় কী _আমাদের

মেমোরিতে যা কিছু জড়িয়ে থাকে , তা রৌদ্রে শুকানো হয়, ঝাড়পোঁছ করা হয়। তখন কিছু কিছু ঘটনা আবার এলোমেলো হয়ে যায়, হয়ে ব্রেনে থাকে। এসব ঘটনা আবার রাতে স্বপ্নে দেখি আমরা। বিকট বিকট স্বপ্ন দেখি, যার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কিছু মিল থাকলেও বেশির ভাগেরই মিল নেই। আমাদের মস্তিষ্ক নিজে নিজেই ঘটনাগুলো ঝাড়পোঁছ করছে, কিছু এডিট করছে, কিছু ডিলিট করছে, কিছু কিছু আবার অ্যাডও করছে। এ জন্যই সমস্যা...এই হলো ঘটনা...।

ফিরোজ এহতেশাম : প্রেম বিষয়ে আপনার নিজস্ব কোনো চিন্তা আছে? মানব-মানবীর প্রেম কেন হয়?

হুমায়ূন আহমেদ : একটা ছেলে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে কেন? হোয়াট ইজ দ্য কেমিস্ট্রি অব লাইফ? প্রেম নিয়ে কত কবিতা, কত কাব্য রচনা করা হয়েছে, প্রথম দর্শনেই প্রেম ইত্যাদি। একটি কুৎসিত - কুরূপা, বেঁটে মেয়ের প্রেমে সচেতনভাবে কোনো ছেলে পড়বে না, কারণ নেচার বা প্রকৃতি। সে চায় বেটারটা, তাই রূপবতী মেয়ের প্রেমে ছেলেরা পড়ছে। নেচার চাচ্ছে পরের জেনারেশনে যেন রূপ আসে। একটা গায়কের প্রেমে কেউ পড়ছে, কারণ নেচার চাচ্ছে পরবর্তী জেনারেশনে যেন গায়ক আসে। লেখকের ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ নেচার চাচ্ছে লেখকের যে কোয়ালিটিগুলো আছে, তা যেন পরবর্তী জেনারেশনে আসে। এ জন্য ৯০ বছর বয়সে পিকাসোর প্রেমে পাগল হয়ে যায় ১৬ বছরের মেয়ে। নেচার চাচ্ছে পিকাসোর যে প্রতিভা, এটি যেন প্রবাহিত হয়। আমরা হয়তো ভাবি যে প্রেমে পড়ছি, আসলে তা প্রকৃতিরই খেলা। এটাই কেমিস্ট্রি অব লাইফ।

ফিরোজ এহতেশাম : ঈশ্বর বিষয়ে আপনার ভাবনা কী? আপনি তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আস্তিক?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ। আচ্ছা বলো, ঈশ্বর কি আছে? লজিক বলে যে নেই। তবে লজিকের অসম্ভব ক্ষমতা। যেকোনো লজিকের বিপক্ষে তুমি আরেকটি লজিক দাঁড় করাতে পারো। আমাকে এসে একদিন একজন বলল যে স্যার, সুনামি হইল, এতগুলো মানুষ মারা গেল , ছেলে-মেয়ে-বাচ্চা-শিশু_এরা তো কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে নাই। এরা যে মারা গেল তার দায়দায়িত্ব তো তাহলে সম্পূর্ণ আল্লাহপাকের, যদি আল্লাহ থেকে থাকে, আমাদের তো দায়দায়িত্ব না। লজিক স্ট্রং না?

ফিরোজ এহতেশাম : হ্যাঁ, মোটামুটি স্ট্রং লজিক...

হুমায়ূন আহমেদ : এই লজিকের বিপক্ষে আরেকটা লজিক দাঁড় করানো যেতে পারে। আমি তাকে বললাম, মনে করো তুমি একটি বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ আনমনে। তুমি যখন যাচ্ছ , তখন তোমার পায়ের নিচ দিয়ে দুই সারি পিঁপড়া যাচ্ছে, তাদের কারো মুখে ডিম , কারো মুখে বাচ্চা। তুমি তাদের পিষে চলে গেলে, জানলেও না। পিঁপড়াগুলো ভাবল, একি ঘটল! আমাদের তো কোনো দোষ নেই, কে আমাদের শত শত বাচ্চা মেরে চলে গেল! ঘটনা একই।

মনে করো, তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পাহাড় -পর্বতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ক্যামেরা কুড়িয়ে পেলে। পেয়েই তোমার মনে হবে_এটার একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। এটা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। তুমি অবাক হলে। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে একটি খরগোশ। এই খরগোশের যে চোখ , তা ওই ক্যামেরার চোখের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। তখন তোমাকে এই খরগোশেরও যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, তা স্বীকার করতে হবে।

ফিরোজ এহতেশাম : আচ্ছা, লজিকের খাতিরেই যদি বলি, আপনি বললেন যে সব সৃষ্টিরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। লালনের একটা কথা আছে যে সব সৃষ্টি যে করেছে তারে সৃষ্টি কে করেছে ? আপনি কী বলবেন?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আরজ আলী মাতুব্বরও এমন বলেছে। সব কিছুরই যদি ক্রিয়েটর থাকে , তাহলে বেসিক কোয়েশ্চেন, ক্রিয়েটরের ক্রিয়েটর কে? বিগব্যাং থেকে পৃথিবীর শুরু, সব কিছুর শুরু। তাহলে বিগব্যাংয়ের আগে কী ছিল?

ফিরোজ এহতেশাম : এটা তো এখনো জানা যায়নি।

হুমায়ূন আহমেদ : লজিক দিই, লজিক দিলে টের পাবে। একটা পিঁপড়া তো যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানী। এরা চাষ করে, এরা গরু পালে, এদের সোসাইটি আছে, সেনাবাহিনী আছে, এরা বাড়িঘর তৈরি করে। এরা হাইলি ডিসিপ্লিনড, আমরাও তা-ই। আমাদের পক্ষে কি সম্ভব পিঁপড়াকে আমাদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ শেখানো? সম্ভব না। ডিফারেন্সটা হচ্ছে জ্ঞানের লেভেলের। ওরা যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ নিয়ে এসেছে তা নিয়েই ওরা থাকবে। আমরা আমাদেরটা হাজার চেষ্টা করলেও তাদের শেখাতে পারব না, যদিও আমরা তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি উন্নত। তেমনি ঈশ্বরও এতই ওপরের স্তরের যে তার সঙ্গে কোনোক্রমেই কমিউনিকেট করা সম্ভব না। মাঝেমধ্যে উনি শুধু পয়গম্বরদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেটের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হয় না। যা -ই হোক, ধর্ম নিয়ে আলোচনা এন্ডলেস, এর কোনো সীমা নেই। তুমি এর পক্ষেও যেমন অসংখ্য যুক্তি দিতে পারবে , তেমনি এর বিপক্ষেও অসংখ্য যুক্তি দিতে পারবে। যেমন _দোয়া কি কাজ করে?

ফিরোজ এহতেশাম : বিশ্বাসীরা তো মনে করে যে দোয়া কাজ করে। কেন?

হুমায়ূন আহমেদ : আচ্ছা, তাহলে একটা ঘটনা শোনো। আমাদের প্রফেটের এক ছেলে ছিল, তার নাম ইব্রাহীম। প্রফেট তাঁর এই ছেলেকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি যেখানেই যেতেন, ১৭ মাস বয়সের ইব্রাহীমকে তাঁর সঙ্গে নিতেন। তারপর ছেলেটি মারা গেল। প্রফেট চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। এবং সেখানে তিনি একটি বাক্য উচ্চারণ করেন, যে বাক্যটি আজকাল অনেক হিন্দি ছবিতে ব্যবহার হয়।

তিনি উচ্চারণ করেন, একজন পিতার কোলে তাঁর সন্তানের মৃতদেহ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু। তিনি যখন চিৎকার করে কাঁদতে থাকলেন, তখন সাহাবিরা এসে বললেন যে, আপনিই তো বলেছিলেন_মৃত্যু মানে আল্লাহর কাছে যাওয়া , আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তো আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, আই অ্যাম ক্রাইং অ্যাজ এ ফাদার, নট অ্যাজ এ প্রফেট। তিনি যদি ফাদার হিসেবে ছেলের জন্য কাঁদেন, তাহলে অবশ্যই ফাদার হিসেবে ছেলের রোগযন্ত্রণা সারানোর জন্য, ছেলের জীবন রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, এর বাইরে তো তিনি যেতে পারবেন না। আল্লাহপাক কিন্তু প্রফেটের প্রার্থনা শোনেননি। যদিও বলা হয়ে থাকে, তিনি আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহপাক বন্ধুর কথাই শোনেননি, আর আমরা প্রার্থনা করলে ঘোড়ার ডিম কী হবে বলো!

ফিরোজ এহতেশাম : এই মুহূর্তে আপনার কি কোনো ঘটনা মনে পড়ছে , যা আপনাকে বেশ আনন্দ বা তৃপ্তি দিয়েছিল?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি যখন পিএইচডির শেষ পর্যায়ে, তখন আমার কাছে খ্রিস্টান পাদ্রিরা আসতে শুরু করল। তারা মনে করল, একজন বিধর্মীকে ওদের ধর্মে নিয়ে গেলে ওদের জন্য সুবিধা। আমি দেখলাম, ওরা প্রচুর পড়াশোনা করে, জানে। ওদের ধর্ম বিষয়ে যেমন ওরা প্রচুর জানে, আমাদের ধর্ম বিষয়ে তেমনি। আমি আমাদের প্রফেটকে হাইলাইট করার জন্য এক পাদ্রিকে বললাম যে_শোনো, আমাদের প্রফেট ছিলেন এমনই একজন মানুষ, তিনি যখন কারো সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন। তিনি যার সঙ্গে কথা বলতেন, তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলতেন না, তিনি পুরো বডিকে তার দিকে টার্ন করতেন, যাতে সে মনে করে তাকে ফুল অ্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে।

শুনে পাদ্রি বললেন, দেখুন, স্পন্ডিলাইটিস বলে একটা ডিজিজ আছে, যে ডিজিজে ঘাড়ের চামড়া শক্ত হয়ে যায়, আপনাদের প্রফেটের ছিল স্পন্ডিলাইটিস ডিজিজ। উনি ঘাড় ফিরাইতে পারতেন না বলে পুরো শরীর অন্যের দিকে ফেরাতেন। তাহলে তোমরা একটা ডিজিজকে হাইলাইট করছ কোন দুঃখে? হঠাৎ করে আমার এমনই মনটা খারাপ হলো যে ভাবলাম, আসলেই তো, একটা ডিজিজের জন্য তিনি এটা করতেন বলে আমরা এটাকে মানছি! তখন গড আমাকে হেল্প করল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা লজিক দিয়ে দিলেন এবং লজিকটা আমার তাৎক্ষণিকভাবে আসা। পাদ্রি তখনো বসা ওখানে, চা খাওয়া শেষ করেননি, আমি বললাম_আপনার কথাটা ভুল। আমাদের নামাজ পড়ার একটা সিস্টেম আছে, সিস্টেমে মাথা ফিরাইতে হয়। আমাদের প্রফেটের যদি স্পন্ডিলাইটিস ডিজিজ থাকত, তাহলে তিনি পুরো শরীর ফেরাতেন , উনি তো তা করেন না। তার এই ডিজিজ ছিল না, তিনি যেটা করতেন, তা শ্রদ্ধার জায়গা থেকে করতেন। তারপর আমি তাকে বললাম, আমি কিন্তু ঈসা (আ.) সম্পর্কে এজাতীয় কথা বলিনি। তিনি আমার কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, তোমার লজিক খুব পরিষ্কার , আসলেই তো তোমরা নামাজের সময় দুই দিকে মাথা ফেরাও।

ফিরোজ এহতেশাম : আর কোনো ঘটনা?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আরেকবার এভাবেই আমি জয়ী হয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে। সেখানে আমাকে একজন বলল, তোমরা তোমাদের মেয়েদের বোরকার ভেতর ঢুকিয়ে হিজাব-টিজাব পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছ, সভ্য জাতি হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে পারোনি। আমি বললাম, তোমরা যখন তোমাদের মেয়েগুলোকে হিজাব পরিয়ে বাইরে পাঠাও, তাদের অত্যন্ত সম্মান করো। আর আমাদের মেয়েগুলো হিজাব পরলে এত রাগ করো কেন? সে রেগে গেল_আমরা আমাদের মেয়েদের হিজাব পরিয়ে পাঠাই মানে! আমি বললাম, কেন, তোমাদের নানদের দিকে তাকিয়ে দেখো। তাদের ড্রেস আর আমাদের হিজাব পরা মেয়েদের ড্রেসের মধ্যে কোনো বেশকম আছে? তাকে একমত হতে হলো যে নানদের ড্রেসের সঙ্গে হিজাব পরা মেয়েদের ড্রেসের কোনো পার্থক্য নেই।

ফিরোজ এহতেশাম : আচ্ছা, যা-ই হোক, একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। কী উপহার পেতে আপনার ভালো লাগে?

হুমায়ূন আহমেদ : কোনো বস্তুগত উপহার পেলে খুশি হওয়ার স্টেজ তো আমি পার হয়ে এসেছি বহু আগেই, বুঝছ? যেমন কেউ একটা সুন্দর ফুল নিয়ে আসতেছে , চমৎকার লাগতেছে আমার কাছে। প্রচুর ফুল পেয়েছি। তবে ভালো বই পেলে এখনো খুব খুশি হই। ভালো বই মানে যে বইটা পড়ার আমার খুবই আগ্রহ আছে অথচ অনেক দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না _এ রকম একটা বই পেলে আরো খুশি লাগে। যেমন_'কেমিস্ট্রি অব কুকি' বলে একটা বই আছে। বইটা যদি হঠাৎ করে কেউ এসে দিত, আমার ভালো লাগত। কিংবা জাদুবিদ্যার কৌশলের ওপর বই যদি কেউ দিত, আমার খুব ভালো লাগত।

ফিরোজ এহতেশাম : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একবার বাইপাস অপারেশন হয়েছিল আপনার। এখন অবস্থা কেমন?

হুমায়ূন আহমেদ : হৃদরোগ আছে হৃদরোগের মতো, আমি আছি আমার মতো। ডাক্তার যে রকম জীবন যাপন করতে বলেছে, সেই জীবনযাপনের ধারেকাছেও যাইনি। প্রচুর সিগারেট খাচ্ছি। অসুখ নিয়ে মাথাই ঘামাই না। যখন সময় হবে, তখন চলে যাব। তবে আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আমি থাকব না, এই বাচ্চাগুলো বাবা ছাড়া বড় হবে_এটা নিয়ে সামান্য একটা টেনশন কাজ করে।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প

খাদক

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো , লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহংকারও আছে। কিসের অহংকার, কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন_ এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম_ খাদক মানে?

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না, আমাদের গ্রামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি আছে। নামকরা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কী সব যেন বলেছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

ও আচ্ছা।

আমি ভালো খাদকের দিকে তাকালাম।

রোগা বেঁটে খাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাকা; পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না , ইস্ত্রি করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রাবারের জুতা।

জুতা জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেওয়া হয়। যেমন আজ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম_ আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে , আমি এমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম_ এসব কী করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ -জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আরে আসুন, বসুন। অনুমতি আবার কিসের।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার মতো ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দুদিন ধরে আমি এই অজপাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চের দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দকার সাহেব আমার অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আদর -যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক জাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখানে কেউ খায়নি, কারণ গাছটার ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মতো গাছ _ দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধ মণ গোশত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই প্রফেসর সাহেবকে মেডেল দেখা।

মতি মিয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সিও,

রেভেন্যু, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেডমাস্টার। অন্যটিতে নামধাম কিছুু নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল_ একজন লোক পরিমাণে বেশি খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিকে হায়ার করে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মতির সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই দেখতে চায়।

কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই বললাম_ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা! দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা -নেওয়ার খরচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।

কর না কেন?

একসঙ্গে দুই-তিনটা কাম করলে কোনোটাই ভালো হয় না। আল্লাহ তায়ালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা, অন্য কোনো বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বিদ্যার অহংকারে মতি মিয়ার চোখ চিক চিক করতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না -কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের ১০ জনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রাম দেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসার সাব।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রান্না করা গোশত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে মতি, পারবি তো?

মতি হাসিমুখে বলল, আপনাদের ১০ জনের দোয়া।

খাওয়ার পরে দুই সের চমচমও খাবি। বিদেশি মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।

আলহামদুলিল্লাহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব, এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্র হ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সঙ্গে আমাকেও বসে থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হতো।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হলো। খোন্দকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারি হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতি খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এ রকম ওস্তাদ বেশি না থাকাই ভালো। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই গরু জবাই দিলাম, তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপ রে ভাই।

রান্নার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাওয়ার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে বলল_ গোশত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

তাই নাকি?

জ্বি। আর চাবাইতে হয় খুব ভালো কইরা। গোশত যখন মুখের মধ্যে তুলার মতো হয় তখন গিলতে হয়।

কায়দা-কানুন তো অনেক আছে দেখি।

বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোত্থেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানান ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্যবিষয়ক। দুই বছর আগে কোনো এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তাঁর সামনে আধমণ জিলেপি খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপির ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

জ্বি খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। ২০০ টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। পেসিডেন সাবরে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?

খুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশি হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন।

মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কী খাদক নাকি?

জ্বি না। তারা না-খাওন্তির দল। খাইতে পায় না। কাজ কামতো কিছুই করি না , খাওয়ামু কি? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন খাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যে আরাম আছে।

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হলো রাত ১০টার দিকে। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলোকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলো ক্ষুধার্ত। হয়তো রাতেও কোনো কিছু খায়নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন। স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ওসি সাহেব, পোস্টমাস্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসি জবেহ হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনায় প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এর আগেরবার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত ১২টার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে । সেই আগুনের চারপাশে সবাই বসে। শুধু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দুটি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হবো মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন _ কেমন দেখছেন?

ভালোই।

বলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাইতো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরি হবে। সকাল ১০টার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্লো হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

জ্বিব। শেষের দিকে এক টুকরো গোশত গিলতে ১০ মিনিট সময় নেয়। আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী মতি খারাপ লাগছে?

জ্বে না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, অসম্ভব_একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই , আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব! রাত ১টার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে_বাকি গোশত আমি খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয় _মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে , একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে_ কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে_হারলে হারব।

আমি জানি, বাস্তবে তা হবে না। সকাল ১০টা হোক, ১১টা হোক মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোনো দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খা দক হওয়া যায় না।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস
নন্দিত নরকে
মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান

মধ্যবিত্ত বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের মানসিক যাতনা ও রাজনৈতিক চেতনার মান সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদের প্রগাঢ় ধারণা ছিল। হুমায়ূন ধীরে ধীরে এ শ্রেণীর প্রধান ঔপন্যাসিকে পরিণত হলেন বা বলা যেতে পারে তিনি বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যার মধ্য দিয়ে এ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। আর হুমায়ূন ও তার যাত্রার শুরুতে নন্দিত নরকে বাঙালীর এ শ্রেণীর চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিলিয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদের অমরসৃষ্টি 'নন্দিত নরকে' এর উপজীব্য নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর টপকানোর স্বপ্নের অন্যান্য বর্ননা দিয়েছেন। যদিও তা উপন্যাসের আঙ্গিকে, কিন্তু মূলত তাঁর লক্ষ্য কাব্যধর্মী। হয়তো হুমায়ূনের কবিতায় প্রবল ঝোঁক ছিল, আর এ উপন্যাসে তা প্রবল এবং স্পষ্ট। উপন্যাসে নায়কের মা চরিত্র শানু। তবে নামটা আসলে শাহানা। আর হুমায়ূনের বর্ণনায়, 'শাহানা নামটা কী সুন্দর ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। ওপরের দিকে প্রায় দুই হাত ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম। ' এ বর্ণনার মধ্যেই বর্ণনাকারী আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিখুঁত ও পরিমার্জিত রূপ চিত্রায়ণ করেছেন। পাঠকের কাছে মনে হবে, এই দৃশ্য বর্ণনা হয়তো কোনো ক্যামেরার কাজ। উপন্যাসের এ বর্ণনা যেকোনো পাঠককে বাস্তবের বাঁশের বেড়া দেওয়া এরকম অজস্র নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরের মধ্যে হাজির করবে, পাঠক ভীষণ এক অস্বস্তিতে পড়বে এবং কোনোভাবেই মুক্তি পাবে না। বাঁশের বেড়া দেওয়া এই দৃশ্য বর্ণনায় পাঠক স্পষ্ট ধরতে পারবে এবং পাঠকই সিদ্ধান্ত নেবে এ পরিবারের এ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।

হুমায়ূন এই উপন্যাসে যে সমাজের বর্ণনা করেছেন সেখানে তাঁর চরিত্রগুলো ছোট ছোট পাওয়ার মাঝেই তৃপ্ত। এই যেমন_পুরান খাতা, বড় ভাইয়ের ছোট হয়ে যাওয়া শার্ট, এক গ্লাস দুধ, একটি ময়না পাখি। মানুষের ক্ষদে ক্ষুদে পাওয়া স্বপ্ন , ইচ্ছেকে যেনো ব্যক্ত করলেন ক্ষুদে স্বপ্নের এ কারিগর।

এই যে চাওয়া, জাতি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা কিন্তু হুমায়ূন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন। অর্থাৎ এ জাতি নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এর থেকে বেশি কিছু আশা করে না। তারা বিপ্লব চায় না , তারা কেউ রকফেলার হতে চায় না, তারা কেউ ফোর্ড হতে চায় না, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হুমায়ূন এ কারণে স্বপ্ন দেখেন, 'আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনু শীলুর মতো একটা ময়না এনে পুষুক, যেটি সময়ে অসময়ে শিস দিয়ে উঠবে।' এই ময়না পাখির সময়-অসময় শিস দিয়ে ওঠার যে স্বপ্ন তা মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত অর্থ সংকট থেকে নিশ্চিত জীবনের দিকে যাত্রার স্বপ্ন। যে জীবনে অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্নগুলো তাকে আর তাড়া করে ফিরবে না। উপন্যাসের চরিত্র হুমায়ূনের বাবা একজন সাদামাটা অ্যাকাউন্টেন্ট। দুই বিয়ের প্রথম ঘরের ছেলে মন্টু। ভীষণ রাগি এবং একাকী মগ্ন থাকাই যাঁর জীবন। যার বর্ণনা উপন্যাসে বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু পরিবারের অপ্রকৃতিস্থ মেয়ে রাবেয়া যখন হুট করে গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন বাবা ও প্রায় অসুস্থ থাকা মা যেন দিশেহারা হয়ে যান। যে মেয়ে ভালো করে সব কিছু বলতে পারে না , তার জন্য এ পরিবারের মায়া ও তীব্র ব্যাকুলতা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। সমাজের মুখ রক্ষায় ভুল চিকিৎসার বলি হয় রাবেয়া। শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসে এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কেউ না হয়েও যে পরিবারের সঙ্গে উপন্যাসের প্রথম থেকেই আছেন, সেই মাস্টার কাকা। পরিবারের আত্মমগ্ন মন্টু হয়ে ওঠে ভীষণ ক্ষীপ্র। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, '১২টার দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু দিন-দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালাফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা

মাছকাটা বঁটি দিয়ে।' এরপর নির্বিকার ভঙিতে মন্টুর কাছ থেকে বড় ভাইয়ের কাছে স্বীকারুক্তি পাই, 'দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।' যে মন্টু মাস্টার কাকার ঘরে ঘুমাত। সে কী তবে রাবেয়ার অনাহূত গর্ভধারণের পুরুষটিকে শনাক্ত করতে পেরেছিল? তবে রাবেয়ার শবদেহের যে বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক, সেই বর্ণনার মধ্যেই লুকিয়ে রাবেয়ার ভবিষ্যতের স্বামী -সন্তান ঘরের স্বপ্ন। লেখকের বয়ানে, 'আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখব। আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস! হলুদ রোদ এসে পড়েছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকে র সঙ্গে মিশে গেছে।' সমাজের মুখ থেকে বাঁচার জন্য ভুল চিকিৎসায় রাবেয়ার গর্ভপাত ঘটাতে না গেলে হয়তো কিংশুক নামের একটি ছেলে এই পৃথিবীতে আসত। কিন্তু নাম -পরিচয়হীন কোনো শিশুর এ সমাজে জায়গা নেই, হুমায়ূন তা জানতেন। বিশেষত তা যদি হয় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে।

এরপর মন্টুকে ঘিরে উপন্যাসের প্রধান ধারা প্রবাহিত হয়। 'যে মন্টুর জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির ছোঁয়ায় বুধের দ্রেক্কাণে। কাকা বলেছিলেন , এ ছেলে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।' সেই মন্টুর কিন্তু কোনো হদিস পাওয়া যায় না উপন্যাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত। শুধু ফাঁসির আদেশের পর জানা যায়, মন্টুর একজন প্রেমিকা ছিল, যার গায়ের রং শ্যামলা রঙের। ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে মন্টুকে দেখতে যাওয়া সপরিবারের সামনে ছোট বোন রুনুকে উদ্দেশ করে ; আসলে জগতকেই বলেছিল, 'রুনু মিয়া মরতে ইচ্ছে হয় না।' মূলত এ লাইনের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তা -ই ব্যক্ত করেছেন হুমায়ূন, হয়তো তা নিজের বেলায় আরো গভীর উপলব্ধি ছিল।

সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক মন্টুর লাশের জন্য উপন্যাসের নায়ক হুমায়ূন ও অ্যাকাউটেন্ট বাবা জেলখনার সামনে ভোরবেলা থেকে অপেক্ষা করে। আর ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, 'বাবা বললেন খোকা কয়টা বাজে?' বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক পকেটে জেলারের চিঠি। সেটি দেখালেই তারা মন্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মন্টুকে আমরা ঘরে নেব। ঘরে যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরআন শরিফ পড়ছেন।'

এই নন্দিত নরকের মধ্যেই আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের বাস। এখান থেকে শ্রেণী হিসেবে আমাদের মধ্যবিত্ত খুব বেশিদূর যেতে পারেননি।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু...
লেখক: শাহীন রেজা নূর ও আসিফুর রহমান সাগ

অবশেষে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত ও শুভানুধ্যায়ীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হুমায়ূন আহমেদ তার প্রিয়তম মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন। শ্যামল বাঙলা তার এই

কৃতিমান সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে অশ্রু সজল আজ । এইতো সেদিন মরণব্যাধি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক গেলেন তিনি। গোটা বাংলাদেশ আর বিশ্বময় বাঙলা ভাষাভাষীরা তার আশু আরোগ্যর ব্যাপারে সেই থেকেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে ফিরেছে। কিন্তু বিধাতার যে ইচ্ছে অন্যরকম। 'জীবনেরে কে রুধিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে' এই যখন বিধাতার অভিলাষ তখন সুস্থ হয়ে জন্মভূমিতে জীবিত ফেরা হোল না তার। মাত্র কদিন আগে চিকিৎসারত অবস্থাতেই একেবারেই নাড়ীর টানে একবার কয়েকদিনের জন্য এসেছিলেন তিনি। অতঃপর আবার চিকিৎসাকেন্দ্রে যাত্রা এবং অত্যল্পকাল পরেই এই শোকবিধুর প্রত্যাবর্তন। এবার এসেছেন তি নি অন্য এক বেশে, অন্য এক রূপে। নিথর দেহ তার, অগণিত ভক্তকুলের বিলাপধ্বনি কিংবা কোটি বাঙালির রুদ্ধ আবেগের মহাবিস্ফোরণ কোন কিছুই আর তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। অন্য লোকের বাসিন্দা তিনি এখন। যে লোক থেকে কেউ কোনদিন আর ফিরে আসে না। সেই অজানা অচিনপুর থেকে তিনি তার প্রিয় দেশ ও ততোধিক প্রিয় তার মা, পত্নী, সন্তান বা ভক্ত পাঠকদেরকে দেখতে পাবেন কিনা কেউ জানে না। তবে এ পারে ফেলে যাওয়া গুণগ্রাহী, ভক্ত অনুরক্ত ও তাদের অনাগত সন্তানেরা যুগ থেকে যুগান্তরে , কাল থেকে কালান্তরে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাবে বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনের এই প্রবাদপ্রতিম পুরুষকে। একদিন স্বীয় লেখনী, সুতীক্ষ্ণ রসবোধ, কর্মনৈপুণ্য আর মানুষের প্রতি এক সমুদ্র ভালবাসা দিয়ে সদম্ভে বিচরণ করেছেন তিনি এই বাঙলায়। তার অননুকারণীয় ও রাজসিক চলন বলন সাহিত্যিক মহলেতো বটেই সমগ্র বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলে তাকে দিয়েছে গৌরব ও উচ্চকিত মহিমা। হ্যামলিনের বংশীবাদকের মতো যাদুকরী সুরমূর্ছনায় তিনি এদেশের পাঠককুলকে মোহাবিষ্ট করেছেন। তার মোহন বাঁশীর সুরে সুরে নেচে উঠেছে পাঠকের প্রাণ, জেগে উঠেছে তার মন।

কোন এককালে হুমায়ূন আহমদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে শহীদ এক পুলিশ কর্মকর্তা পিতার ঔরসে এবং বাঙলার কোমল হৃদয় এক জননীর গর্ভে হলেও প্রকৃত জন্ম লাভ ঘটেছিল তার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের ঔরসে আর বাঙালির বীরত্ব গাঁথার গর্ভে।

তাই বার বার মানুষের অপরিমেয় শক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে তার লেখনী। বাহাত্তরে 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে যে ভীরু পদবিক্ষেপ পড়েছিল তার তা অল্পদিন পরেই এক বিশাল পদক্ষেপের রূপ নেয়, ইংরেজীতে যাকে বলে- ভৎড়স ধ ংসধষষ ংঃবঢ় ঃড় ধ মরধহঃ ষবধঢ়. ক্ষুরের দাপটে মেদিনী কাঁপিয়ে ফিরেছেন তিনি। সাহিত্যাঙ্গনে ছিল তার অবাধ বিচরণ। রাত্রিকালীন আকাশের অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জের অপরূপ বিভা কিংবা দিনের বেলার প্রচন্ড প্রভাত সূর্যের কিরণাচ্ছাদিত নীল আকাশের উজ্জ্বলতম রূপ তার রচনাসমগ্রেরই যেন প্রতিভাষ। শুভ্র জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা হুমায়ূন আহমদের লেখার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। এক মহাপরাক্রমশালী বী ররূপে তাই প্রতিভাত হয়েছেন তিনি পাঠক সমাজে। তার সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই লেখক আজ নিস্তব্ধ মৌন নিথর! এ যেন গিরী শৃঙ্গমালার

মহত্ মৌনীরূপ। বুঝিবা এ ধ্যান -নিমগ্ন অন্য এক রূপ তার! সবাইকে ফাঁকি দিয়ে মেঘলোকে উধাও হয়ে গেছেন হুমায়ূন আহমদ। কিন্তু স্বীয় অনন্যসাধারণ কৃ তী, কীর্তি ও অসামান্য গৌরব এবং মহিমা তাকে অমৃতস্য পুত্রের অভিধা এনে দিয়েছে। তিনি তাই আছেন , থাকবেনও চিরকাল। তিনি বাঙলার সাহিত্য প্রেমিকদের মনের মনিকোঠায় সদা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে রইবেন চিরদিন। তার এই অকাল তিরোধানে আমাদের মন সদা তাই বলে ওঠে: 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে/তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে'।

'আমি ঘরকুনো, গর্তজীবী মানুষ। ঘরে থাকতেই পছন্দ করি। গর্তে বাস করতে ভাল লাগে। গর্তে বসেই লেখালেখি করতে ভালো লাগে। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত লিখে যেতে চাই। লেখালেখিই আমার বিশ্রাম। লেখালেখি বন্ধ হলে আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে, আমি বাঁচতে পারবো না' – নিজের কথাকে সত্যি প্রমাণ করে মৃত্যুর আগে অপারেশনের টেবিলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষের জন্য একাধারে লিখে গেছেন হুমায়ূন আহমেদ। বাংলা সাহিত্যের বরপুত্র হয়ে এসেছিলেন তিনি। মানুষের দুঃখ , প্রেম, জীবন সংগ্রাম ও স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে যার লেখায় , যার লেখনী পাঠককে দিয়েছে আশ্রয়–সেই হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু গভীর শোক হয়ে বিরাজ করছে জাতির জীবনে। তাকে এক নজর দেখার জন্য , শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে পুরো জাতি।

সিলেটের এম. সি. কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এস কে রায় চৌধুরী সাহেবের বাড়ির উঠোনে বসে ছোট্ট বালক কাজল হাতে পেয়েছিল একটি বই। যে বইটি তার সামনে খুলে দিয়েছিল এক স্বপ্নদুয়ার। অধ্যাপক এস কে রায় চৌধুরীর মেয়ে শুক্লা সেদিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি দিয়েছিলেন তাকে। সেদিনের ছোট্ট কাজল বড় হয়ে বাংলার পাঠকের সামনেও খুলে দিয়েছিলেন সহিত্যের স্বপ্নদুয়ার। তার লেখা মানুষকে একাধারে কাঁদিয়েছে , ভাসিয়েছে খুশির বন্যায়। ভাবিয়ে তুলেছে দেশ, সমাজ ও মানুষ নিয়ে। বাংলাদেশের সাহিত্য বিগত চল্লিশ বছর তার হাত ধরেই পথ চলেছে। তার অসংখ্য উপন্যাস, ছোট গল্প বাংলার মানুষ বুকে জড়িয়েছে পরম মমতায়। তার সৃষ্ট হিমু চরিত্র আমাদের জীবনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, শিখিয়েছে নৈর্ব্যক্তিক হতে। মিসির আলী শিখিয়েছে যুক্তিবাদী হতে। ভারতমুখী সাহিত্যামোদীদের তিনি একাই বাংলাদেশমুখী করে তুলেছিলেন। ভালোবাসায় মানুষের যে অনতিক্রম্য জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছিলেন সেটাই বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের পালেও দিয়েছে হাওয়া।

আজ তিনি নেই। তার কফিন ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়ে সবাই তাকে জানাচ্ছে ভালোবাসা। উচ্চারণ করছে – এভাবে যেতে নেই হুমায়ূন। এত তাড়াতাড়ি যেতে নেই।

পেশাগত জীবনে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের মাঝে তিনি ছিলেন তুমুল জনপ্রিয়। আর ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে , শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা কথাসাহিত্যে এত জনপ্রিয়তা আর কারও মাঝে দেখা যায়নি। তিনি যেন গল্পের সেই পরশ পাথর- যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই ফলেছে সোনা। কেবল অধ্যাপনা আর কথাসাহিত্যই নয়, তিনি যখন অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিলেন সেখানেও সাফল্যদেবী তাঁর মুঠোয় ধরা দিয়েছে। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ঢল নেমেছিল। মাসের পর মাস ধরে এই চলচ্চিত্রটি বক্স অফিস দখল করে রেখেছিল। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে আটটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নিয়েছিল এই ছবিটি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া' বিদেশি ভাষার ছবি ক্যাটাগরিতে অস্কার পুরস্কা রের জন্য মনোনীত হয়েছিল। তাঁর অন্য কীর্তি 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'দুই দুয়ারী', 'চন্দ্রকথা' প্রভৃতি চলচ্চিত্র কেবল সুধীজনের প্রশংসাই পায়নি, মধ্যবিত্ত দর্শকদেরও হলমুখী করেছে বহুদিন পর। টিভি নাট্যকার হিসেবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। তাঁর প্রথম টিভি নাটক 'এইসব দিনরাত্রি' মধ্য আশির দশকে তাঁকে এনে দিয়েছিল তুমুল জনপ্রিয়তা। তাঁর হাসির নাটক 'বহুব্রীহি' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'অয়োময়' বাংলা টিভি নাটকের ইতিহাসে একটি অনন্য সংযোজন। নাগরিক ধারাবাহিক 'কোথাও কেউ নেই'-এর চরিত্র বাকের ভাই বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছিল টিভি দর্শকদের কাছে। নাটকের শেষে বাকের ভাইয়ের ফাঁসির রায় হলে ঢাকার রাজপথে বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবিতে মিছিল হয়েছিলো। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমনটি আর হয়নি কখনো। এছাড়াও অসংখ্য বিটিভি ও প্যাকেজ নাটকের নির্মাতা তিনি। নাট্যকার- নির্দেশক দুই ভূমিকায়ই সমান সফল। সফল শিল্পের আরেকটি শাখা চিত্রকলাতেও। তাঁর চিত্রশিল্পের স্বাক্ষর নিজ বাড়ির দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। মৃত্যুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার চিত্রকর্মের একটি প্রদর্শনীর আযোজন করা হয়েছিল।

শৈশব

নানাবাড়ি নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জের কুতুবপুর গ্রামে এক শীতের রাতে হুমায়ূন আহমেদের জন্ম। ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর। বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ ও মা আয়েশা ফয়েজের প্রথম সন্তান তিনি। ছোট বেলায় হুমায়ূন আহমেদের নাম ছিল শামসুর রহমান ; তাঁর পিতা নিজ নাম ফয়জুর রহমানের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম রাখেন শামসুর রহমান। পরবর্তীকালে তার পিতা আবারো নাম পরিবর্তন করে হুমায়ূন আহমেদ রাখেন। অত্যধিক বাড়াবাড়ি রকমের আদরের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশবের দিনগুলি কেটেছে। শৈশবে যতটা স্নেহ ও মমতায় কেটেছে দ্বিতীয় অধ্যায়টি কেটেছে ততটাই বঞ্চনার ভেতর দিয়ে। তবে হুমায়ূন আহমেদ সেখানে দু'বছর নানা-নানির আদরে বেড়ে উঠেন। দু'বছর পর মা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর দশ বছর বয়স পর্যন্ত হুমায়ূন আহমেদের মোহনীয় শৈশব কেটেছে। বাবার চাকরি সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিচিত্র সব দৃশ্যাবলীর ভেতর দিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর শৈশব অতিবাহিত

করেছেন। ১৯৬৫ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে তিনি এস.এস.সি. পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে তিনি এইচএসসি পাস করেন। এইচ.এস.সি. পরীক্ষাতে তিনি মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। ১৯৭২ সালে রসায়ন বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর পাস করে তিনি একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রফেসর যোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাসের তত্ত্বাবধানে পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি নেন। ড. হুমায়ূন আহমেদ লেখালেখিতে অধিক সময় এবং চলচ্চিত্রে নিয়মিত সময় দেবার জন্য পরবর্তীতে অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে দেন।

সাহিত্য জগতে প্রবেশ

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ‘নন্দিত নরকে’ উপন্যাস দিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আত্মপ্রকাশ। মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা সহজ সরল গদ্যে তুলে ধরে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তিনি। শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের কথকতা বয়ানেই সীমিত নয় তাঁর কৃতিত্ব , বেশকিছু সার্থক সায়েন্স ফি কশন-এর লেখকও তিনি। জনপ্রিয় চরিত্র মিসির আলী ও হিমুর স্রষ্টা তিনি - যে দু’টি চরিত্র যথাক্রমে লজিক এবং এন্টি লজিক নিয়ে কাজ করে। একে একে ‘শঙ্খনীল কারাগার’, ‘রজনী’, ‘গৌরিপুর জংশন’, ‘অয়োময়’, ‘দূরে কোথাও’, ‘ফেরা’, ‘কোথাও কেউ নেই’, ‘আমার আছে জল’, ‘অচিনপুর’, ‘এইসব দিনরাত্রি’সহ দুই শতাধিক উপন্যাসের জনক হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূনের বাবা ফয়জুর রহমান

কাজল। সিলেট থানার ওসি ফয়জুর রহমান সাহেবের বড় ছেলে। পুলিশ হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী। বিচিত্র খেয়ালী এই মানুষটি পরম মমতায় গড়ে তুলেছিলেন তার সন্তানদের। সন্তানদের মাঝে সাহিত্যের বীজও তিনিই রোপণ করেছিরেন। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের ভিতটা গড়ে ওঠে পারিবারিক বলয় থেকেই। বাবা বাসায় নিয়মিত সাহিত্য আসর বসাতেন, সেই আসরের নাম ছিলো সাহিত্য বাসর। গল্প লেখার অভ্যাসও ছিল তাঁর। গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থের নাম ‘রিক্তশ্রী পৃথিবী’। তাঁর বাবা সন্তানদের মধ্যে যেন সাহিত্য বোধ জেগে ওঠে সে চেষ্টা করেছেন সবসময়। মাঝে মাঝে দেখা যেত তিনি নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে ছেলেমেয়েদের কবিতা লিখতে বলতেন, ঘোষণা করতেন যার কবিতা সবচেয়ে ভাল হবে তাকে দেওয়া হবে পুরস্কার। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পিরো জপুর থানার ওসি। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে মৃতদেহ ফেলে দেয় ধলেশ্বরী নদীর পানিতে। স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ পানি থেকে তুলে নদীতীরেই দাফন করেন। পরবর্তীতে যুদ্ধশেষে তাঁর সন্তানেরা তাঁর দেহাবশেষ সেখান থে কে তুলে আবার কবর দেন।

হুমায়ূনের পরিবার

হুমায়ূন আহমেদের অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের আরেক জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সবার ছোট ভাই আহসান হাবীব রম্য সাহিত্যিক এবং কার্টুনিস্ট। তিন বোন সুফিয়া হায়দার , মমতাজ শহীদ, রুখসানা আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের প্রথম স্ত্রীর নাম গুলতেকিন আহমেদ। তাদের বিয়ে হয় ১৯৭৩ সালে। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তার তিন মেয়ে এবং দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করে। তিন মেয়ের নাম বিপাশা আহমেদ, নোভা আহমেদ, শীলা আহমেদ এবং ছেলের নাম নুহাশ আহমেদ। অন্য আরেকটি ছেলে অকালে মারা যায়। ১৯৯০ সালে শীলা আহমেদের বান্ধবী এবং তার বেশকিছু নাটকে অভিনয় করা অভিনেত্রী শাওনের সাথে হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্ঠতা হয়। পরে ২০০৫ সালে গুলতেকিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি শাওনকে বিয়ে করেন। শাওনের ঘরে তার তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম কন্যাটি মারা যায়। পরের দুছেলের নাম নিষাদ হুমায়ূন ও নিনিত হুমায়ূন।

এক নজরে হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম : ১৯৪৮, ১৩ নভেম্বর। নেত্রকোনা জেলার কুতুবপুর গ্রামে।

বাবা : ফয়জুর রহমান আহমেদ।

মা : আয়েশা ফয়েজ।

শিক্ষা

মাধ্যমিক, বগুড়া জিলা স্কুল, ১৯৬৫। উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ, ১৯৬৭। স্নাতক (সম্মান) রসায়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০। স্নাতকোত্তর (রসায়ন) ১৯৭২। পিএইচ.ডি., নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটি, ১৯৮২।

পেশা

অধ্যাপনা, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে স্বেচ্ছায় অবসর, পরবর্তীকালে লেখালেখি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

নন্দিত নরকে, লীলাবতী, কবি, শঙ্খনীল কারাগার, মন্দ্রসপ্তক, দূরে কোথায়, সৌরভ, নী, ফেরা, কৃষ্ণপক্ষ, সাজঘর, বাসর, গৌরিপুর জংশন, নৃপতি, অমানুষ, বহুব্রীহি, এইসব দিনরাত্রি, দারুচিনি দ্বীপ, শুভ্র,

নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই, আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, বৃষ্টি ও মেঘমালা, মেঘ বলেছে যাবো যাবো, জোছনা ও জননীর গল্প প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র

আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, আমার আছে জল।

পুরস্কার

একুশে পদক (১৯৯৪), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূধন দত্ত পুরস্কার (১৯৮৭), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

(১৯৯৩ ও ১৯৯৪), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮)। দেশের বাইরেও হয়েছেন মূল্যায়িত। জাপানের এনএইচকে টেলিভিশন তাঁকে নিয়ে একটি পনের মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে?

অভিমানী গুলতেকিনের সঙ্গে আর দেখাই হল না
লেখক: লাজিনা জ্যাসলিন

নুহাশ আহমেদ। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বড় ছেলে। যার নামেই রেখেছিলেন তার পরম আত্মিক জায়গার নামটি-নুহাশ পল্লী। এই নুহাশই সব সময় যোগাযোগ রাখতো বাবা হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে। যেতো নুহাশ পল্লীতে। বাবার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতো। এমনকি বাবার দুটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদকও সে।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম স্ত্রী গুলতেকিনের সাথে তার বিচ্ছেদের পর বাবার সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ রাখেনি তার তিন মেয়ে নোভা, শিলা ও বিপাশা। একই শহরে থেকেও তার সন্তানদের সাথে দেখা হয় না এই কষ্টের আকুতি তার মনের ভেতর ছিল সব সময়। আত্মীয় -স্বজনের আড্ডার পরিসরে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন বার বার। তবে বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর নিজেদের আর ধরে রাখতে পারেনি তারা। হুমায়ূনের ধানমন্ডির বাসায় স্বামীদের নিয়ে ছুটে চলে এসেছি লো তাকে এক নজর দেখতে। কন্যাদের দেখে হুমায়ূনের মনের ভেতর বয়ে যাওয়া উত্তাল ক্রন্দনকে সেদিনও লুকিয়ে রেখেছিলেন নিভৃতচারী কম বক্তা এই লেখক।

কিন্তু কখনোই গুলতেকিনের সাথে তার দেখা হয়নি। অভিমানী গুলতেকিন এখন থাকছেন যুক্তরাষ্ট্রে তার ছোট মেয়ে বিপাশার কাছে। যুক্তরা ষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১০ মাস ধরে হুমায়ূন আহমেদ চিকিৎসাধীন থাকলেও তাকে দেখতে আসেননি তিনি। এমনকি ফোনেও খবর নেননি।

ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ-গুলতেকিন। আনন্দময় গোছানো একটি সংসার ছিল তাদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন তার সহকর্মীদের হুমায়ূন নিজেই বলতেন মেয়েটি তাকে পাগলের মত ভালোবাসে। তিনি এও বলেছেন, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ নারী গুলতেকিন। তার লেখা অনেক গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন তিনি গুলতেকিনকে। এমনকি অনেক বইয়ের স্বত্ব দিয়েছেন তাকে। ধানমন্ডির একটি বাড়িও তাকে দিয়ে গিয়েছেন বলে জানা গেছে। আর দ্বিতীয় স্ত্রী শাওনকে দিয়েছেন সেন্টমার্টিনের সমুদ্র বিলাস কুটির।

হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় বিয়ের পর প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অভিমান করে চার সন্তান নিয়ে সরে আসেন গুলতেকিন। সেই দহনের জ্বালা আজও হয়তো তার হৃদয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। তাই মৃত্যুর পরও হুমায়ূনকে দেখতে আসেননি তিনি।

১৯৭৩ সালে হুমায়ূন আহমেদের সাথে বিয়ে হয় গুলতেকিনের। ২০০৩ সালে তাদের ছাড়াছাড়ি হলে হুমায়ূন আহমেদ ২০০৫ সালে বিয়ে করেন অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে। তাদের সাত বছরের বিবাহিত জীবনে জন্ম হয় নিষাদ ও নিনিতের। ।

এই দুই সন্তানই ছিল হুমায়ূন আহমেদের জীবনের শেষ সময়গুলোর একমাত্র আনন্দের সঙ্গী। তাদের শিশুসুলভ কাজ-কর্মে তৃপ্ত হতেন তিনি। তাইতো শিশুর মনোজগতে বিচরণ করে নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন। রঙ তুলির আচড়ে তুলে ধরেছেন তার চিন্তাকে , নিউইয়র্কের আকাশে মেলে ধরেছেন বাংলার সবুজ প্রকৃতি আর স্বপ্নীল আকাশ।

বিদায় মুহূর্তের মুখচ্ছবি
লেখক: নাসির আলী মামুন

প্রায় বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গাড়িটি জেএফকে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। আরোহী দীর্ঘদিন কোলন ক্যান্সারে বাংলাদেশের নন্দিত ও কিংবদন্তীতুল্য লেখক হুমায়ূন আহমেদ। পাশের সিটে ক্যামেরা হাতে প্রবল কম্পমান আমি। ১০ মে, ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে দেশে যাচ্ছেন মাত্র কুড়ি দিনের জন্য। তিনি উতলা , যেন তর সয় না। এত দীর্ঘ সময় আকাশপাড়ি দিয়ে

বাংলাদেশে পৌঁছানো তার জন্য মনে হলো অসম্ভব কোন জটিল কাজ। অথচ এই উড়াল পথে বহুবার যাতায়াত হয়েছে তার। আমি নিজেই জানালাম সম্প্রতি ক্যান্সারে আমার মায়ের মৃ ত্যুর খবরটি। বয়সটা শুনে বললেন বেশ ভাল আয়ু পেয়ে গেছেন তোমার মা। কিন্তু আমার কি-ই-বা তেমন বয়স। এখন মনে হয় 'জীবন এত ছোট ক্যানে'। নিউইয়র্কের ব্যস্ত হাইওয়েতে হুমায়ূন আহমেদের কথা শুনে বুঝে ফেলতে হলো তার মনের ঠিকানা। কবি শামসুর রাহমানের কথা মনে পড়ে গেল –'সৃষ্টিশীল মানুষদের ৫০০ বছর বাঁচা উচিত।' কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ আর কতদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন?

দীর্ঘকাল সৃষ্টিশীল মানুষদের মুখচ্ছবির দিকে পরখ করা আমার অনুসন্ধানী চোখ পাঠ করে পাশে বসা নীরব মুখটিকে। যদি নিজের জন্মভূমিতে উড়াল দিয়ে নিমিষেই চলে যেতে পারতেন। এরকম দাপুটে লেখকের পাশে আমি ওই মুহূর্তে মানসিক ডাক্তারের মতো তার মনের খবর মাপতে থাকি। দ্রুত জেএফকে তে চলে আসি আমরা। অনেকগুলো স্যুটকেস -মালামাল। সঙ্গে স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন এবং দুই ছেলে নিয়ে কাউন্টারের নিয়ম শেষ করে ঢুকে গেলেন ভেতরে। আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে যে যার গন্তব্যে ফেরত চলে আসি এবং হুমায়ূন আহমেদের আয়ু-পরমায়ু যেন আরও বহুকাল বহাল থাকে–তদবির পেশ করি মহান সৃষ্টিকর্তার বরাবর। দেশবাসী এবং বিশেষ করে বিনিদ্র হুমায়ুনভক্তকুল অপেক্ষা করছেন কবে আসবেন বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ।

হুমায়ূন চলে গেলেন বাংলাদেশে। কয়েকদিন পর দেশে ফিরে এসে আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের মাধ্যমে। ২৫ মে আমন্ত্রিত হই তাঁর তীর্থস্থান নুহাশ পল্লীতে আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য। গিয়ে দেখি টেলিভিশন চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা এবং প্রিয় মানুষদের কয়েকজন অপেক্ষা করছেন। সকাল সাড়ে ৭টায় হঠাত্ সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মত মর্নিং ওয়াক করার আদলে নুহাশ পল্লীর নিপুণ স্রষ্টা সর্টস পরা অবস্থায় আমার নাগালের মধ্যে চলে এলেন। ক্যামেরায় ফোকস করতেই বাক্যবিমিয়য় হয়। আমি ছবি তোলার কথা বলি। যেখানেই ছবি তুলতে চাই সম্মতি দেন অনায়াসে। একজন শিশুর মতো হুমায়ূন আহমেদ আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন সুইমিং পুলের এক কোণে যেখানে বিশাল হা করা তার নকশায় বানানো বিকট মুখটি সুইমিং পুলে জল ঢেলে চলেছে। ভাস্কর্যটির সাথে তার স্রষ্টার মুহূর্তটি বন্দি করে তার পেছনে পাতানো জবা ফুলের বাগানে ঢুকে পড়লেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করে আমার ক্যামেরা। গাছের সঙ্গে ফুলের সঙ্গে তার অনুরোধে ছবি তুল্লাম। ফিরে আসার পর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন মিডিয়ার সবাই। তাদের উদ্দেশ্যে হুমায়ুন বললেন , 'তোমরা আমার ছবি অনেক তুলেছো। এখন ওদের ছবি তুলো।' সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকায়! আবার বলেন , 'গাছের সাক্ষাৎকার নাও । ওদের সাথে কথা বলো। দেখো ওরা কি বলতে চায়। ওদের সাথে পরিচিত হও।' এমন সাদামাটা মরমিয়া কথা।

নুহাশ পল্লীতে প্রিয় সবগুলো জায়গায় আমার ক্যামেরা সচল ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর ধারা বর্ণনায় আমার ক্যামেরাটি গর্জে উঠছিল। আর যেন এইসব দুর্লভ মুর্হূত ধরা পড়বে না এই পৃথিবীর নিঃসঙ্গ এবং নাগরিক কোলাহল থেকে নিভৃত নুহাশ পল্লীতে। তিনি যেন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন নিজ হাতে সাজানো এই প্রকৃতি থেকে, এমন আঁচ করতে যাওয়াটা সহজ হলো যখন তিনি আমাকে দিয়ে প্রিয় গাছগুলোর ছবি তোলাতে থাকলেন। আঙুল মাটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন , 'এই গাছটি তুমি চাইলে তোমার বাসায় নিয়ে যেতে পার।' তৎক্ষণাত্ চাইলাম, নিয়ে যাব। হুমায়ূন জানালেন, এটা গাজার গাছ, নিতে পারবে না!

গাছ-গাছালি প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেকটি মুহূর্তের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করছি -এটা আমার লাগানো চা-বাগান। এখানকার চাহিদা মিটে যায় এই চায়ের পাতায়, বললেন তিনি। গেলাম তাঁর সঙ্গে পল্লীর শেষ প্রান্তে পুকুর পাড়ে।

কয়েক বছর আগে কলকাতার শেরীফ খ্যাতিমান লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন হুমায়ূনের সাজানো আখড়ায়। এই পুকুর পাড়ে ছিপ হাতে সুনীলের ছবি তুলেছিলাম। পুকুরের পেছনে গাছের তলে ফুল ছড়ানো। গুলতির মতো দুটি ডাল দু 'দিকে, সেই ডালে বসে ছবি তুললেন এবং এটি তার একা কিত্ব সময়ের এক প্রিয় জায়গা বলে জানালেন। মন খারাপ হলে এখানে চলে আসতেন। কাছেই দোলনায় দুই পুত্রকে নিয়ে তিনি দোল খেলতে খেলতে আমাদের ছবি তোলার সুযোগ করে দিলেন। দোলনার ঠিক উপরটায় গতকাল বেশ বড় এক অজগর সাপ কাঠের আড়া পেঁচিয়ে অনেকক্ষণ ছিল। কাজের লোকেরা আমার নিষেধের কারণে সাপটাকে মারেনি। এখানে জীব হত্যা করা নিষেধ। হুমায়ূনের কথায় প্রকৃতি ও জীবের প্রতি তার মমতা যে কতখানি উৎসর্গিত ভেবে বিস্মিত হই।

দুুটি লিচু গাছ আছে নূহাশ পল্লীতে। লিচু ধরে আছে -পাকা ও লাল। গাছের তলে বসে বিশ্রাম নিতে হলো কিছুক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের ক্লান্ত প্রজাপতি যেন ঘুমিয়ে যাবেন। চোখ বুজে আসে। কিন্তু কথা থামে না। জানালেন এই গাছটির লিচু পাখির জন্য। আর ওই গাছটির লিচু আমাদের জন্য। একটু পরেই একদল শিশু আসবে। তোমরা অপেক্ষা করো, দেখবে কতো আনন্দ করে ওরা লিচু পেড়ে খাবে।

নূহাশ পল্লীতে একটা বড় কুয়া তৈরি করেছিলেন তি নি। বাঁধানো পাড়ে বসে পুত্র নিষাদকে নিয়ে বসে পানির দিকে তাকিয়ে... ক্যামেরায় সতর্ক ফোকাস করে দৃশ্যটি ধরে রাখি মমতায়। আরেকটি ইমেজ জ্বলে ওঠে পানির উপরিতলায়। সবকিছু ধরতে গিয়ে আমার মনে হয় এই মানুষটি আজ এত উতলা কেন তার সাজানো প্রকৃতির নির্লিপ্ত প্রান্তরে। এই ভে বে অসংখ্য ছবি তুলি আমি। হায় , আর বোধহয় কোনদিন তাকে আলো ফেলে ধরা যাবে না। তবু সকলের মতো মনকে বলি তিনি ফিরে আসবেন আমেরিকা থেকে চিকিৎসা শেষ করে। কিন্তু ফিরে তো আসলেন না।

শেষ দিনগুলো

লেখক: বিশ্বজিত সাহা

দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় দফা অস্ত্রোপচারের ২৯ দিন পর গত ১৯ জুন নিউইয়র্ক সময় দুপুর ১টা ২৩ মিনিটে নিম্ন রক্তচাপ-এর ফলে জননন্দিত কথা-সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমদকে চিকিৎসকরা বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন। প্রায় তিন সপ্তাহ লাইফ সাপোর্টে থাকার পর অনেকটা নীরবে-নিভৃতে কিছু না বলেই চলে গেলেন বাংলা ভাষার কিংবদন্তি এই লেখক।

১২টি কেমো থেরাপি বা প্রথম অস্ত্রোপচারের পরও হুমায়ূন আহমেদকে কখনো বিমর্ষ দেখায়নি। সবসময় তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত। হাসপাতালের বিছানায়ও হাসতে হাসতে অবলীলায় বলতেন মৃত্যু নিয়ে রসাত্মবোধক গল্প। সেই মানুষটি কিছুই বলে যেতে পারেন নি , কিছু লিখে যেতে পারেননি শেষ মুহূর্তে। জুনের শেষ সপ্তাহে মুখে বলতে পারেননি , তবে লিখে জানতে চেয়েছিলেন কবে তার শরীর থেকে এসব যন্ত্রপাতি খোলা হবে। কবে তিনি আরোগ্য লাভ করে বাসায় যাবেন? কখনোই তিনি ভাবতে পারেননি তিনি এভাবে চলে যাবেন। আমার এখনো জ্বল জ্বল করছে প্রথম অস্ত্রোপচারের আগে সার্জেন্ট মিলারকে নিজেই জিজ্ঞেস করেছিলেন কত শতাংশ নিশ্চয়তা রয়েছে তার ভালো হবার। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন–আমি অস্ত্রোপচার করলে শতভাগ। উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল হুমায়ূন ভাইয়ের দুচোখ এবং তারপর অনেক আনন্দ নিয়ে মা মাতৃভূমি আর অতি ভালোবাসার নুহাশ -পল্লী দেখতে গিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদ দেশ থেকে ফিরে এলেন যেন আনন্দ-উৎসব করে। বললেন, অনেক ভালো লেগেছে দেশে গিয়ে। মাকে নিয়ে হুমায়ূন ভাইয়ের ভালোবাসার শেষ নেই। মা ছেলের চিকিৎসার জন্য দিয়েছেন সারা জীবনের সঞ্চয়। মুহম্মদ জাফর ইকবাল হুমায়ূন ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পরপরই বেলভ্যু হাসপাতালে বললেন আমাদের পরিবারকে আবার একটি মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে কিন্তু দাদাভাইয়ের মৃত্যু মা মেনে নিতে পারবেন না।

দেশ থেকে আসার পর হুমায়ূন ভাইয়ের ভালো লাগার গল্প প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হতো। বিশেষ করে সুস্বাদু বাঙালি খাবারের গল্প। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারির বইমেলায়, এরপর আবার নিউইয়র্কের বইমেলার প্রয়োজনীয় কাজ করতে মার্চে। প্রতিবারই দুসপ্তাহের জন্য ছিলাম। একবারও আমি হুমায়ূন ভাইকে আগে থেকে জানাইনি ঢাকায় যাচ্ছি। যেদিন ফ্লাইট ছিল সেদিনই তিনঘণ্টা আগে গিয়ে বলেছি, আমি ঢাকায় যাচ্ছি। মাঝখানে একটি থেরাপির সময় আমি শুধু ছিলাম না। আর একটি থেরাপির আগেরদিন নিউইয়র্কে পৌঁছে গেছি। বলে গেছি হুমায়ূন ভাই আমি নেই, রুমা (আমার স্ত্রী রুমা সাহা) আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। একটি বিষয়ে গত ৯ মাসে উনি নিশ্চিত ছিলেন, ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট থাকলে সে আমাদের গাড়ি দিয়ে হোক বা সাবওয়ে হোক বা অন্য কারো গাড়ি করে নিয়ে যাবার জন্য

বিশ্বজিত হাজির থাকবেই। উনার এ বিশ্বাস-এর কখনো অমার্যাদা হয়নি। এনিয়ে অনেক সময় অনেক কথাও হয়েছে। দেখা গেছে হুমায়ূন ভাইকে বাসা থেকে ঘুম থেকে উঠিয়েও হাসপাতালে নিতে হয়েছে। অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। ১৯৮৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দপত্র ঈদ সংখ্যায়' প্রকাশিত উপন্যাস 'প্রিয়তমেসু' নিতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সাথে ঘনিষ্ঠতা। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই অপরাহ্নে ২৫ বছরের একটি সম্পর্কের ছেদ, একটি বন্ধনের সমাপন।

আমার এখনো মনে আছে হুমায়ূন ভাইয়ের যখন দ্বিতীয় কেমো থেরাপি চলছে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে, সেদিন সকালে হুমায়ূন ভাই আমাকে বললেন বিশ্বজিত ক্যান্সারের চিকিৎসা শেষে এবার হার্টেরও চেকআপ করিয়ে যাবো। গতবার ২০০১ সালে তুমি বেলভ্যু হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু আমি চিকিৎসা না করে চলে গেছি। এবার চিকিৎসা করিয়ে যাবো। তিন ঘণ্টার মতো লাগতো সময়, এরপর পোর্টেবল থেরাপি সঙ্গে দিয়ে হুমায়ূন ভাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হতো।

কোনকিছু অপছন্দ হলে স্যার সরাসরি বলে দেন। এর প্রয়োজন নেই বা অন্যকিছু। কোন এক প্রসঙ্গে এরপরই কেমো থেরাপির খরচ জানার জন্য একদিন বেলভ্যু হাসপাতালে যাই। পুরো একাউন্ট সেকশন ঘুরেও আমি জানতে পারিনি সিটি হাসপাতালে এর খরচ কতো। দুজন বাঙালি কাজ করেন এ ডিপার্টমেন্টে। তারা চেষ্টা করেও আমাকে জানাতে পারেনি। আমার শ্বাশুড়ীমার রেফারেন্সে পরিচয় হলো বেলভ্যু হাসপাতালে কর্মরত রনি বড়ুয়ার সঙ্গে। এরই মধ্যে হুমায়ূন ভাইরা বেড়াতে যাবেন লেখক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও পূরবী বসুর ডেনভারের বাড়িতে। মহা আয়োজন। যাবার দিন কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে গেলেন, এসে পেলেন হাসপাতালের কার্ড। আমেরিকায় যারা থাকেন তাদের সকলেই জানেন, কারো অনুপস্থিতিতে কি কখনো তার হাসপাতালের কার্ড হয়। হুমায়ূন আহমেদের বেলায় সেটাই হয়েছিল। তারপর হুমায়ূন আহমেদ ডেনভার থেকে ফিরে আসলেন। এসেই পেলেন বেলভ্যুর এপয়েন্টমেন্ট। আগে থেকেই আমি এপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি এবং অঙ্কোলজিস্ট ডা. জেইনের অধীনে চিকিৎসা শুরু। কাড়ি কাড়ি নগদ টাকা দিয়ে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়নি। এভাবেই স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতাল থেকে লেখক হুমায়ূন আহমেদের বেলভ্যু হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়। এরপর আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কারো কাছে দ্বারস্থ হতে হয়নি তাকে। বিক্রি করতে হয়নি নিজের গড়া কোন সম্পত্তি। ঋণ নিয়ে হুমায়ূন ভাই সবসময় চিন্তিত থাকতেন। পত্রিকায় সাক্ষাৎকারেও বলেছেন চ্যানেল আই-এর ঋণ তিনি দেশে গিয়ে শোধ করে দেবেন। স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালের তিনটি থেরাপির খরচ বহন করার পর চিকিৎসার জন্য আর কোন খরচ বহন করতে হয়নি হুমায়ূন ভাইকে। মুক্তধারা থেকে বেলভ্যু হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

দীর্ঘ ৯ মাসে হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনগুলোর অনেক কথা লেখার ইচ্ছে রয়েছে। এ বছর নিউইয়র্কের বইমেলা নিয়েও ছিল হুমায়ূন ভাইর অনেক স্বপ্ন। একদিন নিজে থেকেই বললেন বিশ্বজিত এবারের বইমেলায় একটি অনুষ্ঠান হবে 'শতবর্ষের বাংলা গান'। টপ্পা থেকে শুরু করে হাল আমলের গান পর্যন্ত। প্রতিটি গানের শুরুতে গানটির ইতিহাস হুমায়ূন ভাই বলবেন। তখন আলো পড়বে হুমায়ূন ভাইয়ের ওপর। এরপর গান করবেন মেহের আফরোজ শাওন, তখন আলো থাকবে তার ওপর। গান শেষে আলো পড়বে যন্ত্রীদের ওপর। হুমায়ূন ভাইয়ের স্বপ্নের অনুষ্ঠানটি হলো না , হলো না তাকে সম্মাননা জানানোর অনুষ্ঠানটি। হয়েছিলো তার আঁকা প্রথম চিত্র প্রদর্শনী। ২০টি ছবি স্থান পায় এই প্রদর্শনীতে। এটিই হলো হুমায়ূন ভাইর জীবদ্দশায় তার ছবির প্রথম ও শেষ প্রদর্শনী। সে সময় তিনি ছিলেন বেলভ্যু হাসপাতালের সিসিইউতে। আসতে পারলেন না হুমায়ূন ভাই বইমেলায়।

হুমায়ূন আহমেদ শারীরিকভাবে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন, হুমায়ূন আহমেদের অনেক স্মৃতি আজ উঁকি মারছে। বলেছেন চিকিৎসা শেষ করে কলকাতায় যাবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে , কলেজ স্ট্রিটের আদর্শ হিন্দু হোটেলের গল্প শুনে বলেছেন, সেই হোটেলে খেতে যাবেন।

২.

১৯৯৭ সালে আমেরিকায় বইমেলা উদ্বোধন করলেন হুমায়ূন আহমেদ। সারাদিন মুষলধারে বরফ পড়ছে। তখন বইমেলা হতো ফেব্রুয়ারির শেষদিকে। প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে (১২ ইঞ্চির ওপর তখন বরফ পড়েছিল) উদ্বোধনের সময় লোকজন থাকবে কিনা সন্দেহে ছিলাম। সন্ধ্যা ৮টায় উদ্বোধন। হুমায়ূন আহমেদ পৌনে ৭টায় মিলনায়তনে আসলেন। ৩০ মিনিটের মধ্যে শত শত হুমায়ূন ভক্ত ঘিরে ধরলেন তাদের প্রিয় লেখককে। অটোগ্রাফ শিকারীদের কবল থেকে উঠে ফিতা কেটে বইমেলা উদ্বোধন করলেন তিনি। আবার অটোগ্রাফ দিতে বসলেন। একজন পাঠক গোটা ৩০ বইতে স্বাক্ষর করালেন। অপেক্ষারতরা ছিলেন ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু সেই লাইন আমি কখনো ভুলবো না। সেদিন একজন কিশোরী এসে বলেছিল স্যার আপনাকে আমি একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি? আরেকজন মুখে বলতে পারেননি কিন্তু তার প্রিয় লেখককে স্পর্শ করতে গিয়ে লেখককে ফেলেছিলেন বেকায়দায়। সে যাত্রায় রক্ষা পাওয়ার জন্য হুমায়ূন আহমেদকে সিগারেটের অজুহাতে অটোগ্রাফ দেয়া থেকে উঠে যেতে হয়।

হঠাত্ করে একদিন বিশেষ খামে একটি চিঠি এলো মুক্তধারায়। চিঠিটা খো লা হলো। আমেরিকার লস এঞ্জেলেসের একটি জেলখানা থেকে। একজন বাঙালি জেলখানা থেকে মুক্তধারায় চিঠি লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদের ২০১০ সালে প্রকাশিত বই চেয়ে। মানে পাঠকের আগের বইগুলো পড়া। জেলখানা থেকেও হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ার আকুতির কথা কি কখনো ভুলার ?

এরকম আরো অনেক ঘটনা। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ যাচ্ছেন, ইমিগ্রেশন পার হচ্ছেন। বাঙালি ইমিগ্রেশন অফিসার এসে সালাম করে হতবাক করে দিলেন বা প্লেনে ওঠার পর ককপিঠে প্লেন চালক সিগারেট খাওয়ার জন্য স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কত রকম ঘটনা। এ রকম আরো উল্লেখ করার মতো মজার ঘটনা আছে যা পরবর্তীতে লেখার ইচ্ছে আছে।

৩.

স্যার আসলেন ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে আমেরিকায়। লেখা শুরু করলেন 'প্রথম আলো' এবং 'কালের কণ্ঠে'। নিজের মৃত্যুর কথা নিয়ে এমন রসিকতা (রসবোধ) করলেন তাতে পাঠকরাই শিউরে উঠলেন। অসুস্থতার মধ্যেও লেখা ও পাঠ করেই কাটছে তার সময়। এক কলামে লিখলেন নিউইয়র্ক লেখক গাজী কাশেমের বইয়ের কথা। আমেরিকা প্রবাসী বাঙালি লেখককুল হুমায়ূন আহমেদের কাছে পাঠাচ্ছেন তাদের গ্রন্থ। শ পাঁচেক বই ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে তার হাতে। এটি এক অনন্য উদাহরণ, শুধু সব বয়সী পাঠকদের কাছে নয় নবাগত লেখকদের কাছেও তিনি সমান জনপ্রিয়।

নন্দিত নরকে, শংখনীল কারাগার লিখে সাড়া জাগিয়ে সত্তর দশকের শুরুতে বাংলা সাহিত্যকাশে তার যাত্রা। এরপর এক এক করে তার সুনিপুণ লেখনীতে সৃষ্টি করেছেন মিসির আলী , হিমুর মত চরিত্র। আবার মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখেন বিশাল ক্যানভাসের 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প'। ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস মধ্যাহ্ন ও বাদশাহ নামদার বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে সমানভাবে সমাদৃত। আত্মজৈবনিক লেখা আমার ছেলেবেলা, কিছু শৈশব, বল পয়েন্ট, ফাউন্টেন পেন, কাঠ পেন্সিল এবং সর্বশেষ রং পেন্সিল পাঠকদের আগ্রহের নতুন সংযোজন। 'দেয়াল' প্রকাশিত হবার আগেই তার লেখনীর যাদুকরী স্পর্শে করেছে দেশব্যাপী বিশাল আবেদন। হয়তো দেয়ালই হয়তো তার লেখা শেষ বই। আমার যতদূর মনে পড়ে হুমায়ূন ভাই বলেছিলেন তার মৃত্যুর পর তার অনূদিত কোরান শরীফ প্রকাশিত হবে। সেটি এখন কোথায় এবং কোন অবস্থায় রয়েছে সেটাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আগ্রহের বিষয়।

৪.

২৬ জুন অনেক রাতে গিয়েছিলাম বেলভ্যু হাসপাতালে। রাত ১১টা বেজে গেছে। আমি আর আমার স্ত্রী। প্রায় দেড়ঘণ্টা ছিলাম হুমায়ূন ভাইয়ের পাশে। ২৯ জুন নিউইয়র্কের বইমেলা শুরু, তাই নানান ঝামেলায় দিনে যেতে পারতাম না। যতবারই চলে আসতে চেয়েছি, হুমায়ূন ভাই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার জন্য। দেড়ঘণ্টায় তিনবার চাইলেন পানি , পানি, পানি। আমরা পানি

পান করালাম। এরপর যতবারই গিয়েছি, হুমায়ূন ভাইর সাথে আর কথা হয়নি। চিনতে পারেননি আমার উপস্থিতি। হুমায়ূন ভাই, আর কখনো বলবেন না আর কিছুক্ষণ থাকো।

হুমায়ূন ভাই ২০ জুলাই দেশে যাচ্ছেন। সারা দেশের মানুষ, আপনার মা, ভাই-বোন, আপনার সন্তান নোভা, শীলা, বিপাশা, নুহাশ এবং সন্তানগুলোর মা আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। আপনি কি এবারো সরাসরি আপনার তৈরি করা নন্দনকানন নুহাশ চলচ্চিত্রে যাবেন। সেখানে খাসি জবাই হবে। আনন্দ হবে। আবার আপনি চিকিৎসা করাতে নিউইয়র্কে ফিরবেন, আপনাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাবো। আর হবে না এসব কিছুই এটাই এখন সত্য।

‘মৃত্যু নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই’
লেখক: মাসউদ আহমাদ

হুমায়ূন আহমেদের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

হুমায়ূন আহমেদ। বহুমাত্রিক সৃজনশীলতায় উদ্ভাসিত এক নাম। একের ভেতর বহুর সম্মিলন। তিনি গল্পের সেই পরশপাথর, যেখানেই হাত দিয়েছেন সোনা ফলিয়েছেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, নাট্যনির্মাতা, চলচ্চিত্রকার ও গীতিকার। বিচরণক্ষেত্রের সর্বত্রই সফল তিনি। তবু নিজেকে হুমায়ূন আহমেদ স্টোরি টেলার অর্থাত্ গল্পলেখক বলে পরিচয় দিতেই ভালোবাসতেন। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন। এরই ফাঁকে গেল মে, মা ও মাতৃভূমির টানে কিছুদিনের জন্য দেশে এসেছিলেন। তখন ইত্তেফাকের ঈদসংখ্যার জন্য দুদিন ধরে হুমায়ূন আহমেদের নিজের গড়া নন্দন কানন নুহাশ পল্লীতে দীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকা র নেওয়া হয়, যার অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করা হলো। পুরো সাক্ষাৎকারটি পেতে হলে পাঠককে অপেক্ষা করতে হবে ইত্তেফাকের ঈদসংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত। সম্ভবত এটিই তার দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার। এখানে তিনি তার সাম্প্রতিক লেখালেখি-সৃজনপ্রয়াস-পড়াশোনা-মৃত্যুভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন তরুণ গল্পকার মাসউদ আহমাদ।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার লক্ষ্যে আপনি দীর্ঘদিন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে আছেন; অল্প কিছুদিনের জন্য দেশে এলেন এবং বিমানবন্দরে নেমেই, ধানমন্ডির বাসা দখিন হাওয়ায় না গিয়ে সরাসরি নুহাশ পল্লীতে চলে এলেন। কেমন লাগছে?

হুমায়ূন আহমেদ : তোমরা একসঙ্গে এত সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্ক্ষী এসেছ, আমার খুব ভালো লাগছে। আর দীর্ঘ জার্নি করে আসছি তো, মাঝখানে বিমান লেট ছিল, শরীরটা যে খুব ভালো তাও না। এসেই ধাতস্থ হতে কিছুটা গুছিয়ে নিতে হয় , সেটা এখনো হয়নি। তবু আমার খুবই ভালো লাগছে। বন্ধুবান্ধবের

অনেককে খুব মিস করছিলাম, ওদের সবাইকে পাচ্ছি, আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছেন। ভালো লাগছে। আর নুহাশ পল্লীর গাছপালাকে মিস করছিলাম খুব। ওরা আমার সন্তানের মতো। গাছপালার কাছে ফিরে এসে খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

আপনার মা, তাকে আপনি অনেক ভালোবাসেন; একটু আগে তিনিও বলছিলেন– আপনাকে কাছে পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত, তার প্রতীক্ষা আনন্দে রূপ পেয়েছে। মায়ের কাছে ফিরে এসে আপনার অনুভূতি কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : তোমরা যেমন নাকি কান্নার মতো জিনিস আশা কর, সেটা আমার মধ্যে নাই আসলে। মাকে দেখেছি, ব্যাস, ফুরায় গেল। হাউমাউ করে কান্না , জড়ায় ধরা– এসব আমার মধ্যে আগেও ছিল না, এখনো নাই।

স্যার, অল্প কিছুদিন পরে আপনি আবারও আমেরিকায় চলে যাবেন। এখন আপনি অনেকটা সুস্থ। এ মুহূর্তে আপনার কেমন বোধ হচ্ছে? আপনার ভক্তরা অপেক্ষায় আছে, আপনি কেমন আছেন তা আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য...

হুমায়ূন আহমেদ : আমাকে দেখে তোমাদের কেমন লাগছে বলো। ভালো? ভালো লাগছে, তাই না? আমি আমেরিকায় ভালোই ছিলাম। আমি এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি-অসুখকে জীবনে কোনোদিনই পাত্তা দেইনি। এখনো দিচ্ছি না। যেটা হওয়ার, হবেই। এটা নিয়ে হা-হুতাশ করে দুনিয়া মাতানোর তো কিছু নাই , আমি কিছু মাতাচ্ছি না। আমার ধারণা , আমি ভালোই আছি। আবার আমেরিকায় ফেরত যাব। ওখানে আমার একটা অপারেশন হবে। বিষয়টা একটু গুছিয়ে বলি। জিনিসটা হচ্ছে তোমার ক্যান্সারটা হয়েছিল কোলনে , বৃহদান্তে। ক্যান্সার হওয়া খুব কমন একটা ব্যাপার। কমন ব্যাপারটা এ কারণে , আমেরিকা বা পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশে ক্যান্সার হলে প্রবলেমই মনে করে না। ওটা কেটে ফেলে দেয়। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এ বিষয়টি নেই। কাজেই জীবনে পলি ব্যাপারটা নাই। পলি হল, সেটা বড় হল, পরে সেটা ক্যান্সারে রূপ নেয় এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে তৈরি হয়। আমারটা ঠিক তেমনি, পলি থেকে ক্যান্সার হয়ে গেল, আমি টের পেলাম না। সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা চেকআপে ক্যান্সারটা ধরা পড়ল। চলে গেলাম আমেরিকায়। সিঙ্গাপুরে ট্রিটমেন্ট করলাম না এ কারণে যে , আমাদের অনেক প্রিয়জন সিঙ্গাপুরে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে মারা গেছে। অবশ্য আমার নিজের এত সিয়ারসনেস ছিল না। বন্ধুদের জোরাজুরিতে চিকিৎসাটা করাতে হলো। এখন চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেখা গেল–আমার ক্যান্সারটা ফোর্থ স্টেজে রয়েছে। এর আগের স্টেজগুলো পার করে আসছি এবং ফোর্থ স্টেজ কিন্তু ভয়াবহ স্টেজ। বাই দিস টাইম, বৃহদান্ত থেকে ক্যান্সারটা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে গেছে। ডাক্তাররা কন্ট্রোল করা র চেষ্টা করল আগে। তারা চেষ্টা করল এবং খুব একটা যে সাকসেসফুল হলো তা না। একটা পর্যায়ে গিয়ে ডাক্তার মোটামুটি হতাশ হয়েই বলল, এ মুহূর্তে বিশেষ কিছু বলতে পারছি না। তোমার তো মনে হয় বাকি

জীবনটা কেমোথেরাপি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে যদি বাঁচি আমি কতদিন বাঁচতে পারব? ডাক্তার বলল, দুই বছর বাঁচতে পারবা। এটা যে কোনো মানুষের কাছেই একটা কঠিন ধাক্কার মতো। যখন তুমি জানবে তোমার আয়ু আছে আর মাত্র দু 'বছর। তাই না? এই ধাক্কাটা শোনার পর মনটা খুব খারাপ হলো। বাই দিস টাইম , তারা আমাকে রেফার করল সার্জিক্যাল অনকোলজিতে, সার্জনের কাছে। সেখানে সার্জনরা আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে বলল, এই লোকের তো আর কিছু করা যাবে না। পরে তারা তারিখ দিল ১২ জুন। তারা এ তারিখে একটা মেজর অপারেশন করবে আমি ডাক্তারকে বললাম, অপারেশন করলে আমি তো মারা যেতে পারি, তাহলে এই সময়ের মধ্যে আমি আমার দেশ, বন্ধুবান্ধব, মা, আমার গাছপালাকে দেখে আসতে পারি? ডাক্তার বলল, অবশ্যই পার। এ সূত্রেই বাংলাদেশে আসা। তার মানে আমেরিকায় ফিরেই আমি মরে যাব , তা কিন্তু না।

অপারেশন নিয়ে ডাক্তাররা আর কিছু বললেন?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার মরার সম্ভাবনা কতটুকু? ডাক্তার আমাকে বললেন, তার নাম হচ্ছে জর্জ নীলা। তিনি কখনো রোগীর দিকে তাকান না, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। তিনি বললেন, তোমার অপারেশনটা যদি আমি করি তাহলে তোমার মরার সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্য। জিরো পার্সেন্ট। এই সম্ভাবনা তো সংক্রমণের মতো। তবু দেশে এসে গাছপালা, মানুষ দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের আদর পাচ্ছি এবং সর্বোপরি আমার মা তো আছেনই।

আমেরিকায় গিয়ে কোন জিনিসটা আপনি বেশি মিস করেছেন?

হুমায়ূন আহমেদ : তোমাদের একটা গল্প বলি। সত্যি গল্প। আমেরিকায় যাওয়ার পর, আমার মায়ের সারাজীবনের সঞ্চয় ডলার করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন হঠাত্ করে। তার সমস্ত সঞ্চয় হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশ ডলার। এই টাকার বেশিরভাগই কিন্তু আমার পাঠানো। আমি মাসে মাসে অ্যালাউন্স দেই তাকে, সেটা জমিয়ে ব্যাংকে রাখে। এভাবে তার এই টাকাগুলো হয়েছে। আমাকে সবগুলোই পাঠিয়ে দিয়েছে। এ ডলারগুলো পেয়ে প্রথমে একটু রাগ উঠল মায়ের প্রতি। তার নিজের কাছে কোনো টাকা -পয়সা না রেখে সবটা পাঠিয়ে দিল? তারপর মনে হল, ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ মহিলাকে দেখতে যাওয়া উচিত এবং আমার জন্য এটা খুবই জরুরি। কাজেই চলে এলাম। ৮০ বছর বয়স আমাদের দেশ হিসেবে অনেক বয়স কিন্তু। আমেরিকার হিসাবে আবার এটা কোনো বয়স না। ওখানে ৮০ বছরের বুড়াবুড়ি সমানে গাড়ি চালাচ্ছে , কাজ করছে, দৌড়াচ্ছে, বারে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে। জীবনটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করছে। আর আমাদের দেশে ৬০ বছর পার হলেই জায়নামাজ নিয়ে বসে পড়ি। আল্লাহ আল্লাহ করি। কখন মারা যাব তার ঠিক নাই।

স্যার, আপনার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর কোনো লেখায় একবার বলেছিলেন বাংলাদেশে একটা বিশ্বমানের ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ে তুলবেন। এটা একটা স্বপ্নের কথা হিসেবেই বিবেচনা করব ?

হুমায়ূন আহমেদ : বিপদে ফেললে। আমি এই কথাটা আমার লেখায়– 'নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ'-এ খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে বলছি, তা না। ঝোঁকের মাথায় মনে এসেছে লিখে ফেলেছি। পরে ভেবে দেখলাম, এটা মহাবিপজ্জনক। আমেরিকা বা পৃথিবীজুড়ে যারা আছেন , তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন আমার ওপরে–এই ক্যান্সার ইনস্টিটিউট কখন হবে এবং কীভাবে হবে? অনকোলজি ডাক্তাররা বললেন, আমরা আপনার এখানে অপারেশন করে দেব। কাজ করব। এমনকি নার্সরাও বলল, আমরা বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করতে চাই। এ বিষয়ে তারা খুবই আগ্রহ দেখাল। টাকা -পয়সা নিয়ে অনেকে এগিয়ে এল এবং কী পরিমাণে যে সাড়া পেলাম– আনবিলিয়েভল। আমি যেহেতু কথা দিয়েছি , কতটুকু পারি বা না পারি , সেটা পরের ব্যাপার, শুরু তো করতে হবে। একটা বিখ্যাত লাইন আছে না কনফুসিয়াসের – Journey of thousand mile start with... প্রত্যেকটি কাজই এক হাজার মাইলের দীর্ঘ যাত্রা। আমাকে শুরু করতে হবে। আমি না পারি, নুহাশ করবে; তাকে হয়ত কেউ সাহায্য করবে।

যেকোনো সৃজনশীল লেখক মানুষ ও প্রকৃতিকে নানাভাবে দেখেন, অনুভব করেন; আপনি কবে থেকে এই পর্যবেক্ষণে নিমগ্ন হলেন?

হুমায়ূন আহমেদ : সৃজনশীল মানুষ প্রকৃতিকে অন্যরকমভাবে দেখে , তাই তো? শোন, প্রতিটি মানুষই– প্রতিটি হিউম্যান বিং সৃজনশীল। তুমি সৃজনশীল হিসেবে আমাকে আলাদা করতে চাও কেন ? তুমিও তো সৃজনশীল। অনেকে করে কী– হয়ত লিখছে না, তুমি লিখছ না, ছবি আঁকছ না, তার মানে কি সে সৃজনশীল না? এটাতো হতে পারে না। ইচ এন্ড এভরি পারসন– প্রতিটি মানুষই সৃজনশীল। কেউ লেখে , কেউ আঁকে, কেউ ছবি তোলে, কেউ ছবি তোলে না। যেমন নাসির আলি মামুন , দুনিয়ার ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। আমরা তাঁকে সৃজনশীল মানুষই বলব। তুমিও তো সৃজনশীল। কারোটা প্রকাশ হচ্ছে কারোটা হচ্ছে না। কাজেই আমার মতে, প্রতিটি মানুষই অসম্ভব সৃজনশীল।

লেখালেখির মাঝেই আপনি চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন, এবার আঁকিয়ে হিসেবেও নাম লেখাচ্ছেন আনুষ্ঠানিকভাবে। জুন মাসে , নিউইয়র্কে আপনার আঁকা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী হচ্ছে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন...

হুমায়ূন আহমেদ : মূলত প্রকৃতি নিয়ে ছবিগুলো এঁকেছি। আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে যাইনি - একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম। একটা বিশাল কিছু হয়ে গেল ; আমি এরমধ্যে নাই। প্রকৃতি নিয়ে কিছু কাজ করছি। সমস্ত ছবি একসাথে করে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে আর কি।

আমাদের জীবনে মৃত্যু তো অনিবার্য। এই মৃত্যু নিয়ে আপনার বিবেচনা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। মরে গেলাম ফুরায় গেল। তবে এটা আমার কাছে খুব পেইনফুল। একটা মানুষ এত ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে , ৭০ বা ৮০ বছর বাঁচে। তারপর শেষ। আর একটা কচ্ছপ সাড়ে তিনশ বছর বাঁচে। হোয়াই? কচ্ছপের মতো একটা প্রাণির এতবছর বাঁচার প্রয়োজন কী?

ভুলিব না, কভু ভুলিব না
লেখক: মহাদেব সাহা

হুমায়ূন, সবাই এ কী কঠিন দায় চাপালো আমার কাঁধে, কী লিখবো আপনাকে নিয়ে, আপনি কতো কোটি আটলান্টিকের ওপারে, কী লেখা যায়; খুব বেশি বাক্যালাপই তো ছিলো না আপনার সাথে আমার, দ্যাখা হলে মিষ্টি হেসে ছোট একটি শব্দে আমাকে সম্বোধন করতেন, কবি, কেমন আছেন? এটুকোই, আপনাকে যারা জানে, এই বাংলাদেশ, নুহাশ পল্লী, বৃক্ষ, লতা-পাতা, স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তারাই বলতে পারে আপনার কথা। আমি খুব সামান্য জানি , মাত্র একবার আপনার গাড়িতে নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টা গিয়েছিলাম কবি নির্মলেন্দু গুণের বাড়িতে, সেই একসঙ্গে অনেক সময় কাটানো, অনেক পথচলা; এরপর আরেকবার একটা মজার ঘটনা, আজিমপুর কবরস্থান মার্কেটের দোতলায় কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার একটা কম্পিউটার কম্পোজের প্রেস ছিল, আপনি এসেছিলেন সেখানে, আমি সন্ধ্যার দিকে সেখানে গেছি, গিয়ে দেখি তুমুল কাণ্ড, এক দাঁতের ডাক্তার এক মহিলার খারাপ দাঁতটি রেখে ভাল দাঁতটি তুলে ফেলেছে , মহিলা চিৎকার করে কাঁদছে, আপনি ভীষণ ক্ষেপে গেছেন ডাক্তারের উপর, আপনার একই কথা, এই ভাল দাঁতটি যেমন করেই হোক আবার লাগিয়ে দিতে হবে, অন্য কিছু বুঝি না; আপনার বলার ধরন, কথা বলা, সে তো আপনারই মতো, একেবারেই আলাদা, তার মধ্যে যে জোর, তার মধ্যে যে বলিষ্ঠতা, তা শুনে ডাক্তার বেচারি হতভম্ভ, আমাকে দেখেই সেই ডাক্তার যেন আশ্রয় খুঁজে পেল , দাদা আপনি তো কবি, আপনি জানেন আমার বাবাও কবি ছিল, দ্যাখেন উনি কী বলে, এই তোলা দাঁত আমি লাগাবো কী করে? হুমায়ূন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কবি, এই লোককে আমি ছাড়বো না। আমি ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, উনাকে চেনেন, উনি হচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ, ডাক্তারের চোখ তো কপালে উঠে গেছে, উনি হুমায়ূন আহমেদ? আমি বললাম জ্বী, আপনি এক্ষুণি উনার কাছে মাফ চান , না হলে আপনার রক্ষা নাই, হুমায়ূন আহমেদ আপনাকে নাটকের চরিত্র বানিয়ে দেবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার। এই তো সামান্য পুঁজি, গভীর আড্ডা, পানাহার, দীর্ঘসময় গল্প, এসব কোন কিছুই তেমন করে আপনার সাথে আমার হয়নি। আপনি একবার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, আজিমপুরে, আপনি তখন থাকেন সম্ভবত আজিমপুরের দিকেই সুফিয়া ভবনে , চারতলায়, আমার যা হয়, যাবো যাবো করেও আর যাওয়া হয়নি;

অন্য প্রকাশে কতোবার আপনি এক দরজা দিয়ে ঢুকেছেন , আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। দেখেছি আপনাকে দূর থেকে, মেলায় ভক্ত পরিবৃত, আপনার একটা স্বাক্ষরের জন্য ছেলেমেয়েরা কী ব্যাকুল, আমি দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আপনি যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন খুব কথা হয়নি আপনার সঙ্গে, অনেক কথা কি রয়ে গেছে, ওই যে সেই গানের লাইন, 'তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন'। কিন্তু কী হবে এখন বলে, আমার এই কথা, এই ডাক, সে কি পৌঁছবে আপনার কাছে, আপনি কোথায় আছেন, 'দূরে কোথায়, দূরে দূরে', সে কোন পৃথিবীতে, তার কোনো নাম নেই, মানচিত্র নেই, রোড ম্যাপ নেই, তবু সেই অনন্তের কাছে আমি আমার সব না -বলা কথা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার জন্য যতো ভালোবাসা, যতো অশ্রু; বাংলাদেশের সব অশ্রু আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, এই অশ্রুর প্লাবন, এই অশ্রুর কাব্য, এই অশ্রুর অনন্ত পঙিতমালা। এই অনুভূতিগুচ্ছ বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উৎসারিত, বাংলাদেশ আপনার জন্য কাঁদছে, কিন্তু আপনি সমস্ত অশ্রু, সমস্ত বেদনা, সমস্ত কান্নার ওপারে। এ এক অন্তহীন শূন্যতা, সব আছে, আকাশ আছে, নক্ষত্র আছে, দিনরাত্রি আছে, ঘরবাড়ি আছে, গাছপালা আছে, যেখানে যে জিনিসটি ছিলো সব আছে, ভাবা যায়, শুধু এতো পরিচিত, এতো কাছের, এতো প্রিয় মানুষটি নেই, কোথায় সে, সে কোথায় চলে যায়, এই প্রশ্ন গত কদিন ধরে আমাকে পাগল করে তুলছে; টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, অনুরাগীরা সবাই আমাকে বলতে বলে, কী বলবো আমি, শোকের দুঃখের একমাত্র উচ্চারণ তো নীরবতা, মৌন হয়ে থাকা, 'একবিন্দু নয়নের জল, কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'।

প্রিয় হুমায়ূন, বন্ধু, আপনি আমাদের সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক, খ্যাতিই বলি আর জনপ্রিয়তাই বলি আপনি তার শীর্ষে, সম্ভবত পাঠকপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন আপনি। আমরা একটু আগে পরে প্রায় একই সময়ে লেখালেখি শুরু করি, আমরা কবিতা, আপনি উপন্যাস, যদিও কবিতা দিয়েই নাকি আপানারও লেখার সূচনা। সে সময়ে কবিতারই প্রতাপ , কবিতার সেই অপ্রতিহত আবেগের সময় উপন্যাস নিয়ে আপনার যাত্রা, 'নন্দিত নরকে'। তখন বা তার মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের মতো তরুণ কবিদের একগুচ্ছ কবিতার বই বেরিয়েছে, কবিতার সেই অপ্রতিরোধ্য কল্লোলের মুখে 'নন্দিত নরকে'-ই ফিকশনের প্রথম প্রবল ধাক্কা, আপনার 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' কবিতা অনুরাগীদের কাছে প্রথম ভিন্ন এক আকর্ষণ, এও যেন কিছুটা কবিতার মতো, কবিতার পাঠকেরা সানন্দে হাতে তুলে নিলো উপন্যাস। ক্রমাগত তা বাড়তে থাকল, পরে আশির দশকের মাঝামাঝি এসে উপন্যাসের প্রতি এই আকর্ষণ ও আগ্রহ দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিতে শুরু করল সবকিছু। আপনি হয়ে উঠলেন এই গদ্য - জাগরণের নতুন নায়ক, ক্রমাগত বাড়তে লাগল আপনার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা, সে যেন শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত। এই যে চললেন, আর পেছন ফিরে তাকাতে হলো না আপনার। আমাদের দেশে এরকম ঘটনা বোধহয় এই একটাই, আর সেই ঘটনার রূপকার আপনি; বিজ্ঞানের ছাত্র, কিছুটা লাজুক ও

সপ্রতিভ হুমায়ূনের হাতে বাংলা উপন্যাস পাঠকপ্রিয়তার এক নতুন মাত্রা পেল; সেই ইতিহাসও কম কৌতূহলোদ্দীপক, কম বিস্ময়কর নয়।

যতোই দিন যেতে লাগল, পাঠক ততোই লুফে নিতে লাগল আপনার উপন্যাস। হুমায়ূন , এই পাঠক সৃষ্টিতে আপনার অবদান অসামান্য , এখানে আপনি বাংলার কিংবদন্তি; আমি জানি, সুবোধ ঘোষের বেস্ট সেলার যে বইটি, 'ভারতপ্রেম কথা' তার সর্বোচ্চ বিক্রির পরিমাণ ছিল ষাট হাজার কপি, আর আপনার এক মেলাতেই বিক্রি হয়েছে লক্ষাধিক, সারা বছরে কয়েক লক্ষ, উচ্চভ্রূ কেউ কেউ একে বাঁকা চোখে দেখতেই পারেন, জনপ্রিয়তাকে বলতেই পারেন সস্তা ব্যাপার, না, জনপ্রিয়তা সস্তা ব্যাপার নয়, এক অর্থে জনপ্রিয়তাই সব, লেখক জনপ্রিয়তার জন্যই লেখে, পাঠকের অন্তর স্পর্শ করার জন্যই লেখে, যাঁরা চোখ কুঞ্চিত করে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস', বা কাফকার 'মেটামরফসিস'–এর কথা বলবেন, তাদের বলতে চাই, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কী, রবীন্দ্রনাথ তো সব থেকে জনপ্রিয়, গানে, গল্পে, কবিতায়; চারশো পাঁচশো বছর পরও শেকসপিয়র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, তিনি কী, তিনি কি পাঠকের অন্তর জুড়ে নেই?

হুমায়ূন, বহু বছর পর লেখকের সম্মানের যে ভাবমূর্তি আপনি ফিরিয়ে এনেছিলেন তার মূল্য অনেক। আমি বুঝি, আমি স্যালুট করি, বাংলা গদ্যের যে দুর্দান্ত বহমানতা সৃষ্টি করেছেন আপনি , যে দুরন্ত গতিশীলতা, তা কাকে না মুগ্ধ করে, আপনার লেখা সরাসরি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে, আন্দোলিত করে পাঠককে, ভীষণ কমিউনিকেটিভ, এই সম্মোহনী শক্তি আপনাকে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অদ্বিতীয় ও অসামান্য করে তুলেছে। আপনার লেখার স্বতঃস্ফূর্ততা , সাবলীলতা, গতিশীলতা ও অনায়াস ভঙ্গিতে গল্প বলে যাওয়ার জাদুকরী ক্ষমতা, এর তুলনা হয় না, একে ছোট করে দ্যাখার মধ্যে ঈর্ষা আছে, সংকীর্ণতা আছে, সততা নেই। সাহিত্যের প্রতি সত্ থেকে একজন লেখকের এই শক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আপনার লেখার আরেকটি বড় গুণ, মানবিক আবেদন, রসসৃষ্টি, আপনার এক্সপ্রেশনটাই আলাদা, পাঠককে আচ্ছন্ন করে; চারপাশের এতো নিষ্ঠুরতার মধ্যে মানুষ একটু কোমলতা চায় , একটু স্নিগ্ধতা চায়, একটু মমতা ও সংবেদনশীলতা চায় , মানুষের এই তৃষ্ণা আপনি অকাতরে পূরণ করেছেন। উপন্যাস লিখেও আপনি বার বার ফিরে গেছেন কবিতার কাছে, আমার তো মনে হয়, আপনি উপন্যাসের কবি, কী যে ভালোবাসা আপনার কবিতার প্রতি, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ জুড়ে আছে আপনার অন্তর , আপনার উপন্যাসের নামকরণে বারবার তো এই কবিতারই পঙিত, 'বসন্তের দিন যায়' 'শ্যামল ছায়া', 'আমার আছে জল','আগুনের পরশমনি', 'মেঘ বলেছে যাব যাব,' 'সবাই গেছে বনে', কিংবা 'দারুচিনি দ্বীপ' বা 'ডুবে গেছে পঞ্চমীর চাঁদ', এই সবকিছুর মধ্যে অন্তঃসলিলার মতো বহমান এক উদার মানবিক আবেদন , এই রুক্ষতার মধ্যে যা মানুষের মনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্নিগ্ধ জলবায়ুর মধ্যে নিয়ে যায় ; জ্যোৎস্না ও বর্ষা দুইই আপনার খুব প্রিয়, দুইই আপনাকে ব্যথিত, কাতর ও আবেগময় করে তোলে, আপনার পাঠকেরাও সিক্ত হয় এই বর্ষায়, এই জ্যোৎস্নায়। লোকগীতি, বাউল, মরমী গানের মধ্যে ডুবে-থাকা এ

এক অন্য জগতের লেখক, যার রচনা অনিবার্যভাবেই মোহগ্রস্ত করে পাঠককে। না হলে এমন লক্ষ লক্ষ পাঠক তৈরি হতো না। আরো আছে, আছে রহস্যময়তা, আছে অতিপ্রাকৃতের কিছু কিছু হাতছানি , সেও তো কবিরই জগত্। আপনার লেখার গাঁথুনি খুব শক্ত , কিন্তু পাঠকদের কাছে সহজ, অন্তরস্পর্শী, কী সব কালজয়ী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন আপনি , 'হিমু', 'মিসির আলি', 'বাকের ভাই'; এই যে একই মানুষের মধ্যে দুই মানুষ; একজন স্বাভাবিক, একজন অস্বাভাবিক, উদ্ভট, এলোমেলো, ভিতরের এই মানুষটিকে কীভাবে আবিষ্কার করেছেন আপনি? পাখির কণ্ঠে আপনি তুলে দিয়েছেন অনন্ত ধিক্কার –'তুই রাজাকার', মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অংশগুলোকে আপনি রূপ দিয়েছেন আপনার উপন্যাসে, এসবই খুব বড় কাজ। আপনি যেখানেই থাকেন, আমাদের মধ্যেই থাকবেন, এই বাংলার ঘাস, ফুল, লতা, বর্ষা, বৃষ্টি, জলধারা, আকাশপ্লাবিত জ্যোৎস্নার মধ্যে, আপনাকে কে ভোলে, 'যে ভোলে ভুলুক/কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না/ আমি কভু ভুলিব না', বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটি, জল আপনাকে ভুলবে না; হুমায়ূন আপনার জন্য আমার ভালবাসা, অশ্রু নিঃশব্দ হাহাকার।

দূরে কোথায় দূরে, দূরে
লেখক: আবেদ খান

হুমায়ূন আহমেদ তার 'বাদশাহ নামদার' গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন তিন হুমায়ূনের কথা। এক হুমায়ূন হলেন মোঘল সম্রাট হুমায়ূন, যিনি বাদশাহ নামদার বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র; আরেকজন তিনি, যিনি নিজের সঙ্গে বাদশাহ হুমায়ূনের অনেক সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। আরেক হুমায়ূন হলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একসময়ের প্রতিবেশী বরেণ্য নাট্যজন হুমায়ূন ফরিদী।

বৃহস্পতিবার রাতেরবেলায় কুমিল্ল-া থেকে ফিরছিলাম সড়ক পথে। টরেন্টো থেকে আমার পুত্র প্রিয় খুব ভারী গলায় বলল, 'বাবা, খবরটা জানো?' তার এই নাটকীয় প্রশ্নে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এখন চারপাশে এত অস্বস্তি ঘাপটি মেরে বসে আছে–তার তো অন্ত নেই। এর মধ্যে কোনটা হঠাত্ শ্বাপদের হিংস্রতা নিয়ে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কে জানে!

আশঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে?'

সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'হুমায়ূন আহমেদ...'।

কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'নেই?'

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এলো অনেক পরে।

আমার সঙ্গে হুমায়ূনের সখ্য ছিল বটে, তবে বেশি যাতায়াত ছিল না। আমি অনুমান করতাম হুমায়ূন আমাকে খুব পছন্দ করেন। এ কথা আমি অন্যপ্রকাশের মাজহার ছাড়াও অনেকের কাছেই শুনেছি। হুমায়ূনের সঙ্গে যারা ওঠাবসা করেছেন বিভিন্ন সময়ে, তাদেরও কেউ কেউ আমাকে অনুযোগ করে বলেছেন, 'আপনাকে তার এত পছন্দ, কিন্তু আপনি তার ওখানে যান না কেন? দেখবেন, একবার গিয়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না।'মুচকি হেসে আমি চুপ করে যেতাম। কিন্তু মনে মনে বলতাম , 'হায় রে, বন্ধুবাৎসল আড্ডাবাজ হুমায়ূনকে তুমি আমাকে চেনাবে ?'

রাস্তায় আসতে আসতে মনের ভেতরে বারবার হুমায়ূন আহমেদের চেহারাটা ভেসে উঠছিল। সেই ২৮ বছর আগের চেহারা, তার পরের চেহারা, আমাদের বাড়িতে আশির দশকের মাঝামাঝিতে সেই দারুণ আড্ডায় মশগুল হুমায়ূনের চেহারা। সেই আড্ডায় ছিলেন মমতাজউদ্দিন আহমেদ, আবদুল্ল-াহ আবু সায়ীদ, র'নবী, জুয়েল আইচ, আনিসুল হক (ব্যবসায়ী) আরো কে কে যেন। মনে পড়ে হুমায়ূন আহমেদের মঞ্চনাটক 'মহাপুরুষ'-এর উদ্বোধনী দিবসে বেইলী রোডের মহিলা সমিতির মিলনায়তনে আমার নির্দয় মন্তব্যে তার বিব্রত হওয়ার চেহারাটি। পরে হুমায়ূন একাধিকবার বলেছেন, আবেদ ভাইয়ের কারণে আমি আর মঞ্চের দিকে এগুইনি। আমার সঙ্গে শেষবার যখন তার দখিনা হাওয়ার বাড়িতে দেখা হলো, তখনও তিনি তার স্ত্রী শাওনকে বলেছেন একই কথা। তার কি কোনো আক্ষেপ ছিল? কোনো অপমানবোধের যন্ত্রণা ছিল? এখন মনে হয়, বোধহয় আমি সেদিন একটা গুরুতর অন্যায়ই করে ফেলেছি। মঞ্চে যে আলো তিনি ছড়াতে চেয়েছিলেন, আমিই কি সেটা নিভিয়ে দিলাম? হুমায়ূনের কাছে ক্ষমা চাইবো–সেই সুযোগও তো আর রইলো না।

শিশুর মতো জেদি, একগুঁয়ে এবং সরল ছিলেন এই মানুষটি। কী যে প্রবল জীবনতৃষ্ণা তার! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিলেন। শেষবারের মতো যখন দেশে এসেছিলেন স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তার সাজানো নুহাশ-পল্ল-ীর পুকুর আঙিনা গাছপালা সবকিছু দু'চোখ ভরে দেখার জন্য, তখন সে কী প্রাণতৃষ্ণা তার! সব কিছু হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছেন আর বুকের ভেতরকার কান্না এবং হাহাকার গোপন করে তার জেদি কণ্ঠস্বর প্রবল সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করছে–আমি আবার ফিরে আসবো এই বাংলার নদী মাঠ-ঘাট ফুল শঙ্খচিল শালিখের দেশে। সেই রোগক্লিষ্ট শরীর যেন যযাতির আকুতি নিয়ে বলছে –আমি বাঁচতে চাই, আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে, মৃত্যু তুমি যাও–চলে যাও। হায় রে! অন্তরীক্ষে মৃত্যু শুধু হাসে আর নিঃশব্দে বলে, 'সময় যখন আসিবে তখন, আপনিই যাইবো তোমার কুঞ্জে। '

সেই আশির দশকে আমি এবং আমার স্ত্রী বাংলাদেশ টেলিভিশনে ঈদের অনুষ্ঠান আনন্দ মেলা করতাম। সেখানে হুমায়ূন আহমেদ একটি ছোট্ট একাঙ্কিকা লিখেছিলেন

‘এই সব দিনরাত্রি’ নামে সেকালের দর্শকনন্দিত টিভি সিরিয়ালের গোটাকয়েক চরিত্র নিয়ে। আমরা যতবার বলেছি নাটকের সিকোয়েন্স একটু বদ লাতে, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তা করেছেন। এমনকী সম্মানীবাবদ যা দেওয়া হয়েছে সেটাই নিয়েছেন মুখবুজে। আমি তো এই হুমায়ূনকেই চিনতাম। তিনি আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছেন তার নুহাশ -পল্লীতে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। তার জন্য আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা কিংবা তার প্রতি আমার ভালোবাসার এতটুকু খামতি ছিল না।

তিন হুমায়ূনের মধ্যে সম্রাট হুমায়ূনের মৃত্যু হয়েছিল বারান্দার সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে। আরেক হুমায়ূন – হুমায়ূন ফরিদী–প্রবল অভিমানে নিজেকে একরকম হত্যাই করলেন অপরিণত বয়সে। আর এই হুমায়ূন শেষবেলায় বাঁচতে চেয়েও পারলেন না। নিজেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে জীবনের জন্য পিপাসার্ত থেকেই চলে গেলেন অসময়ে। এর কী দরকার ছিল? আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি জগতে এর জন্য যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, এ জগতের সবচাইতে বর্ণাঢ্য ক্যারিশমার বর্ণহীন অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে যে বিশাল খাদ সৃষ্টি হলো, তা কি কখনো আর কাউকে দিয়ে পূরণ হবে?

কোথায় লুকিয়েছিল জ্যোৎস্নার চাঁদ
লেখক: শাকুর মজিদ

তিন সপ্তাহের চিকিৎসা বিরতিতে ২ কিস্তিতে ৫ রাত নুহাশ পল্লীতে আর শেষ দু’রাত শ্বশুরবাড়িতে গুলশানের ফ্ল্যাটে ছাড়া বাদবাকি সময়টা তার কেটেছিল ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায়। দখিন হাওয়ার বাড়িতে হুমায়ূন আহমেদ কাটাতেন তার নিজের কাজে। লেখাপড়ার সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছিল আঁকাআঁকি। ছবি তিনি ছোটবেলা থেকেই আঁকতেন। পেন্সিল স্কেচে তাঁর দুর্দান্ত হাত। মাঝে অয়েল পেইন্টিংও করেছেন। শেষ দিকে নিউইয়র্কে চিকিৎসার অবসরে ছবি এঁকেছেন।

নিউইয়র্কে প্রায় ৩০টির মতো ছবি এঁকেছিলেন। সেসব নিয়ে জুন মাসের শেষের দিকে একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল নিউইয়র্কে। ঢাকায় দখিন হাওয়ার বাড়িতে বসে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। মন বসাতে পারেননি। প্রায়ই দেখেছি ইজেলের পাশে রং-এর বাটি পড়ে আছে, পড়ে আছে অসমাপ্ত ছবিও। নিউইয়র্কে যে ছবিগুলো এঁকেছেন তার বেশির ভাগ ছবিতে বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং এক ধরনের শূন্যতার চিত্র দেখেছি। বিশাল বটগাছের নিচে একটা শিশু দাঁড়িয়ে, একা। এই ফ্রেমে আর কোনো মানুষের ছবি নেই। দূরে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশ। বেশ কয়েকটি ছবিতেই একটা নিঃসঙ্গ শিশু তার প্রধান অংশজুড়ে। বিশাল প্রকৃতির কাছে মা নব অসহায়ত্ব, একাকীত্বই তার বড় হয়ে এসেছে। ছবি আঁকেন তিনি । কখনো বিক্রি করেন না। সবই বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিয়ে দেন।

সন্ধ্যা বাড়ার সাথে সাথে বন্ধুদের আগমন ঘটে দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে। সোফায় বসতে পছন্দ করেন না। ফ্লোরের মধ্যে লুঙ্গি পরা, খালি গা। দিনে কিছু লিখে থাকলে নিজের মুখে পড়ে শোনানোর মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। মাঝে মাঝে শাওনকে ডেকে বলতেন, তার একদিনের চিকিৎসার পুরো বর্ণনাটা দিতে। এ কাহিনীটা শাওনের মুখ থেকে বার বার শুনতে ভালো লাগত তার। শেষ দু 'রাত ছাড়া পুরোটা সময়ই তার মা ও বোন তার সাথেই ছিলেন। একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে খেতে বসা এবং খাবার টেবিলে সময় নিয়ে সবার সঙ্গে আড্ডা মারা প্রায় অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল। তার অনেক ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও একান্তে কথা বলেছি। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল তার ধর্ম নিয়ে। এ বিষয়ে আমারও একটু আগ্রহ জন্মানোর পর একদিন আমাকে একটা বই দিলেন। 'সিরাত রাসুলুল্লাহ'। ইবনে ইসহাকের লেখা মহানবী (স.) এর জীবন নিয়ে লেখা প্রথম বই। বললেন, 'এ বইটা পড়ে দেখ, মুহম্মদ (সা.) কে নতুন করে জানতে পারবে।

'সিরাত রাসুলুল্লাহ' বইটি আমি ইচ্ছে করেই তাকে আর ফেরত দিইনি। চীন থেকে আসার সময় আমি একটা ডিজিটাল কোরান শরীফ কিনেছিলাম। কোরান শরীফের সাথে একটা পয়েন্টার যুক্ত। যেখানেই স্পর্শ করা যাবে, সেখান থেকেই আওয়াজ আসবে। প্রথমে আরবি, এরপর অন্য ৬টি ভাষায় তার অনুবাদ। মাজহার বলল, জিনিসটা স্যার দেখতে চাইছেন। আমি হাজির হয়ে বললাম, স্যার যদিও এটা আমার মায়ের জন্য কিনেছিলাম, আমি মনে করি, আপনি এটা গ্রহণ করলে আমার মা বরং খুশিই হবেন। হুমায়ূন আহমেদ খুশি হয়ে এটা তার মায়ের কাছে নিয়ে যান। বলেন, 'অপারেশনের আগে এই কোরান শরীফটি আমার সাথে রাখব।'

যাবার আগের দিন আমার কাছে একটা ফোন এল। একজন জানিয়েছেন, যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে তার ৫ বিঘা জমি আছে। হুমায়ূন আহমেদ ক্যান্সার হাসপাতাল করতে চাইলে এ জমিটা তিনি দিয়ে দিতে চান। খবরটা হুমায়ূন আহমেদের কাছে যাওয়ার পর তিনি খুশি হন। বলেন , 'ওই ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও আমি সুস্থ হয়ে আসার পর এ ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে বসব। '

তিনি ফেরত আসছেন। ফেরত এসে চুপচাপ শুয়ে থাকবেন তার নিজের গড়া নুহাশ -পল্লীতে। নুহাশ-পল্লীতে মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না আসবে। আকাশ ভেঙ্গে জ্যোৎস্না পড়বে। তিনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন, হয়তো একদিন সত্যি সত্যিই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকমানের কোনো হাসপাতাল হয়ে গেছে।

হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিনের আগের রাতটা থাকত জমজমাট। এ রাতে সন্ধ্যা থেকেই দরোজা খোলা। কেউ ফুল, কেউ মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির হতেন। দু'-একবার জ্যোৎস্না রাতে নুহাশ -পল্লীতে তিনি জন্মদিন

করেছিলেন। ২০১০ সালে তার জন্মদিন (১৩ নভেম্বর) তারিখে ভরা জ্যোৎস্না ছিল আকাশে। সেবার অবশ্য নুহাশ-পল্লীতে তার যাওয়া হয়নি। দখিন হাওয়ার বাড়িতেই রাতে জন্মদিনের উৎসব করেছিলেন। সন্ধ্যার পরেই অনিবার্য গায়ক দল এস.আই. টুটুলের নেতৃত্বে এসে হাজির হতো। গান বাজনা চলত। শিল্পী টুটুল আর শাওন। শেষ হতো টুটুলের গান দিয়ে 'চাঁদনী পশর রাইতে যেন আমার মরণ হয়'। হুমায়ূন আহমেদ নাম দিয়েছিলেন মৃত্যুসঙ্গীত। সেদিন তিনি বললেন , 'আকাশ ভেঙ্গে জ্যোৎস্না পড়লেই আমি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয় আমার মৃত্যুটাও হবে কোনো জ্যোৎস্না রাতে। 'কিন্তু ১৯ জুলাই বেলা এগারোটায় নিউইয়র্কের আকাশে ঝকঝকে রোদ ছিল না। একই সময়ে বাংলাদেশের রাতেও ছিল ঘোর অমাবশ্যা। তবে কী মৃত্যুক্ষণে তার প্রিয় চাঁদ তাকে আড়াল করা র জন্য এমন রূপ নিয়েছিল, কে জানে?

আমরা কি হারালাম
লেখক: সালেহ চৌধুরী

হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। আমরা কি হারালাম? আমাকে এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরের জন্য আমাকে একটুও ভাবতে হয়নি। বললাম , আমরা হারিয়েছি হুমায়ূনকে। এমন সংক্ষিপ্ত জবাবের অর্থ একটাই– হুমায়ূন এমন এক স্রষ্টামানুষ, ব্যাখ্যা আর উপমা দিয়ে যার নাগাল পাওয়ার নয়। তাকে হারানোর যন্ত্রণা আর শূন্যতা যাই বলি , অন্য কিছুতে পূরণ হওয়ার নয়। হুমায়ূন অনন্য –হাতড়ে বেড়ালেই ওদের পাওয়া যায় না।

হুমায়ূনের এই চলে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের যত বড় ক্ষতি, ব্যক্তি হিসেবে আমার ক্ষতি তারচে অনেক বেশি। আত্মার আত্মীয় হুমায়ূন আমার কাছে কি ছিলেন তা অনুভব করতে পারি , ব্যাখ্যা-বর্ণনার শক্তি ধরি না। হুমায়ূন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথম পরিচয় থেকেই আমি ছিলাম তার 'নানাজী'। বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা নিয়েই ছিল আমাদের মেলামেশা। আর বয়সের এক যুগ ব্যবধানজনিত সম্মানেরও কমতি ছিল না তার দিক থেকে। আমি তাকে আমার আনন্দঘন বাঁচার অন্যতম অবলম্বন গণ্য করতাম।

'নন্দিত নরক' উপলক্ষ করেই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার সন্তোষ, 'নন্দিত নরক' দেখেই আমি এক শক্তিমান কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব শনাক্ত করতে পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। পরে অনেকের মাঝেই এই উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করেছি। এরপর একের পর এক লেখা যখন প্রকাশিত হতে শুরু করে, অনেককেই উষ্মা প্রকাশ করতে দেখেছি–হুমায়ূন আহমেদ একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমার প্রথম হুমায়ূন পাঠের মুগ্ধতা কিন্তু কখনো কাটেনি। তার উপজীব্যতো ছিল আমা দের চারপাশেরই জীবন। বৃত্ত তো তাই একই। কিন্তু এর মাঝ থেকে তিনি জীবনের সত্য আর সৌন্দর্যের নানা

দিক যেভাবে তুলে এনেছেন তার দেখা আর কোথাও পাইনি। 'সাহিত্যের মাছি' আমি তাই হুমায়ূনের সাহিত্যকেই বড় করে দেখেছি। হুমায়ূন যখন নাটকে-সিনেমায় লিপ্ত হলেন, তখনও তার পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে বোধ করেছি অস্বস্তি। বলেছি এসব কাজের জন্য তো অন্য লোক আছেন। শ্রমবিভাজনের দোহাই তুলে বুঝাতে চেষ্টা করেছি , লেখালেখির কাজটা, যে লেখা তুমি লিখেছ বা লিখবে , অন্যের দ্বারা হওয়ার নয়। সাহিত্যেই নিবিষ্ট থাকো।

হুমায়ূন ছিলেন একটু ভিন্নধাতে গড়া। যা করতেন, তা জেনে বুঝেই করতেন। আমার কিংবা অন্য কারো কথায় সংকল্প বদলানোর লোক তিনি ছিলেন না। আমাদের ভাগ্য, হুমায়ূন এমন দৃঢ়চেতা ছিলেন। ছিলেন বলেই আমাদের নাটকে, সিনেমায় পালাবদল সম্ভব হয়েছে। আমাদের সাহিত্য যেমন পাঠক পেয়েছে, টিভি নাটকও পেয়েছে দর্শক।

হুমায়ূন প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। কিন্তু একেই একমাত্র উপজীব্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এমনও না। দূর এবং নিকট ইতিহাসও তার সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে সমান গুরুত্বে। আর সে কেবল গল্প বলাই নয়, গল্পের ছলে পথের দিশা দেখিয়ে দেয়া। একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠন হওয়া র অনেক আগেই 'জলিল সাহেবের পিটিশন'-এর মতো গল্প লিখেছেন হুমায়ূন। যে গল্পের মূল প্রত্যয় – ঘাতকদের বিচার একদিন না একদিন হবেই। কেবল পথ দেখানো নয়, এ যেনো অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ। বহুব্রীহি নাটকে দুই শব্দের এক সংলাম 'তুই রাজাকার'। সে এমন এক উচ্চারণ, কবি শামসুর রাহমান বলেছিলেন, '–এই একটি সংলাপে হুমায়ূন যা করেছে, আমার তিনটি লেখায়ও তা সম্ভব ছিল না। সংলাপটি যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল , তা তো আমরা অনেকেই দেখেছি।

একাত্তর তথা মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্বের অহংকার। ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় অধ্যায়কে হুমায়ূন তার অন্যতম প্রধান উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। ছোট ছোট উপন্যাস আর ছোট গল্পে–মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পর লিখেছেন 'জ্যোছনা ও জননীর গল্প'। কার্যত এ সবই তার দায়বদ্ধতার ইতিবৃত্ত। এই অবদানের তুল্য নজির আমার চোখে অন্তত দ্বিতীয়টি পড়েনি। 'মাধ্যাহ্নে' এসে সমাজ বিবর্তনের ছবি এঁকেছেন।

সচেতন পাঠক মাত্রেরই লক্ষ্য করার কথা, হুমায়ূন কেবল আমাদের চারপাশের জীবনের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হয়নি। আমাদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে তুলেছেন। প্রান্তিক লোকের মুখে ছড়িয়ে থাকা অনেক শব্দকে করে তুলেছেন পাংক্তেয়। অনাড়ম্বর শব্দ বিন্যাসে অনুপ ম সৌন্দর্য সৃষ্টির নতুন নজির স্থাপন করেছেন তিনি।

বিজ্ঞানের ছাত্র হঠাত্ করে সাহিত্যে এসে বিজয়ী হয়ে গেলেন, এমন ধারণা করা ঠিক না। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন ঠিকই, তবে তার আত্মজৈবনিক রচনাগুলোতে চোখ বুলালেও বুঝতে অসুবিধা হয় না , সাহিত্যের প্রস্তুতি ছিল কতো দীর্ঘ। হুমায়ূন সাহিত্য একই সঙ্গে প্রতিভা আর পরিশ্রমের ফসল। পটভূমি এমন পাকা ছিল বলেই হুমায়ূন নিজেকে এমন ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। অর্জন করেছেন নজিরবিহীন জনপ্রিয়তা। হতে পেরেছেন স্বসময়ে বাংলা সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিক।

আক্ষেপ আজ একটাই হুমায়ূন সাহিত্যের দ্যুতি যখন বাইরে ছড়াতে শুরু করেছিল, তখনই কাল তাকে ছিনিয়ে নিল। কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হুমায়ূন অনেক আবদ্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে বিদায় নিলেন। হুমায়ূন বিদায় নিয়েছেন সত্য, তবু যে অমেয় অবদানে তিনি সকলের চিত্ত জয় করেছিলেন , তার আলোই তাকে অমর করে রাখবে। জ্যোস্নার ফুল হাতে ধরার সাধনার মৃত্যু হতে পারে না।

তিনি কতোদিন বেঁচে থাকবেন?
লেখক: আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে যেদিন নিউইয়র্কের হাসপাতালে ঢোকেন, সেদিন ডাক্তারকে প্রথম যে কথাটি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা হলো, ডক্টর, আমি আর কতোদিন বাঁচবো? ডাক্তার বলেছিলেন, তা বলা মুশকিল।' আমার ধারণা, হুমায়ূন আহমেদের এই জিজ্ঞাসার মধ্যে হয়তো আরও একটি অব্যক্ত প্রশ্ন ছিলো, মৃত্যুর পরও তার সাহিত্যিক জীবন কতোদিন বাঁচবে ?

এখন তিনি চলে গেছেন, তার নশ্বর দেহটি সমহিত হবে আগামীকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায়। চোখের আড়াল হলেই কি তিনি তার লক্ষ লক্ষ মুগ্ধ পাঠক , বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের মনের আড়াল হয়ে যাবেন? আমার তা মনে হয় না। হুমায়ূন বেঁচে থাকবেন তার সৃষ্টির মধ্যে। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। গল্প, গান, উপন্যাস, কল্প-বিজ্ঞান, ভ্রমণ-কাহিনী, প্রবন্ধ, আত্মকথা আরও কতো কী? নাটক লিখেছেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

কোনো সাহিত্যিকেরই মৃত্যুর সঙ্গে -সঙ্গে তার সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন সহজ নয়। হয় অতি শ্রদ্ধায় অতিশয়োক্তি করা হবে। অথবা বিমুখতা বা অতিবিমুখতায় তার যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। একটা উদা হরণ দেই। হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকতে তার সমসাময়িক এক সাহিত্যিক (তিনিও এখন প্রয়াত) তাকে 'অপন্যাসিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। এটা হয়তো ছিলো হুমায়ূন আহমেদের অসম্ভব পাঠক প্রিয়তায় তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ঈর্ষাপ্রসূত অবমূল্যায়ন। আবার তিনি মারা যেতেই পশ্চিমবঙ্গের এক সাহিত্যি ক গদগদ হয়ে বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের চাইতেও হুমায়ূন আহমেদ অধিক জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন"।

এটা আবার অতিশয়োক্তি। আগের যুগের একজন লেখকের সঙ্গে পরবর্তী যুগের লেখকের জনপ্রিয়তার তুলনা করা যায় না। এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। শেক্সপিয়র , না বার্নার্ড শ; কে গ্রেট ব্রিটেনের সব চাইতে শক্তিশালী নাট্যকার, এই তুলনা টানা দু'জন নাট্যকারের প্রতিই অবমাননা প্রদর্শন।

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতেও বিএনপি রাজনৈতিক সুবিধা লোটার মনোবৃত্তি দেখিয়েছে। প্রয়াত সাহিত্যিকের প্রতি অতিভক্তি দেখিয়ে দাবি করেছে। তার মৃত্যু দিবসটিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হোক। এটা ছুটির দিন ঘোষিত হলে আমাদের কারো আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু তাহলে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম ও প্রধান কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যু দিবসকেও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করতে হয়। এতো ছুটির দিন ঘোষণা বাস্তবতা সম্মত নয় এবং তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শনও নয়।

হুমায়ূন আহমেদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি গ্রেট রাইটার ছিলেন এমন কথা বলি না। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যে একজন মাইলফলক স্থাপনকারী গুরুত্বপূর্ণ লেখক ছিলেন। যারা তাকে কেবল এন্টারট্রেইনার লেখক বা টিনএজারদের লেখক বলে উপেক্ষা দেখাতে চান, তারা ভুল করেন। তার লেখায় সমাজ বিমুখতা ছিলো না। তিনি নব্যমধ্যবিত্ত জীবনের নানা কন্ট্রাডিকসন ও আত্মকেন্দ্রিকতার রূপকার ছিলেন। তা অনেক সময় তার সৃষ্ট চরিত্র ও চরিত্রের ডায়ালগে স্যাটায়ারের রূপ ধারণ করেছে। তার লেখার প্রেমের কাহিনীগুলোও তাই-ই। তিনি বয়স্ক পাঠকদের মুগ্ধ করেছেন। টিনএজারদের মজিয়েছেন।

এটা তার লেখার শক্তিরই পরিচয় যে তিনি দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এতো বিশাল পাঠক গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কোনো মাঝারি গোছের লেখকের পক্ষে এই পাঠক গোষ্ঠী সৃষ্টি সম্ভব হতো না। সুতরাং লেখক হিসেবে তার প্রতিভা ও শক্তিকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই। যারা তাকে ছোট করে দেখতে চাইবেন তারা সাহিত্যযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের সংকীর্ণ বুদ্ধির প্রমাণ দেবেন।

তার লেখা কতোদিন বাঁচবে তা নির্ভর করে এই লেখার আবেদনের উপর। এই আবেদন যতোদিন থাকবে, ততোদিন নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে থাকবেন। সমাজ ও সমাজ-মানস দ্রুত বদলায়। ফলে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখার যে আবেদন, তা পরবর্তী সময়ে থাকে না। তবে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ-মানস যতোই দ্রুত বদলাক, হুমায়ূন আহমদের স্বকাল থেকে তার উত্তরণ সহসা ঘটবে মনে হয় না। সুতরাং তিনি বেশ কিছুকাল আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

হুমায়ূনের কথা
লেখক: আনিসুজ্জামান

হুমায়ূনকে যদিও আগে চিনতাম কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গত পঁচিশ বছর ধরে, আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে আসার পর। হুমায়ূনের নিজস্ব একটা বৃত্ত আছে , তাতে অন্যদিনের সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের একটা বড় ভূমিকা আছে। মাজহারের সূত্রে ই হুমায়ূন তার বন্ধু-বৃত্ত নিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় কয়েকবার এসেছে। তার সঙ্গে ইমদাদুল হক মিলন, মাজহারুল ইসলাম, মাসুদ রহমান, সিরাজুল কবীর চৌধুরী ও আবদুল্লা নাসের এরা ছিল। হুমায়ূনের আমন্ত্রণে আমি সস্ত্রীক নুহাশ পল্লীতে গেছি, তবে ধানমন্ডির বাড়িতে গেছি বেশি, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাই। হুমায়ূন মজলিশি মানুষ, তার নানা ধরনের সঙ্গী ও অতিথি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু থেকে শুরু করে স্বাধীন খসরু পর্যন্ত অনেকেই সেখানে নানা সময় উপস্থিত ছিল। একবার হুমায়ুনের আমন্ত্রণে আমি তাদের পৈতৃক ভিটায় গেছি। তাদের বাড়ি যাবার পথে একটি রাস্তার নাম রাখা হয় তার বাবা ফয়জুর রহমানের নামে। সেই সড়ক আমি উদ্বোধন করেছিলাম। হুমায়ূনের ইচ্ছায় এবং তার পরিবারের সকলের সম্মতিক্রমে।

হুমায়ূন তাদের বাড়িতে বাবার নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিল, পরে তার নাম হয় শহীদ স্মৃতি বিদ্যায়তন। সে স্কুলটিও সেবার দেখেছিলাম। ফয়জুর রহমান একবার আমার খুব উপকার করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে যেদিন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে যাই, সেদিন কুমিল্লার চান্দিনার কাছে আমি এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হই। ফয়জুর রহমান তখন কুমিল্লার ডিএসপি। তিনি ঢাকা থেকে কুমিল্লা ফে রার পথে আমাদের এই অবস্থায় দেখে আমাকে ও আমার দুই সঙ্গীকে তার গাড়িতে করে নিয়ে কুমিল্লার সিএমএইচ -এ আমাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন এবং আমার বিধ্বস্ত গাড়ি পাহারার ব্যবস্থাও করেন। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহানারা ইমামের নামে আবাসিক হলের নামকরণ নিয়ে একবার বিতর্ক দেখা দেয়। তখন হুমায়ূন সেখানে সদলবলে গিয়ে সারাদিন অনশন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হই। আমি যাওয়ায় সে খুবই খুশি হয়েছিল। সুতরাং তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। আমি সাগ্রহে হুমায়ূনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম এবং দিনটা তার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। গুলতেকিন তখন আমাদের সকলের পেছনে থাকার চেষ্টা করছিল। আমি তাকে সামনে আসতে বললে সে মৃদুস্বরে বলেছিল , আমার জায়গা পেছনে। কুতুবপুর থেকে যাবার পথে হুমায়ূন, মাজহার ও আমি রাতটা কাটিয়েছিলাম ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে এবং অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম।

এক সময় বাংলা একাডেমীর পরিষদ নির্বাচনে হুমায়ূন ও আমি একই প্যানেলের প্রার্থী হই। আমাদের পুরো প্যানেলেই জয়ী হয়। কিন্তু কয়েকটি সভা হওয়ার পর দেখা গেলো আমাদেরই সঙ্গে নির্বাচিত এক প্রার্থী একাডেমীর প্রশাসনের সঙ্গে ‘রুচিহীন বিতর্কে’ প্রবৃত্ত, তাকে থামাতে না পেরে হুমায়ূন ও আমি দুজনই পরিষদের সভায় যাওয়া বন্ধ করে দেই।

হুমায়ূনের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কমই হতো। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এবং নানা জনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হতো। হুমায়ূনের পছন্দ -অপছন্দ বেশ তীব্র ছিল। অনেক বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি। কিন্তু তা আমাদের সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেনি।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কম হলেও হুমায়ূন তার লেখা সম্পর্কে আমার মতামত শুনতে আগ্রহী ছিল বলে মনে হয়। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা আমি অকপটেই শুনতাম তবে হুমায়ূন কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো না। তার জননী ও জোৎস্নার গল্প বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি ছিলাম মূল আলোচক। আলোচনা শেষে হুমায়ূন সকলকে পানাহারে আমন্ত্রণ করেছিল। তখন সে আমাকে স্পষ্ট বলেছিল, আপনি বইটা সবটা পড়েছেন তা বুঝতে পারলাম।

হুমায়ূন তার দুটি বই আমাকে উৎসর্গ করেছিল। একটি প্রিয়তমেষু অন্যটি প্রিয় ভয়ংকর। বই দুটির কোন কপি স্বাক্ষর করে সে কখনও আমাকে পাঠায়নি। তার ইচ্ছা হলে মাসে মাসে তার বেশ কয়েকটি বই বিনা স্বাক্ষরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিত। হুমায়ূনের উপন্যাসসমগ্রের ভূমিকা আমি লিখেছিলাম। তাতে সে প্রীত হয়েছিল, পরে তার রচনাবলীর একট খন্ডের ভূমিকাও আমি লিখি। এ সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া জানতে পারিনি। কারণ সে তখন চিকিৎসা নিতে নিউইয়র্কে চলে গেছে। এই বছর বই মেলায় প্রকাশিত আমার বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বই আমি হুমায়ূনকে উৎসর্গ করি। আমার স্বাক্ষরযুক্ত বইটা মুক্তধারার বিশ্বজিত্ সাহার হাতে হুমায়ূনকে নিউইয়র্কে পাঠাই। সে এবারে যখন ঢাকায় এসেছিল তখন তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি বইটি সে যথাসময় পেয়েছে। তবে পেয়ে খুশি হয়েছে কি -না সে কথা সে আমাকে বলেনি।

মে মাসে হুমায়ূনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। মাজহার একদিন আমাকে বললো যে, কয়েকদিনের মধ্যে হুমায়ূন নিউইয়র্কে চলে যাবে। আমি যেন একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। মাজহারকে আমি বললাম কাল সকালে আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি। আজ নানা ব্যস্ততা। দেখা করার সময় করে উঠতে পারবো কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করবো। মনে হয় মাজহার আমার পুরো জবাবটাই হুমায়ূনকে জানিয়েছিল। দখিন হাওয়ায় আমি হুমায়ূনের ফ্ল্যাটে যাই সন্ধ্যে বেলায়। শাওন সহাস্যে অভ্যর্থনা জানায়। একটু পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে হুমায়ূন বসার ঘরে আসে। আমাকে দেখে বলে, আপনি এলেন কেন? কাল না আপনি কলকাতা যাবেন, যান বাড়ি গিয়ে গোছগাছ করেন। আমি বললাম, তোমাকে দেখতে এসেছি। হুমায়ূন বললো, দেখা তো হলো, এবারে আপনি যান। আমার সঙ্গে হুমায়ূনের এক প্রতিবেশিও তার ঘরে ঢুকেছিল। তিনিও একটু অপ্রস্তুত হলেন , আমিও হলাম। মনে হয় শাওনও। হুমায়ূনের হাতে হাত মিলিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে আমি চলে এলাম। আমি ভাবতে থাকলাম, মাজহারকে আমার জবাবটা রুড হয়েছে না কি হুমায়ূনের আচরণটা রুড। সে সন্ধ্যায় হুমায়ূনকে দেখে তার অসুস্থতার তুলনায় অনেক ভাল মনে

হয়েছিল। সে হয়তো আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারেন এ রকম একটা ভাবনা মনের মধ্যে ছিল। সেটা কি ভুল ছিল তা বুঝতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

পরাজিত হননি হুমায়ূন আহমেদ
লেখক: মোহিত কামাল

হুমায়ূন আহমেদের বৃহদন্ত্রে ক্যান্সার ধরা পড়েছে–শুনেই বুকে কামড় বসে গিয়েছিল ভয়ে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের ভয়াবহ রিপোর্ট হাতে পেয়ে নিজেই ভড়কে যাননি হুমায়ূন আহমেদ। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়েই গিয়েছিলেন নিউইয়র্কের স্লোয়ান-ক্যাটারিং ক্যান্সার সেন্টারে। দুই দফায় মোট ১২টি কেমো দেয়ার পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত হয়। অস্ত্রোপচার করবেন সার্জন জজ মিলার। অপারশেনের সিদ্ধান্তের কথা শুনে মিলারকে হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্ন করেছিলেন, 'অপারেশনের সাকসেস রেট কতটুকু?' জবাবে মিলার বলেছিলেন, 'একশ' ভাগ যদি আমি অপারেশন করি।' অপারেশনের আগে দেশে ফিরে দখিন হাওয়ায় বসে সন্তান, জামাতা ও আমার উদ্দেশে কথাগুলো বলছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। ওই সময়ে স্তব্ধ হয়ে পাশে বসেছিল নুহাশ , নোভা ও শীলা। নোভা ও শীলার স্বামী সন্তানরাও ছিল সঙ্গে। সামনে ছিলেন মা আয়েশা ফয়েজ। নোভার দুই মেয়ে। শীলার এক মেয়ে ও এক ছেলে। বসার ঘরে বসে আছি সবাই। মাঝে মাঝে আসন ছেড়ে উঠে যাচ্ছে শীলা। লিফটের সামনে খোলা স্পেসে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখছি শীলাকে। বুকের ভেতর থেকে দাপিয়ে ওঠা কান্নাটা সামাল দেয়ার জন্য বার বার উঠে বাইরে যাচ্ছে–ছোট্ট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে – ভাবখানা ছেলের দুষ্টুমি থামাচ্ছে। না! দুষ্টুমি থামাচ্ছে না। বাবার অসুস্থতার অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা শুনে কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। চোখ ছলছল করে উঠছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার।

দৃষ্টিনন্দন ঢাউস সাইজের দুই ঝুড়ি লিচু পাঠিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় বন্ধু জুয়েল আইচ। নাতি - নাতনীদের লিচুর খোসা খুলে দিতে বললেন নোভাকে। লিচুর খোসা ছাড়াচ্ছে আর বাচ্চাদের মুখে তুলে দিচ্ছে নোভা। ফ্লোরের দিক মুখ , চোখ ওপরে উঠছে না নোভার। খোসা ছাড়ানো লিচুর রস পড়ছে হাত গড়িয়ে। নোভার চোখের জল কি মিশে যাচ্ছে খোসা ছাড়ানো রসাল লিচুর সঙ্গে? প্রশ্ন এল মনে। নিবিড় করে তাকিয়ে দেখে উত্তর খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। নোভার চোখও ছলছল করছে। শূন্য চো খে বাবার ডান পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে নুহাশ শুনছে বাবার কথা। কে কি করছে হুমায়ূন আহমেদের খেয়াল নেই। এক মনে হড়বড়িয়ে বলে যাচ্ছেন নিজের অসুস্থতার কথা। কথার মধ্যদিয়ে বার বার ফুটে উঠছে সুস্থ হয়ে উঠার দৃপ্ত প্রত্যয়।

এক ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'লিভার নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত কি?'

স্বস্তি নিয়ে জবাব দিলেন, 'প্রথমে বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন ক্যান্সার সেল লিভারে ছড়িয়ে গেছে, লিভারে মেটাস্টেসিস হয়েছে। কেমো দেয়ার পর স্পষ্টভাবে তারা জানিয়েছেন, লিভারে ক্যান্সার সেল ছড়ায়নি, ওটা মেটাস্টেসিস নয়, হিনাইন স্পট (নিরীহ একটা দাগ)। বোঝার পর সার্জনরাও আমার সেরে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয়েছেন। অপারেশনের আগে হাতে সময় পেয়ে ওদের অনুমতি নিয়ে তাই এলাম দেশে। সবাইকে দেখে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এসে ভালোই করেছি।'

তবে কি না ফেরার দেশে চলে যাবেন তিনি–আগাম গোপনে জেনেছিলেন হুমায়ূন? ইচ্ছাপূরণ করতেই এসেছিলেন দেশে?

বলা হচ্ছে, ক্যান্সারের কাছে পরাজিত হয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। না। তেমন করে ভাবতে পারছি না আমি। ভাবতে চাই, হুমায়ূন আহমেদ পরাজিত হননি। ক্যান্সারকে জয় করছিলেন অসীম সাহস নিয়ে। Hemicolectomy অপারেশনের পর জটিলতার কারণে দ্বিতীয় দফায় অপারেশন করতে হয়েছিল। অপারেশনের জটিলতার ধকল সইতে পারেনি দুর্বল শরীর। একটি অজানা ভাইরাস সংক্রমণেরও সন্ধান পেয়েছিলেন চিকিৎসকরা। ভাইরাসটিও শনাক্ত করতে পারেননি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা। এই পরাজয় হুমায়ূনের নয়। এই পরাজয় সমগ্র বিশ্বের।

হুমায়ূন আহমেদ কেবল শক্তিমান শব্দ কারিগরই নন। তিনি এক প্রকৃতিপ্রেমিক। সমুদ্র তাকে ডাকে। পাহাড়ের ডাকও শুনতে পেতেন তিনি। গাছ-গাছালির স্পন্দন আলোড়িত করত তাকে। তাই তিনি ছুটে যেতেন সেন্টমার্টিন। 'সমুদ্র বিলাস' নামে একটি বাড়ি তৈরি করেছেন সেখানে। নুহাশ -পল্লীতে সবুজ প্রকৃতির আড়ালে পার করেছেন জীবনের মূল্যবান সময়। আমার সৌভাগ্য এই যে, দীর্ঘদিন ধরে পেয়েছিলাম তার স্নেহ-মমতা। সেই মমতার বন্ধন চিরভাস্বর। সমগ্র দেশবাসীর মতো আমরা তাই বেদনাবিধুর।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকীর্তিকে বিশ্লেষণ করতে হবে নানা আঙ্গিক থেকে। কেবল জনপ্রিয়তার পাল্লায় মাপা যাবে না তাকে। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাসাহিত্যের এক যশস্বী লেখক বলেছেন, হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সহজ ভাষায় লিখিত হুমায়ূন সাহিত্যে যে মনস্তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গভীর জীবনবোধ ও সাহিত্যমূল্য অনুরণিত রয়েছে শিল্পমান বিচারে সেই সত্যকেও খুঁজে বের করে আনতে হবে। পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ধারণা করে হুমায়ূন-সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। কালের বিচারে অবশ্যই হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যকে আলোকিত রাখবেন–এই বিশ্বাস ধারণ করি। লালন করি।

অন্তরে হুমায়ূন : কেঁদে কেঁদে তোমাকেই বলি

লেখক: স.ম. শামসুল আলম

জননন্দিত কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, চলচ্চিত্রকার, চিত্রশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ তুমি তোমার চঞ্চলতা নিয়ে ফিরে এলে না। আজ তোমার লাশ আসবে নিউইয়র্ক থেকে। কেন তুমি নও ? তুমি কি জানো না আমার মত তোমার অসংখ্য ভক্তকুল আজ ভাষাহীন -বাক্যহীন - অশ্রু ছাড়া কোন ভাষায় কোন কিছুই ব্যক্ত করতে পারছে না। তোমাকে আমাদের কতটা প্রয়োজন ছিল তুমি কি জানতে ? (হয়তো আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন অনেক বেশি ছিল। হয়তো তিনি অধিক ভালবাসবেন । তোমাকে জান্নাতবাসী করবেন)। আমাদের প্রয়োজনের কথাটা তুমি অনুভব করতে পারবে দেশের মাটিতে নামার সাথে সাথে। বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে শুরু করে ইট-পাথর-কাঠ-এলুমিনিয়াম সবাই সমস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে, তুমি হাসো না কেন? তোমাকে শহীদ মিনারে নেয়া হলে লাখো জনতার ঢল নামবে। এই জনতারা কী করবে আমি জানি না, তবে স্মৃতির মিনার কেঁপে উঠবে এটা নিশ্চিত বলতে পারি। তুমি এই বাংলা ভাষাই তো বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে এত কথা লিখেছ। তুমি কি জানো আর মাত্র কয়েকটা বছর অপেক্ষা করলে নোবেলই তোমার জন্য অপেক্ষা করত?

আমি তোমাকে চিনি ‘এইসব দিনরাত্রি’ থেকে (কারণ ‘নন্দিত নরক’-এর সময় আমার বয়স ছিল কম)। এখন আমার এই সব দিনরাত্রি কী করে কাটাই? মাত্র কটা দিন হল তুমি ঘুমিয়েছ। আর এই সময়ের মধ্যেই মসজিদে আজান দিলে আমার নামাজের কথা মনে পড়ে, মন্দিরে শাঁখ বাজলে আমার পূজার কথা মনে পড়ে, গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি শুনলে আমার প্রার্থনার কথা মনে পড়ে। আমার শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। তুমি টিয়া পাখির ঠোঁটে বলিয়েছিলে ‘তুই রাজাকার’। সেই থেকে ‘তুই রাজাকার’ কথাটা দেশব্যাপী আলোড়ন তুলল এবং জাতি একটি অনুপ্রেরণায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা ভাবল। তুমি একটি নাটকে বাকের চরিত্রটির ফাঁসি দিলে তা নিয়ে সারাদেশে মিছিল পর্যন্ত হয়েছে। মানুষের ভেতরে এই বোধগুলো কীভাবে সৃষ্টি করতে পেরেছিলে জানি না । হিমুকে নিয়ে লেখা বইগুলোর কাল্পনিক চরিত্রে হিমুকে এমনভাবে সাজালে, অনেক তরুণ হলুদ পোশাকে হিমু হয়ে গেল। ডাঃ মোহিত কামালের কাছে এরকম মানসিক রোগী এলে মোহিত কামালের অনুরোধে তুমি তাদেরকে চিকিৎসায় সহযোগিতা করলে এই বলে যে হিমু একটা কাল্পনিক চরিত্র , বাস্তবের সাথে কোন মিল নেই। তারা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরল।

তোমার হিমুরা, তোমার মিসির আলীরা আজ শোকে শোকাতুর। তোমার হিমু তো এখনো বৃদ্ধ হয়নি , মিসির আলির বয়স তোমার চেয়ে এখনো অনেক বেশি। তোমার এত তাড়া ছিল কি? তুমি তোমার আঁকা চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রতিটি চিত্রের কাব্যিক নাম দিয়েছ, একটি চিত্রের নাম রেখেছ ‘কৃষ্ণচূড়ার কান্না’ যা দেখে আমি অভিভূত। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি কি তাহলে কৃষ্ণচূড়া? আমরা এই দেশের এতগুলো মানুষ

কি 'কৃষ্ণচূড়া'? না হলে আমাদের এত কান্না কেন? তুমি নাটক পরিচালনায় এসে তোমার লেখাকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুললে, ঠিক তোমার মনের মত করে। দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আরো বেড়ে গেল। যে সব দর্শক সিনেমা হলে যেতে ভুলে গিয়েছিল, 'আগুনের পরশমণি' তাদেরকে আবার হলে ফিরিয়ে নিল। সত্যি তোমার কী আশ্চর্য ক্ষমতা! 'শ্রাবণ মেঘের দিন' হৃদয়ে তোলপাড় করে। তোমার পরিচালিত এইসব ছবি ছাড়াও তোমার প্রায় সকল লেখাতে ঘুরে -ফিরে মুক্তিযুদ্ধ চলে এসেছে। সবশেষে 'দেয়াল'-এও মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে এত ভালবেসে সেই দেশ ছেড়ে তুমি পালাচ্ছো ? তোমার অকাল প্রস্থানে কতটা ক্ষতি, তুমি কী বোঝ? বোঝাতে চাই-ও না। যে যায় সে কি বোঝে কেন গেল? আগামীকাল তুমি আরো একটু বুঝবে। নুহাশ পল্লীর সকল জীবজন্তু, গাছপালা, মূর্তি সবাই যখন মলিন মুখে তোমার দিকে তাকিয়ে বলবে, ছেড়ে যাচ্ছো কেন? তখন বুঝবে সম্পর্ক কত তুচ্ছ, কত ভঙ্গুর। তোমার ঔষধি গাছগুলো যখন বলবে, 'মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে রোপ ণ করেছিলে অথচ আমরা তোমারই কোন কাজে আসতে পারলাম না - আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাও'। তখন তুমি কী জবাব দিবে? তুমি বলেছিলে মানুষের চেয়ে কচ্ছপের আয়ু এত বেশি কেন? মানুষ কেন দীর্ঘায়ু হল না? বুঝতে পারি, তুমি থাকতে চেয়েছিলে। কেন থাকলে না? কেন চলে গেলে?

মুক্তিযুদ্ধ, হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর উপন্যাস
কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে, এই ভূখ-ের জনদ্রোহের সাথে যে নামটিকে জড়ানো যায় তিনি হুমায়ূন আহমেদ। অতি সাধারণভাবে মনে হতে পারে তিনি ক্রমাগত মধ্যবিত্ত পাঠকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত এক কথাশিল্পী। এটা ঠিক যে তিনি পাঠককে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছেন, পাঠকও তাকে কখনও কখনও তার সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করেছে। এটি ঠিক মাপামাপি করে বলা মুশকিল যে তিনি আসলে কদ্দুর পাঠক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। তাকে বোঝানো যেত , দমানো যেত, তার সিদ্ধান্ত থেকে ফেরানো যেত। সেটা তার সৃজনশীলতার নানান বাঁকবদল থেকে ধরা যেতেই পারে।

তার প্রথম উপন্যাস নন্দিত নরকে, তারপর লিখলেন শঙ্খনীল কারাগার। পাঠক তার উপন্যাস অতীব মমতায়ই গ্রহণ করতে থাকল। তিনি একে একে প্রায় দুইশ'র মতো উপন্যাস লিখলেন। তবে সবই যে একই মান-মর্যাদা বা কাহিনীর, তো কিন্তু নয়। নন্দিত নরকে বা শঙ্খনীল কারাগারে যে মধ্যবিত্ত অতি সরল পাঠকের জন্য বরাদ্দ হলো তারা কিন্তু তাকে ছাড়লেন না। এই হিসাব নেয়া মুশকিল যে কে কার জালে বা মায়ায় আটকালেন। তবে এটা ঠিক তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। তা যে একেবারে তর্কাতীত দ্রোহ নিয়ে আবিষ্কৃত হলো, তা নয়। আমরা নানা ধরনের কাজ দেখলাম। জোছনা ও জননীর গল্পে যে একটা গড়পরতা ইতিহাস তিনি লিখলেন, আগুনের পরশমনিতে আবার একজন

মুক্তিযোদ্ধার জীবনপণই বড়। এমন জঘন্য সময়েও আমরা জোছনা নিয়ে তার রোমান্টিকতা দেখলাম। আমরা সারাটি সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে সেভাবে পাইনি, এমনকি সেই সময়ের অপরিহার্য সম্ভোগান জয় বাংলাও শুনিনি। হয়ত বৈরি সময়ের কাছে নিজেকে কিছুটা হলেও লুকোতে হয়েছে তাকে! মুক্তিযোদ্ধাকে ঘিরে আমাদের স্বপ্ন আমরা চিনলাম। তিনি টিভি নাটকে মুক্তিযুদ্ধকে নতুন করে যেন আমাদের সামনে হাজির করলেন। মুক্তিযুদ্ধকে হতচকিত করা অবস্থায়, ভুলে-থাকার এই কালে টিয়াপাখির মুখ দিয়ে একটা জাতিসত্তার নুতন চেহারা দেখালেন। পাখিটি 'তুই রাজাকার' বলে রাজাকারদের পরিচয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল নামের উপন্যাসটির শুরুতে আছে একটা হাইস্কুলের অতি জাগতিক জীবনযাপনের বর্ণনা। কিন্তু তাতেও আমরা দেখি মুক্তিযুদ্ধের এক ভয়ঙ্কর বর্ণনা। তিনি অবহেলিত মুসলমান সমাজকে নবউদ্দীপনায় তুলে ধরলেন মধ্যাহ্ন নামের দীর্ঘ উপন্যাসে। তাতে বিশ শতকের সর্ববঙ্গীয় রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গভঙ্গ, হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন, তাদের দ্বন্দ্ব, লৌকিক ধর্মের সহজাত বিকাশ, ধর্মীয় ল্যাবিরিন্থ, জীবনকে ভালোবসার মানবিক উপায় অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। পূর্ববঙ্গের ভাষার যে আলাদা করে মাটির গন্ধ আছে তা বোঝা যায়। মৃতের জগতের এক অতিজাগতিক ইশারা এতে আছে। আবার কবি বা বাদশা নামদার উপন্যাসে আমাদের এই জল-নদী-হাওরের বাংলাদেশের অন্তর্গত ভাবুক সত্তাকে জাগিয়ে তুললেন। আমরা এইভাবেই এক মানুষকে পাই যাকে বিভিন্ন তল থেকে দেখার সুযোগ আছে। তারচেয়েও বড়ো কথা আমরা তার কথাশিল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের এ সরল দেশটাকে কিছু হলেও নুতনভাবে দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়েই না হয় তাকে আবার দেখতে থাকি। এটি তার সাহিত্যের এমন এক দিক যাকে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়।

এ এমনই এক যুদ্ধ_ যা একটা জাতিগোষ্ঠীর ওপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়_ এবং এর ফলশ্রুতিতে এই জনপদে যুদ্ধআশ্রিত অসাধারণ সব ঘটনা ঘটে। জনযুদ্ধরূপী এ যুদ্ধ একটা জন পদকে আমূল বদলে দেয়। এ বদলে যাওয়া ক্রমাগত এক ঝুঁকির ভিতর পড়ে। জনসংস্কৃতির নান্দনিকতা বদলে যায়, এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এমনকি এ জাতির ভাষারও ব্যাপক রদবদল ঘটে। অর্থনৈতিক মুক্তির এক নেশা চাপে তার। এর সবই আমাদের সাহিত্যে প্রভাব রেখে যেতে থাকে। এমনই চৈতন্যের ভিতর আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসবিষয়ক কিছু কথা বলার বাসনা রাখি।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের এক অসামান্য ইতিবৃত্ত। সকালের নির্মল রক্তজ সূর্যের মতো যেমন তা জ্বলজ্বল করে, তেমনি বিষণ্ন শিশিরের মতো ঝিরঝিরে ওমে কাঁপে। এমনই এক ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষার ভা-ারে উপন্যাস একেবারে কম রচিত হয়নি। তারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত টানার চেষ্টা করা হলো এখানে। এ আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ শুরুর উপাখ্যান যেমন আছে তেমনি আছে যুদ্ধসময়ের এবং তার পরবর্তী সময়ের নানান রচনা সম্পর্কে কথকতা।

হুমায়ূন আহমেদ সমকালীন কথাসাহিত্যের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয়, মানুষের বিশেষত মধ্যবিত্তীয় সরল আবেগীয় অবস্থানের এক দিশারী যেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তিনি লিখেছেন শ্যামল ছায়া, ১৯৭১, সৌরভ। সেই লেখকের জোছনা ও জননীর গল্প নামের উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকে নতুনভাবে চেনানোর এক চিহ্ন যেন। এতে পাঠকের জন্য তিনি বেশ কিছু ইনফরমেশনও দিয়েছেন। তিনি নিজে তখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারের থিসিস পরীক্ষা দেয়ার ছাত্র; তার বয়স ২৩। তখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যা তাকে আমূল বদলে দেয়। এভাবে বদলে না দিলে এমন সীমিত নান্দনিকতার ইতিহাস আমরা পেতাম না।

আমরা এবার তাহলে উপন্যাসটি পাঠ করি। হুমায়ূনের উপন্যাসে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানেও আছে। এখানে নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী ছোটভাই শাহেদের মেয়ে রুনির জন্য বাড়ি থেকে একটা শাদা রাজহাঁস নিয়ে যায়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পর অনেক কষ্টে তার ভাইকে পেলেও মিছিল আর অস্থিরতার শহর ঢাকার সাথে তার পরিচয় হয় কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে যাত্রা করার পর - পরই। মাওলানা সাহেবকে নিয়ে ডিটেইলের কাজ করার প্রচুর সম্ভাবনা তৈরি হলেও আমরা তার ভিন্ন ধরনের চমক পাই। তিনি উপন্যাসটির মাঝামাঝি অবস্থায় নীলগঞ্জ থানায় যাওয়া এবং হঠাৎই মুক্তিযুদ্ধে র প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের দরুন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা _ এ দুই জায়গায় কেবল চরিত্রটিকে দেখা যায়। শুরুতেই ঔপন্যাসিক যে-ভাবে তার স্বভাবজাত ঠাট্টা-মশকরা নিয়ে উপন্যাস শুরু করেন, তা আমরা বিস্তৃতভাবে পাবো পাবো ভেবে অগ্রসর হই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর থাকেনি। নানা ঘটনা, উপঘটনা, নিপীড়ন, হত্যা, হিন্দু সমপ্রদায়ের উপর ভয়াবহ নির্যাতন, লুটপাট, ট্রেনিং, যুদ্ধ, অবিশ্বাস, অসহায়তা উপন্যাসটিকে ঘিরে রাখে। তথ্য-উপাত্তের ফলপ্রসূ আলোচনা বা উল্লেখই লেখকের প্রধান উপজীব্য। এই জন্যই হয়ত ইরতাজউদ্দিন বা অন্যসব চরিত্র নির্মাণে নিখুঁত বর্ণনা বা প্রচলিত গল্পবিস্তার ছিল না। ইরতাজউদ্দিন কিংবা অন্যসব চরিত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে লেখক সর্বদাই সমকালীন বুজর্োয়া রাজনীতি ও ঢাকাকেন্দ্রিক ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং লেখনিতে ক্ষমতায়নের বিষয়টাকে বিবেচনায় রেখে একধরনের স্বস্তিময়তার ভিতর রাখতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি ঘোষণার মতো করে কিছু জিনিস জানিয়েই রাখনে। তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, নারীর উপর পাশবিক নিপীড়নের মতো বিষয়কে ইচ্ছা করেই উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে আনেননি। এতে তার মানসিক স্থিরতাকে কেবল চেনা যায়, প্রকৃত ইতিহাসকে যেন একটা আড়ালের ভিতর ফেলে দেয়া হয়। সবকিছু বর্ণনা করা হয় না। আসলে তার বর্ণনা-উপমা-কল্পচিত্রের ভিতর পাঠকদের মনোজগতে বাড়তি কোনো চাপ প্রয়োগ করতে চাননি। এটি বরাবরই করে থাকেন। এ তার কৌশল বা নিজেকে গুছিয়ে রাখার প্রবণতা বলা যেতে পারে। রূঢ় ইতিহাস বর্ণনায় যে জটিলতা সৃষ্টি হওযার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল , তিনি তার জনপ্রিয়তার ধারাকে বজায় রাখার স্বার্থে খুব বেশি বাড়তে দেননি। উপন্যাসটিতে বুর্জোয়া অপরাজনীতির যে খোলস বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি

হয়েছিল, তা বড়ো রাজনীতিক দলসমূহের নেতা -নেত্রীদের স্বস্তিদায়ক ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পুষিয়ে দিয়েছেন বলা যায়।

তিনি তার ভাষা, পাঠমুগ্ধতার কৌশল প্রয়োগ_ এ-সব বজায় রাখার ব্যাকুলতাও প্রকাশ করেছেন এখানে। ফলে উপন্যাসজনিত দালিলিক প্রমাণাদি বাদ দিলে এটিকে হুমায়ূন আহমেদীয় ঘরানার একধরনের গল্পকথা বলা যেতে পারে। তিনি তার নেয়া তথ্যে সবদিক পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ দৃশ্যত সর্বজন গ্রহণযোগ্য (!) মুক্তিযুদ্ধের চালচিত্র তিনি অাঁকতেই তৎপর হলেন। এতে তিনি প্রচুর স্মৃতিকথা , পর্যালোচনা, সংবাদপত্রের কাটিং, চরিত্রকথা, ঘটনা এনেছেন। এমনকি দুই জায়গায় তিনি নিজেকে সরাসরি লেখক হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনী আলাদা করে বলার যে কোনো প্রয়োজন নাই তা তিনি অনেকটা বুঝিয়েও দিয়েছেন। যেসব চরিত্র এসেছে তা মুক্তিযুদ্ধের তথ্য -উপাত্ত-কাহিনীকে জীবন্ত করার জন্যই। তবে চরিত্রগুলোর ভিতর, বিশেষ করে সুবিধাজীবী ধূর্ত কবি ও আল বদর সদস্য কলিমুল্লাহ, কলিমুল্লাহ্র চাকর বাচ্চু মিয়া , জহর, গৌরাঙ্গ এবং কিছুটা হলেও ইরতাজউদ্দিনকে নিজস্ব মেকাপে সাজাতে চেয়েছেন। শিক্ষায়তন, পুলিশ আর তথ্যের সমাহারে জোছনা ও জননীর গল্প ভরে উঠেছে। মানব জাতির প্রতি সহজাত উপকারের একটা হুমায়ূন আহমেদীয় প্রবণতাও সর্বত্র দৃশ্যমান। তবে এও বলতে হয়, ঠাট্টা-তামাশার সময়-অসময় নেই, সুযোগ পেলেই তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এটি তার এক মজার কৌশল। একে আলাদা করে চিহ্নিত করারও কিছু নাই যেন। এমনকি নাইমুলের হাছুইন্যে নামকরণে মুক্তিযুদ্ধ চালানোতেও তার সেই প্রবণতা একই তালে বহমান।

এখানে দুটি বিষয়কে যুক্ত করা দরকার ছিল , বা তা যুক্ত করলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আরও পূর্ণতা পেত_ এক হচ্ছে, জনসংস্কৃতির বিপুল যে জাগরণ একাত্তরে ছিল , যা একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠার বিষয় ছিল, তাতে ছিল জন-প্রতিরোধ, তা মুক্তিযুদ্ধে আরও সহজভাবে আসতে পারত। আর সেই মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল -মতের আচরণ সংক্ষিপ্তভাবে আমরা দেখে নিতে পারি। মনি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ-মোজাফফর আর ছাত্র ইউনিয়ন আলাদা কমান্ডের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। চীনপন্থীদের ভিতর দেখা যায় নানামুখী প্রবণতা আর বিহ্বলতা। তার কারণও স্পষ্ট_ পিকিং এই যুদ্ধে কার্যত পাকিস্তানিদের পক্ষ নেয় , তাদের অনেকেই স্বউদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বলে খুব বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি স্থানীয় কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। মওলানা ভাসানীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা চীনপন্থিরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে অনেকটাই দ্বিধাহীন থেকেছিলেন। মানুষের সতেজ জীবন তারা পাঠ করতে পারে ননি। কিছু ব্যতিক্রম ছিল। কমরেড সিরাজ শিকদারের অনুসারীরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সিরিয়াস হয়। কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে পাকিস্তানি আর ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একই কায়দায় যুদ্ধ করতে চায়। আবার কমরেড আব্দুল হকের নেতৃত্বে চীনপন্থীরা ছিল স বচেয়ে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগ -পর্যন্ত এ

পার্টির নাম থেকে পাকিস্তান শব্দটিই বাদ দেয়নি তারা। বামপন্থীদের এমন একটা জটিল অবস্থা নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের কোনো পর্যবেক্ষণই নেই। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রনেতাদের অবদান ছিল আরও অগ্রসর , স্পষ্ট, একরোখা; এমনকি তারা কখনও কখনও রাজনৈতিক দলের হিসাব-নিকাশকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ অর্গানাইজ করার সবচেয়ে জঙ্গি-সংগঠিত রূপটি ছাত্রনেতা ও কর্মীদের ভিতর ছিল। উপন্যাসটিতে এ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কালে পশ্চিমবঙ্গ , ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশে নকশালপন্থিদের দারুণ দাপট চলে। ভারত সরকারের বড়ো ভয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নাম করে এ-সব সশস্ত্র বামপন্থীরা অস্ত্র নিয়ে নেয় কিনা। সেই সময় চারু মজুমদার বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষদের উদ্দেশে এক খোলা চিঠি দেন এবং তার মত অনুসারে ভারতের মতো উপনি বেশবাদীর সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের সংগ্রাম নিজেদেরকে করতে পরামর্শ দেন। এ-সব বিষয়গুলোও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় ইতিহাস। এ-সবের দিকে লেখক কোনো নজরই দেননি। যার ফলে এটিকে ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস করতে চাইলেও তাতে খ-িত ইতিহাসই লক্ষ করা যায়।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের উপর আমাদের চেনাজানা ইতিহাসে ইয়াহিয়া যত ভয়ঙ্করভাবে আছেন ভুট্টো তেমনভাবে নেই। অথচ এই লোকটিই কলকাঠি নাড়ার ফোকাল পয়েন্ট। রুটি, রুজি, আওরাতের জন্য প্রগতিশীল সম্ভোগান নিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেই শুধু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেননি , ভোটের রাজনীতিতে, কূটনীতিতে অনেক অগ্রসর ছিলেন। তিনি ৯৬ হাজার পাকিস্তানী বন্দি সৈন্যকেই বিনাবিচারে নিজ দেশে শুধু ফেরতই নেননি , স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উষ্ণ আতিথেয়তাও গ্রহণ করেন। তার এমন কূটনীতিক মারপ্যাঁচ নিয়ে হুমায়ূনের ভাবনা আরও বিস্তৃত, আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল। তবে তিনি তার বিশ্বাস আর আন্তরিকতা দিয়ে শেখ মুজিব , বেগম মুজিব, জিয়া, খালেদা জিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কাদের সিদ্দিকী বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, তখনকার পুলিশ বাহিনী_ এদেরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, ভারতীয় বাহিনীর কথাও কখনও কখনও উল্লেখ করেছেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গনি উসমানী, শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল তাহের তেমন গুরুত্ব না-পেলেও শুধু জিয়া নন খালেদা জিয়ার উপর নির্যাতনের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহা সকেও সমকালীন রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনুপাত হিসাবেই হয়ত ভাগ করেছেন। ফলে যারা জনযুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের ভিতর লুঙ্গী - গামছা পরা গ্রামীণ মুক্তিযোদ্ধারাই অধিক_ এই অংশটি তার উপন্যাসে তত বলিষ্ঠভাবে নেই। একহিসাবে সেটা ভালোই করেছেন, কারণ তারা তো আর হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের পাঠক হবেন না। আসলে একধরনের দূর থেকে ঘটনা দেখার প্রবণতা তার আছে বলা যেতে পারে। অনেক বিষয় এসেছে কেবলই উল্লেখ করার মতো করেই_ যেমন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, চরমপত্র, মুজিববাহিনী ইত্যাদি। এও উল্লেখ করতে হয়, তখন তাজউদ্দীনের সাথে শেখ মনির দ্বন্দ্ব ছিল মারাত্মক বিপজ্জনক। খন্দকার মোস্তাক,

মিজানুর রহমান প্রমুখের কাজ -কামজনিত অনেক অপকৌশলের কথাও জানা যায়। তখন বেশ কিছু পত্রিকা স্বাধীনতার পক্ষে বেরোত, তারও কোনো উল্লেখ নেই।

তিনি তার পরিচিত, অভ্যস্ত, স্বস্তিদায়ক ভঙ্গিকে নিজস্ব শুদ্ধকৌশলে মুক্তিযুদ্ধকে এঁকেছেন। তার জায়গাটিতে তার মতো করেই বিশুদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের জনযুদ্ধের মৌলিক তাড়নাটি আড়ালেই থেকে গেছে। ডায়লগ বা ঘটনা বর্ণনার সময় টিভি সিরিয়ালের প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। যেন প্রচুর দর্শক তার টিভি সিরিয়ালের সামনে বসে আছে, তাদেরকে যথারীতি হাসানো, কাঁদানো, বিমর্ষ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তেছে। মিলিটারি কর্তৃক মানুষ নিপীড়নের ঘটনা নিয়েও পাঠককে হাসানোর চেষ্টা দেখা যায়। দুঃখ-যন্ত্রণা-দারিদ্র্য-কোনো বিপদ দীর্ঘস্থায়ী করেন না তিনি। একটা না একটা সমাধান হয়েই যায় এবং তাতে এমন ব্যবস্থা হয় যাতে পাঠক আরাম করে মুক্তিযুদ্ধে র ভিতর থাকতে পারে। একধরনের রিলিফ তিনি তার পাঠকের জন্য রাখতে যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন, তবে কখনও এমন তথ্যে যেতে চাননি যাতে ভবিষ্যতে তা নিয়ে খুব বেশি তর্ক -বিতর্ক শুরু হয়। একধরনের মিলমিশ করিয়ে দেয়ার ভূমিকাও তিনি নিতে চেয়েছেন। যেমন জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, শেখ মুজিবের বন্দিজীবন, খালেদা জিয়ার উপর নিপীড়ন, মওলানা ভাসানীর কার্যত গৃহবন্দিজীবন , তিনি তার লেখায় আনতে পারেননি। তবে কিছু কিছু বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ _ যেমন মওলনা ভাসানীর অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে মোজাফফর ন্যাপের কর্মী নিয়োগ, মুক্তিবাহিনী আর মুজিববাহিনী যাই হোক শত্রু নিপাত গেলেই হয়।

তবে মুক্তিযুদ্ধের কথাসাহিত্যচর্চার প্রচলিত বেশ কিছু চলতি ধারণাকে তিনি ভেঙেছেন বলা যায়। উপন্যাসটির ভাষা কখনও বেশ গীতল, ছায়াময়, ভাটি অঞ্চলের জল-হাওয়ায় ভরপুর হয়েছে। তার ভাষায় হাওর অঞ্চলের একটা চমৎকার আবহ আছে। হারুন মাঝির মানবিক আচরণ বেশ চমৎকার। চরিত্র হিসাবে কলিমুল্লাহ, বাচ্চা মিয়া অনন্য। কখনও কখনও হুমায়ূন আহমেদ ঝিলিকও দেন বটে। বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর মানবিক কিংবা অমানবিক দিক তিনি অবলীলায় এঁকেছেন। মুক্তিযুদ্ধের অধিকাংশ গল্প - উপন্যাসে দেখা যায়, সর্বত্র একটা যুদ্ধংদেহী ভাব। হয় তারা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পাকিস্তানি এবং তারা যেন চব্বিশটা ঘণ্টা অনবরত যুদ্ধের ভিতরই ছিল। কিন্তু তিনি বেশ সাবলীলভাবে বাঙালি , বিহারি, এমনকি পাকিস্তানি সৈন্যদের ভিতর যাপিতজীবনের কিছু অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন। যেমন , কায়েস, বাচ্চু মিয়া, হারুণ মাঝি, কলিমুল্লাহ্ বেশ রক্তমাংসময় অস্তিত্ব নিয়ে বিচরণ করেছে। বাচ্চু মিয়া আর কলিমুল্লাহ তো অতি নিখুঁত মানুষের কাঠামো নিয়ে চলাচল করে। গনিমতের মাল হিসেবে মেয়েমানুষ ব্যবহার করার কথাও বেশ সাহস নিয়েই উল্লেখ করেছেন। মানুষ হিসাবে কিছু চরিত্র প্রদানকরত মুক্তিযুদ্ধের টাইপড কাহিনী থেকে পাঠককে মুক্ত রেখেছেন তিনি। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা , পশ্চিমবঙ্গ, আসাম-ত্রিপুরার একটা মহান ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে গিয়ে এদেশের মানুষ হিসাবে আমরা আসলেই তো তেমন কিছু করিনি। এই প্রসঙ্গ তিনি পূর্বকথাতে উল্লে খ করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর কথা এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা আগরতলার কথা কিন্তু সেভাবে আসেনি। তখনকার কলকাতা আর আগরতলাকে তো ঢাকার চেয়েও অনেক আপন মনে হতো। কারণ ঢাকা ছিল ভয়াবহ এক দোজখ।

তিনি দেয়াল পুনমার্জনা করে যেতে পারলেন না। এতেও মুক্তিযুদ্ধ আছে। আছে শেখ মু জিবের নৃশংস হত্যাকা-, কর্নেল তাহেরের ফাঁসির আদেশ। তিনি কী লিখলেন, মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠা ইতিহাসের জনদ্রোহ থেকে সরে গেলেন, ইতিহাসের হতবিহ্বল ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন, আবার কোর্টের আদেশ মোতাবেক একান্ত বাধ্যগত লেখক হয়ে উঠলেন। এতে তিনি মম্লান হয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের কাছে শিল্পকে, এর স্বাধীনতাকে হতচকিত করেছেন।

একেবারে চোখের কাছে ধরলে নিজের হাতের রেখাও হিজিবিজি হয়ে যায়_ তেমনই হুমায়ূন রাজনৈতিক ইতিহাসকে যত কাছে আনতে চেয়েছেন ততই সেই ইতিহাস নড়বড়ে হয়ে গেছে। সেই ঘটনা তার জোছনা ও জননীর গল্প, দেয়াল, মধ্যাহ্নয় আমরা দেখি। তবে কি তিনি ইতিহাসকে অত কাছের করে সহ্য করতে পারেন না? এটা সত্য যে, তিনি নিজেকে বরাবরই গল্পকার বলতেই পছন্দ করতেন। ইতিহাসকে তিনি নিজের করতে চাননি। বা, আমাদের চেনাজানা ইতিহাস তার পছন্দই হয়নি।

হুমায়ূন আহমেদ তার কথাসাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই মধ্যবিত্তসুখময় এক ধরনের পাঠক পেয়ে যান। এরা যেমন হুমায়ূন আহমেদকে ছাড়েন না, হুমায়ূন আহমেদও এই পাঠকদের নেশায় পড়ে যান। পাঠকদের রুচিই তাকে দিয়ে অনরবত একই হাসি-কান্না-বিষণ্নতার কাহিনী লিখিয়ে নিতে থাকেন। তাতে শঙ্খনীল কারাগার কিংবা নন্দিত নরকের যে অসাধারণ লিখিয়ে আমরা পেয়েছিলাম, পরবর্তীসময়ে তা আর তেমন ভ্রাম্যমাণ হয় না। বরং তিনি ক্রমান্বয়ে একই টাইপের লেখা লিখে যেতে যান। সীমিত কিন্তু অসংখ্য পাঠক হুমায়ূনের নিত্যসহচর হতে থাকেন।

তবে আমরা তার কথাশিল্পের ভিতর দিয়ে পূর্ববাংলার সহজাত জীবন দেখি , ভাষার নরম-কোমল রূপটি আমরা পাই। সর্বোপরি এই বাঙলার আলোছায়ার স্বতঃস্ফূর্ত শৈল্পিক খেলা তার আছে। তিনি সংস্কারকে চেনাতে চেয়েছেন, বিজ্ঞানকে সামনে হাজির করতে চেয়েছেন। পাঠক একেবারে ক্ষেপে যাক, বা তীব্র দহনে তার পাঠক্রিয়া স্থবির হোক, বা পাঠস্বাদুতা নষ্ট হোক তা তিনি চাননি। তিনি আমাদের মাঝে শুধু বেঁচে থাকবেন না, সর্বদা যেন জেগেও থাকবেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকে চেনাতে থাকবেন।

উড়াল পঙ্খী : হুমায়ূন আহমেদ
খায়রুল আলম সবুজ

উড়াল পঙ্খী উড়ে গেল অন্য আকাশে। বেশ কিছুদিন ধরে আশঙ্কা -উদ্বেগ কাজ করছিল মানুষের মধ্যে। কি হয় কি না হয়। ভালো হয়ে কবে ফিরবেন? নাকি...? হাজার আশা হাজার নিরাশা। এখানে ওখানে টুকরো টুকরো আলাপ আলোচনা চলছিল। সংবাদপত্রে টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন সর্বশেষ খবর পরিবেশিত হচ্ছিল। তার উপর বিশ দিনের একটি সংক্ষিপ্ত সফরে ছুঁয়ে গেলেন দেশের মাটি। কাটালেন কয়েকটা দিন নিজের হাতেগড়া নুহাশপল্লীতে। মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছা ড়ল। এবার হয়তো আশঙ্কামুক্ত হওয়া গেল। কিন্তু সব কিছু মাটি করে দিয়ে আমেরিকার বেলভিউ হাসপাতাল হঠাৎই সর্বশেষ খবরটা জানিয়ে দিল।

উড়াল পঙ্খী উড়ে গেছে অন্য আকাশে। চলে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ, এ সময়ের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থ ই বলেছেন, হুমায়ূন আহমেদ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সব ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমন মাঝেমধ্যে এমন মানুষ আসেন। পরবর্তী মানুষটি কবে আসবেন কে জানে। শিল্প তো একটি বাড়ি , তার অনেকগুলো ঘর থাকে। সবার জন্য সবগুলো ঘরে যাওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এর প্রায় প্রতিটি ঘরেই শুয়েছেন বসেছেন থেকেছেন। অতি সাবলীল ভঙ্গিতে একান্ত নিজস্ব ঢংয়ে এ সব নিয়ে তিনি এক একটি নতুন ভুবন তৈরি করেছেন। আর অত্যন্ত আপন ভঙ্গিতে দেশ ও মাটির রসে চুবিয়ে সে সব তিনি তাঁর দেশের মানুষকে পরিবেশন করেছেন। কি উপন্যাস কি নাটক কি চলচ্চিত্র কি সঙ্গীত_ সব ক্ষেত্রেই হুমায়ূন আহমেদ আপন ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অসাধারণ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে এ গল্পগুলো নিঃসন্দেহে মূল্যবান সংযোজন এবং স্থায়িত্বের দাবি রাখে। শেষের দিকে , জেনেছি, তিনি ছবি অাঁকতে শুরু করেছিলেন। একটা দুটো চোখেও পড়েছে। এ সবই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। নিমগ্ন শিল্পী দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় হৈচৈ কোলাহলের আড়ালে আলাদা আলাদা ঘরে বসে যা সৃষ্টি করেন তাই-ই এক সময় দেশ ও জাতির সম্পদে পরিনত হয়, ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়। হুমায়ূন আহমেদের এই চলে যাওয়া বড়ো অসময়ের বড়ো কষ্টের।

২৩ জুলাই ২০১২ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অথবা ঈদগাহ মাঠে যে অভূতপূর্ব দৃশ্য মানুষ দেখেছে স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে বোধ করি এমনটা দেখেনি। মনে হলো দুঃখের মাঝেই বুঝি এ দেশের মানুষ এভাবে একত্রিত হয়।

২

ব্যক্তিগতভাবে আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনে হুমায়ূন আহমেদের একটা দু'টো একক নাটক ও 'কোথাও কেউ নেই' নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে কাজ করেছি। এই মানুষ যতোটা না বাইরের তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরালের। সুতরাং তার সঙ্গে একবার দু 'বার অন্যত্র দেখা হলেও পরিচয় হয়েছিল

টেলিভিশনেই। এরপরও তার লেখা 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে আমি কাজ করেছি কিন্তু তখন তার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে ছবির পরিচালক ছিলেন বেলাল আহমেদ। ধারাবাহিক নাটক একটু লম্বা সময়ের ব্যাপার। 'কোথাও কেউ নেই' নাটকটিও বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। এই গোটা সময় ধরেই আমি তাঁকে দেখেছি। অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এমনিতে মিতবাক কিন্তু কথা বলতে শুরু করলে মনোযোগ আর অন্য দিকে সরানো যেত না। তার সঙ্গে হয়তো আমার ঘনিষ্ঠতা হতে পারতো কিন্তু সেটা হয় নি। ফলে 'কোথাও কেউ নেই' পরবর্তী হুমায়ূন আহমেদকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি।

সে কারণেই শুধু বিটিভি কালের কিছু টুকরো ছবি আমার মনে আসে।

একটা 'এ সপ্তাহের নাটক'-এর রিহার্সাল চলছিল বিটিভি ভবনে। প্রযোজক ছিলেন নওয়াজিশ আলী খান। নওয়াজিশ ভাই একটা দৃশ্য বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে আর একটি নতুন দৃশ্য লিখতে বললেন তাঁকে। হুমায়ূন আহমেদ একটু দূরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। আমরা বসে থাকলাম। মিনিট দশেক পর উঠে বললেন, নিন। প্রথম পাঠেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ কি শক্তি মানুষের! রসে টসটসে একখানা নতুন দৃশ্য। আর কি অপূর্ব বাঁক! পুরো নাটকে মনে হয় ও রকম দৃশ্য খুব বেশি ছিল না।

বিশাল একটি ওভাল টেবিল ঘিরে বসে আমরা 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের মহড়া দিতাম। হুমায়ূন কখনো কখনো নতুন পর্বের স্ক্রিপ্ট আমাদের পড়ে শোনাতেন। তার কথা বার্তার আঞ্চলিকতাটুকু তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। শুনতেও বেশ লাগতো। প্রথম দিকে বুঝতে পারি নি , পড়তে পড়তে হঠাৎ করে থেমে যেতেন। দুই পাঁচ সেকেন্ড চুপচাপ_ তারপর আবার শুরু করতেন। একসময় খেয়াল করলাম পড়তে পড়তে এতোটাই মগ্ন হয়ে পড়তেন যে আবেগ তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরত, নিজেকে সামাল দিতে গিয়েও সামাল দিতে পারতেন না। কখনো কখনো কেঁদেই ফেলতেন। মাঝে মাঝে অবাক লাগত চুপচাপ মানুষটার এ কি ব্যাবহার! হুমায়ূন আহমেদ তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করতে করতে নিজেই কাঁ দতেন আর স্রষ্টাই যখন কাঁদেন পাঠক দর্শকদের কি আর না কেঁদে উপায় থাকে?

৩

সে সব দিনে নাটকের পরিবেশটা ছিল বড় আপন। এয়ারপোর্টের কাছে কোনো একটি পার্কের মতো জায়গাতে আউটডোর হচ্ছিল 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের। আকাশ মেঘলা। টিপ টিপ বৃষ্টি , সঙ্গে সামান্য জোর বাতাস। পার্কে গোটা চারেক রঙিন লোহার ছাতা বসানো তার নিচে চেয়ার বিছানো। সেখানে একটি চেয়ারে বসে আমি 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে' গানটি গুন গুন করে গাইছিলাম_ কেউ শুনছে কিনা সে ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম না। সুবর্ণা মুস্তাফা আর আমি ছিলাম এ দৃশ্যের পাত্রপাত্রী। হঠাৎ হুমায়ূন

এসে বললেন, সবুজ, কি গাইছিলেন আপনি? আমি বললাম। তিনি বললেন, আপনি এই গানটা এই দৃশ্যে গাইবেন। এটাকে আমি আরও দু'এক জায়গায় ব্যাবহার করব। তাই-ই করেছিলেন। এর ফলে দৃশ্যগুলো একটু ভিন্ন হয়েছিল। এই যে চারপাশ থেকে চট্ করে উপকরণ জোগাড় করে দৃশ্য সাজানো এও কি সবার পক্ষে সম্ভব?

বিটিভির তিন নম্বর স্টুডিওতে এক সঙ্গে একাধিক সেট পড়ত। কোথাও বাড়ি কোথাও রাস্তা কোথাও দোকান। রেকর্ডিং-এর দিন হুমায়ূন থাকতেন। কখনো একা, কখনো সপরিবারে। ধারণের সময় প্রয়োজন হলে কখনো নাটকের একটু আধটু মেরামত করতেন। দরকার পড়লে দু 'একটি ছোট খাটো দৃশ্য_ তাও জুড়ে দিতেন। সেটে হাতলওয়ালা একটি কাঠের চেয়ারে বসতেন হুমায়ূন। পরিবারের সবাই থাকলে আরও একটি চেয়ার বসতো পাশে। সেটাতে বসতেন তার স্ত্রী গুলতেকিন। ছেলেটি বাবা অথবা মায়ের কোলে আর মেয়েরা পাশে অথবা পিছনে বাবা মায়ের গায়ে লেগে দাঁড়াতো। মেয়ে শীলা এ নাটকের একটি চরিত্রে ভারি সুন্দর অভিনয় করেছিল। এই দৃশ্যটি মাঝে মধ্যেই রচিত হতো , কিন্তু আমি কখনো আলাদা করে দেখি নি। হঠাৎ একদিন কাজের ফাঁকে দৃশ্যটি আমার কাছে অসাধারণ মনে হলো। বোধে অনির্বচনীয় একটি দৃশ্য অনুভব কললাম। সবার অলক্ষ্যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। পারফেক্ট

ফ্রেমে একটি পূর্ণ পরিবার। সবকটা মুখে প্রশান্তির ছাপ। আনন্দ ভালোবাসার কমতি নেই কোথাও। মনে হলো, বাহ্ কী সুখী মানুষ হুমায়ূন আহমেদ! দৃশ্যটি আমার ভিতরে সেই যে গেঁথে গেছে মনে হয় এ দৃশ্যের একটি রেখাও বুঝি কোনোদিন মুছবে না। এখনো আমি চাইলেই গোটাটা দেখতে পাই। উড়ে যেতে যেতে এক খ- উড়াল মেঘ যেমন সম্ভাবনার জলধারায় ভিজিয়ে দিয়ে যায় ধূসর জীবন _ হুমায়ূন আহমেদ যেন তেমনই এক খ- উড়াল মেঘ; জল ছিটিয়ে গেল আমাদের জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে ফুল ফুটবে সেই আশায়। উড়াল মেঘই উড়াল পঙ্খী হল শেষে। তবে বড় অসময়ে উড়াল পঙ্খী উড়ে গেল অন্য আকাশে_ সত্যি বড় অসময়ে।

তাঁর নাটকে আমরা আমাদের জীবনের ছবি খুঁজে পাই

ইনামুল হক

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটকে হুমায়ূন আহমেদ এক নক্ষত্রের নাম। তিনি নাটক লিখেছেন মূলত টেলিভিশনের জন্য। তবে মঞ্চের জন্যও তাঁর লেখা নাটক আছে। "মহাপুরুষ" ও "১৯৭১"-এ দুটি নাটক মঞ্চে খুব প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁর "দেবী" উপন্যাস থেকেও মঞ্চ নাটক করা হয়েছিল। সে ধারাবাহিক নাটক করে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো, দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলো। সেই মুগ্ধতা আজও মানুষের মনে আছে। সেই চরিত্র ও গল্পগুলো আজও মানুষের মনে দাগ কাটে। "অয়োময়" , " এইসব দিনরাত্রি", "কোথাও কেউ নেই"_ এসব ধারাবাহিক নাটক মানুষের জীবনের একটা অংশ হয়ে আছে।

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম নাটক লেখার সাথে আমার কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাকে প্রথম চিনলাম ওই নাটকের মাধ্যমে। হুমায়ূন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ও আমার কাছে এসেছিল কীভাবে নাটক লিখতে হয় তা জানার জন্য। আমি প্রথম তাকে চিনতে পারি নাই। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় কোন ছাত্র এসেছে আমার সাথে দেখা করতে। আমি তাকে "তুমি" করে বলি। ও বলে , নওয়াজেশ আলীর কাছ থেকে শুনে আমার কাছে এসেছে। আমার কাছে সে নাটক লেখার ফরমেট চায়। আমি তাকে আমার প্রচারিত দুটো নাটকের স্ক্রিপ্ট দেই। এভাবে তাঁর সাথে আমার হৃদ্যতা তৈরি হয়।

নাটক লেখার ব্যাপারে হুমায়ূন পারিপাশ্বর্িককে খুব প্রাধান্য দিত। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো একেবারেই অচেনা নয়। আমাদের চির চেনা। সে মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবন নিয়ে নাটক লিখতে ও তৈরি করতে বেশি স্বস্তি পেত। পরিবারের সদস্যদের নিজেদের সম্পর্ক তাঁর নাটকে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁ র নাটকে আমরা আমাদের জীবনের ছবি খুঁজে পাই। দর্শকরা যাতে তাঁর নাটক দেখে বিড়ম্বিত না হয় সে দিকে সে সব সময় খেয়াল রেখেছে। রস-কষহীন কোন নাটক সে লেখে নি, তৈরিও করে নি।

হুমায়ূন যখন নাটক বানানো শুরু করল তখন খ- নাটক বেশি হতো। সিরিয়াল তখন খুবই কম হতো। হুমায়ূন যখন সিরিয়াল বানানো শুরু করল তখন সিরিয়াল খুব জনপ্রিয় হলো। সারা দেশে এক ধরনের হৈ চৈ পড়ে গেল। মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মানুষ হুমায়ূনের নাটক দেখার জন্য ভীষণ উন্মুখ হয়ে পড়ল। আমার মতে, খ- নাটক হলো ছোটগল্পের মতো। আর ধারাবাহিক নাটক হলো উপন্যাসের মতো। হুমায়ূন নাটক এতো সুন্দর করে সাজাতো যে যেকোন চরিত্রই দর্শক পছন্দ করতো। এমনকি ছোট চরিত্রও। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে এক ধরনের অভিনবত্ব ছিল। তাঁর নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যে অভিনয় করেও অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী জনপ্রিয় হয়েছে। বাংলাদেশে যে অল্প কয়েকজন পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী জন্ম দিতে পেরেছে তার মধ্যে হুমায়ূন অন্যতম। সে অভিনয়ের বাইরের লোকজন দিয়ে অভিনয় করিয়েছে। তাদের জনপ্রিয় করেছে।

শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কথা হুমায়ূন আহমেদের নাটকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের জীবনের নানাবিদ সংগ্রামের কথা সে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর একটা বিশে ষ গুণ হলো সে যেকোন বিষয় অনেক সহজ করে তুলে ধরতে পারে। এই সহজ করে তুলে ধরতে পারাটা কিন্তু খুব কঠিন। তাঁর মতো কেউ এ রকম সহজভাবে তুলে ধরতে পারে নাই।

ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে যে হুমায়ূন আর আমাদের মাঝে নাই। তাঁর মতো এতো মেধাবী লেখক - নাট্যকারের এই অকালে চলে যাওয়াটা মেনে নেয়া খুব কঠিন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

হুমায়ূন আহমেদের পাঠক

মারুফ রায়হান

মানবজীবনের সুন্দরতম সময় যৌবনকাল। হুমায়ূন আহমেদেরে লেখা পড়ে এই বাংলার যৌবনশক্তি হাসিকান্নার ভেতর দিয়ে গেছে। নিজেদেরই ক্ষমতা ও অক্ষমতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছবি তারা অবলোকন করেছে। নিজেদের চেহারা খুঁজেছে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের আয়নায়। এটার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

লেখার কী মূল্য যদি তা কেউ না পড়ে ? লেখার সার্থকতা পঠনে ও প্রতিক্রিয়ায়। ভালো লেখা পড়ে থাকে না, পাঠক ঠিকই তার খোঁজ পেয়ে যান। কোন্ লেখা কত পাঠক পড়ছেন তা পরিমাপের একটি পদ্ধতি হলো বইয়ের কপি বিক্রি। কিন্তু বই বিক্রির ওপর কি লেখার ভালো-মন্দ কিংবা লেখকের উচ্চতা নির্ভরশীল? তা নয়। সাহিত্য বিচারের মানদ-ে উত্তীর্ণ এবং উৎকৃষ্ট একটি বই নানা কারণে খুব বেশি সংখ্যক পাঠকের ভেতর প্রভাব ফেলতে অপারগ থাকতেই পারে। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি; তেমনি যদি বলতে পারতাম_ সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক! কিন্তু তা বলা যাবে না, যিনি পাঠ করেন তিনিই পাঠক। পাঠক মানুষ ব'লে তার বয়স বাড়ে, সে বিকশিত হয়, এভাবে তার পাঠের চাহিদা বদলে যেতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক, যদি সত্যি সত্যি পাঠকের ভেতর পাঠের পিপাসা থাকে। সব পাঠকই বোদ্ধা পাঠক, এমন দিব্যি দেয়া চলে না। পাঠক যেমনটা চায় ঠিক তেমন তেমন বই লিখে দেওয়ায় কোনো লেখক অসম্মতি প্রকাশ করতেই পারেন। লেখক এবং পাঠক_ এই দুই শ্রেণীর ভেতর সাঁকো তৈরির কাজটি সবচেয়ে ভালো করতে পারেন একজন সমালোচক, সম্পাদকেরও দায়িত্ব রয়েছে। প্রকাশকের কাজ নির্ভুলভাবে বই প্রকাশ করা, বাজারে লেখকের বইয়ের সরবরাহ সচল রাখা এবং বইয়ের খবরটি পাঠকের কাছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা। এসব কথা আমাদের জানা। তবু বলার উদ্দেশ্য নিজেদের দিকেই ফিরে তাকানো। আমি লেখক না হতে পারি, পাঠক তো বটে, কিংবা আমি একজন প্রকাশক। তাই আমার কাজটি আমি যথাযথভাবে করছি কিনা সেটার মূল্যায়ন জরুরি ।

যাহোক, পাঠক সংখ্যার বিচারে শরৎচন্দ্র শীর্ষে নাকি হুমায়ূন আহমেদ ফার্স্ট_ এই হিসাবে না গিয়েও আমরা বলতে পারি হুমায়ূন আহমেদ বিপুল সংখ্যক পাঠক পেয়েছেন। বিভিন্ন বয়স শ্রেণী ও পেশার পাঠক আছেন তাঁর। তবে প্রধাণত তরুণ সমাজ, যার একটি বড় অংশ আবার গৃহিণী , হুমায়ূন আহমেদের নতুন বইয়ের অপেক্ষায় থাকেন। যুক্তি মানলে এটাও আমরা মানবো যে , হুমায়ূন আহমেদ মূলত তরুণবয়সী এবং গৃহিণীদের পাঠ-চাহিদা পূরণ করেছেন। সমাজের বিশাল একটা পড়ুয়া অংশকে উপকৃত করেছেন। এটার যথার্থ মূল্য দিতে হবে। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, তিনি বিপুল সংখ্যক পাঠক সৃষ্টি করেছেন। কথাটা শতভাগ অসত্য_ এটা আমরা বলতে পারি না। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁর বই পড়েই বাঙালি পাঠক হতে শিখেছে। জাতি হিসেবেই বাঙালির ভাবালুতা , আবেগের আতিশায্য এবং যুক্তিকে কঠোরভাবে

অগ্রাহ্য করার প্রবণতা রয়েছে। তাই একজন হুমায়ূন আহমেদকে একজন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা দিতে আমরা পছন্দ করি। হুমায়ূন আহমেদের দর্শক আমার অন্য লেখার বিষয় _ এখানে শুধু এটুকু বলে রাখতে পারি_ হুমায়ূন আহমেদের দর্শক সংখ্যাও বিপুল , দর্শক প্রভাবিত হয়ে পাঠকে পরিণত হয়েছেন, কিংবা যিনি পাঠক তিনি দর্শকও বটে_দুটোই সত্য। তার জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই জনপ্রিয়তাকে যদি কেউ টেলিভিশনের টক শোয়ে দেশের অবিসংবাদিত নেতার জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনা করেন তবে সন্দিহানভাবে তা হবে বালখিল্যতা। বাঙালির ভেতর বালখিল্যতাও রয়েছে। তাই হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিক্ষমতা এবং তার ব্যবহার বা প্রয়োগ নিয়ে নির্মোহ ও সঠিক মূল্যায়ণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

উপন্যাস কেবল একটি কাহিনী নয়, একখানি উপন্যাস কোনো মানুষের জীবনে এমন প্রভাব ফেলতেও সক্ষম যাতে তাঁর জীবন বদলে যেতে পারে। উপন্যাস পাঠের আগের মানুষ আর পাঠপরবর্তী মানুষ অভিন্ন থাকে না। তাঁর জীবনবোধ বদলে যায়। উপন্যাসের এই ক্ষমতা সম্মন্ধে ক'জন লেখক বা পাঠক সচেতন? তবে উপন্যাসকে আনন্দ লাভ বা আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে বিনোদন লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষেই সমর্থন বেশি। বিপুল সংখ্যক তরুণ সমাজকে বিনোদন দেওয়ার ক্ষমতা এক অসাধারণ ক্ষমতা। সহজ ভাষায় একটা জমজমাট কাহিনী বলে যাওয়ার জন্য প্রতিভাবান হওয়া লাগে। তবে হুমায়ূন আহমেদ তার চাইতে অধিক প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি কালজয়ী শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন। সত্যপ্রকাশের দায়বোধ থেকে বলতেই হবে, হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেননি , কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলি, তিনি নিজের লেখার একটা ছক এঁকে নিয়েছিলেন। সত্তর ও আশির দশকের লেখক হুমায়ূন আহমেদ আর পরবর্তী দুই দশকের হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাঁর বেশ কিছু গল্প রয়েছে যেগুলো উচ্চমানের এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় হওয়ার দাবীদার। অথচ হুমায়ূন আহমেদ বিগত দুই দশকে ছোটগল্প শাখাটিতে আর তেমন ফসল ফলালেন না। তাঁর প্রথম দু'টি উপন্যাস নন্দিত নরকে আর শঙ্খনীল কারাগার-এর কথা বহু গুণীজন উল্লেখ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ ভালো করেই জানতেন তিনি কাদের জন্য লিখছেন। তার প্রধাণত দায়বোধ ছিল তরুণ পাঠকদের প্রতি। এর বাইরে দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি একটি দায় বহন করে চলেছিলেন, সেটি হলো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস রচনা। যদিও 'জোছনা ও জননীর গল্প' তরুণ পাঠকসমাজকে আশানুরূপ আন্দোলিত করতে পারেনি। এটি ছিল তাঁর ছকের বাইরের লেখা। ভালো লেখা তো বটেই।

হুমায়ূন আহমেদের পাঠক কি কেবল তাঁরই রচনার পাঠক? অন্য লেখকদের লেখা কি তাঁদের পাঠ্য নয়! এ প্রশ্নের শতভাগ সঠিক জবাব আমাদের জানার উপায় কী? তবে বাস্তবতা, লক্ষণ, এবং অন্যান্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, হুমায়ূন আহমেদের পাঠক শুধুমাত্র তাঁরই পাঠক। অন্য লেখকদের বইয়ের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। লেখকের জন্য এটা আত্মশ্লাঘার বিষয়

হলেও সাহিত্যের জন্য সুসংবাদ হতে পারে না। এখানেই চলে আসে মোহ বা আকর্ষণের বিষয়টি। একজন লেখকের নির্দিষ্ট কয়েকটি ধরনে রচিত কাহিনী এক শ্রেণীর পাঠক মোহগ্রস্ত হয়ে পাঠ করছেন। একজন লেখকের এই যাদুকরী শক্তিকে সম্মান জানানোর পর আমরা বলতে পারি, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ একজন লেখক কৌশলে হলেও পাঠকের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রেখে যান। তরুণের ক্ষেত্রে স্বপ্ন আর রোমান্টিকতা স্বাভাবিক ও প্রিয় বিষয়। তাকে দায়িত্বশীল ও প্রতিবাদী সত্যোচ্চারণকারী করে তোলা অসম্ভব নয়। হুমায়ূন আহমেদ যে এটা জানতেন না, তা তো নয়। জীবনবাস্তবতা প্রকাশের বেলায় তাঁর কৌশল ছিল ভিন্ন। এ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যার সুযোগ নেব আগামীতে।

একুশের বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশকের স্টলের সামনে প্রচ - ভিড় একটি অসাধারণ সৌন্দর্য_ অভূতপূর্ব তো বটেই। তাঁর প্রয়াণের পর শহীদ মিনারে কদম বা অন্য কোনো ফুল হাতে তাঁর নবীন পাঠকদের দীর্ঘ সারি তেমনি এক অসামান্য সৌন্দর্য। ধরা যাক, কয়েক লক্ষ তরুণবয়সী পাঠক প্রতিটি বইমেলায় এবং নামী সব কাগজের ঈদসংখ্যায় তাঁদের প্রিয় লেখকের নতুন উপন্যাস সন্ধান করে এসেছেন। আগামীতে কি তাঁরা হুমায়ূন আহমেদের নতুন লেখা না পেয়ে ব্যথিত ও হতাশ হয়ে উপন্যাস পাঠই বন্ধ করে দেবেন?

২. পাঠকের সংখ্যা দিয়ে যদি হুমায়ূন আহমেদকে মূল্যায়ণের চেষ্টা করি তবে তাঁর প্রতি আমরা সুবিচার করব না। এতে এই শক্তিমান লেখকের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হবে না। এতে অতিমূল্যায়ণ এবং অবমূল্যায়ণ- দুটোর আশঙ্কাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হুমায়ূন আহমেদের বিপুল সংখ্যক পাঠক প্রিয় লেখকরে মৃত্যুতে আঘাতপ্রাপ্ত। তাঁর এক ভক্তপাঠক বন্ধুকে লিখেছেন : 'স্যার, হিমু হওয়ার চেষ্টা করেছি অনেক। আমার ধারণা ছিলো অনেকটাই সফল হয়েছি হিমু হওয়ার পথে। কিন্তু হিমু যে হতে পারিনি তা বুঝেছি গতকাল রা তে।

আপনার হিমু সকল আবেগ অনুভূতির উর্ধে। আপনার হিমু কিছুই গায়ে মাখে না। আপনার হিমু কখনো কেঁদে বুক ভাসায় না।

স্যার আমি হিমু হতে পারিনি। একদমই পারিনি।

কান্নাগুলো গলায় দলা পাকিয়ে আটকে ছিলো অনেকক্ষণ। প্রাণপণ চেষ্টা করেছি না কাঁদতে। আপনিই তো বলেছেন ্তুমরিলে কান্দিস না আমার দায়থ। শেষ পর্যন্ত পারিনি স্যার। কান্না আটকে রাখতে পারিনি এক ফোটাও।

স্যার, খুব একা করে দিয়ে গেছেন। হিমু , রূপা, শুভ্র, বাদল, মিসির আলী, মাজেদা খালা, ধানমন্ডি থানার অসি... সবাইকে নিয়ে গেছেন সাথে করে।

কেমন আছে তাঁরা সবাই? অন্যভুবনে হিমু কি এখনো জোসনা দেখে? রূপা কি নীল শাড়ি পরে? মিসির আলীর চশমায় কি ধুলো জমেছে অনেক?'

এই উদ্ধৃতি থেকে তাঁর পাঠকদের মনোজগতেরও একটা পরিচয় মেলে। আমাদের প্রত্যাশা তাঁর পাঠকেরা পাঠ ছেড়ে দেবেন না। লেখকের লেখনী থেমে যাওয়ার অর্থ যদি হয় পাঠকের পাঠতৃষ্ণা উবে যাওয়া _ তাহলে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। সামগ্রিক সাহিত্যের বিষয়টি অনেক ব্যাপক, সেখানে ডুব দিলে মেলে বহু মণিকাঞ্চন। হুমায়ূন আহমেদের একনিষ্ঠ পাঠকরা যদি সাহিত্যের বিরাট ভুবনে প্রবেশ করেন তবে সেটাই হবে হুমায়ূন আহমেদ নামে যাদুকর এক লেখকের অর্জনের খাতায় আরো একটি ইতিবাচক সংযোজন। কেবল লেখার জন্যও আজকের বাংলাদেশে লাখো তরুণ উদগ্রীব থাকতে পারে, একজন লেখককে তাদের হৃদয়ে মর্যাদাকর আসন দিতে পারে_ এটা অনেক বড় ব্যাপার। এর সৌন্দর্য ও মহিমাটুকু কিভাবে বিকশিত ও প্রসারিত হতে পারে সেটাই দেখবার বিষয়।

হুমায়ূন আহমেদের সেলুলয়েড চিত্র

দেব জ্যোতিভক্ত

চলে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত। তিনি মোট আটটি সিনেমা বানিয়েছেন, যার মধ্যে একটি সিনেমা এখনো মুক্তি পায় নি। ৫০টির অধিক গান তিনি লিখেছেন, যার অধিকাংশই সিনেমার প্রয়োজনে। টেলিভিশনের জন্য তিনি বানিয়েছেন অসংখ্য নাটক। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, তিনি বাংলা সাহিত্যে পাঠক সৃষ্টি করতে পেরেছেন । তবে এ কথাও নিদ্বির্ধায় বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদ সিনেমাপ্রেমীদের হলমুখী করেছেন। যখন বাংলা সিনেমার দুরবস্থা তখন তার সিনেমা দেখতে মানুষ হলে ফিরেছে। হুমায়ূন আহমেদ হচ্ছেন সেই ম্যাজিক মাস্টার যিনি যেখানেই হাত রেখেছেন সেখানেই সোনা ফলেছে; কাগজে কলমে এমনকি সেলুলয়েডে।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম ছবি "আগুনের পরশমনি"। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৯৫ সালে। মুক্তিযুদ্ধের পেক্ষাপট নিয়ে এমন চলচ্চিত্রের সংখ্যা বিরল। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি যুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলছেন নিখুঁতভাবে। যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতাকামীদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা , হানাদারদের পৈশাচিক উল্লাস এবং গণমানুষের দীর্ঘশ্বাস সেলুলয়েডে ধারণ করতে পেরেছেন। অথচ এ ছবির অর্থ সংগ্রহের জন্য লেখকের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় ছবি "শ্রাবণ মেঘের দিন"। আবহমান গ্রামীণ জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ ছবিতে। গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ , আবেগ, চিরায়ত বিশ্বাস এ ছবিতে স্পষ্ট হয়েছে। বঞ্চিত মানুষের জীবন দর্শন ও ফোস্কা পড়া সমাজ ব্যবস্থার উপস্থিতি এ সিনেমাকে প্রাণবন্ত করেছে। সবশেষে হৃদয়বিদারক সমাপ্তি দর্শকদের ব্যথিত করে। প্রচলিত বিচ্ছিন্নতা জীবনে এক ধরনের অতৃপ্তি সৃষ্টি করে , সেই অতৃপ্তিতে দর্শক নিজেদের অতৃপ্তি খুঁজে পায় , ফলে যে অনুভূতি তৈরি হয় তা অবশ্যই স্পর্শকাতর হলেও খানিকটা তৃপ্তিরও বটে। ছবিতে স্বল্প পরিসরে মুক্তিযুদ্ধের কথা এসেছে। ছবির গানগুলো ছবিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

"দুই দুয়ারী" সিনেমা আবর্তিত হয়েছে একজন রহস্যমানবকে কেন্দ্র করে। রহস্যমানব হঠাৎ করে এক পরিবারে আবির্ভূত হয়। রহস্যমানব সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা দিয়ে করতে থাকে একটার পর একটা সমস্যার সমাধান। রহস্যমানবের আগমন ঘটে যেমন রহস্যজনকভাবে ঠিক তেমনি তার বিদায়ও হয় রহস্যজনকভাবে। হঠাৎ একদিন গান গাইতে গাইতে সে চলে যায়। তার চলে যাওয়ায় কোন ধরনের কোন শূন্যতা তৈরি হয় না, তৈরি হয় অন্তহীন রহস্যের শিহরণ।

"শ্রাবণ মেঘের দিন" সিনেমার মতো "চন্দ্রকথা" সিনেমাটিও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত। সাদামাটা এক গ্রামের মেয়ের নাম চন্দ্র। তার জীবনের গল্পই "চন্দ্রকথা"। "ও আমার উড়াল পঙ্খীরে" শিরোনামে এ সিনেমার একটা গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তবে এ সিনেমাটি "শ্রাবণ মেঘের দিন" সিনেমার মতো দর্শক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে নির্মিত হুমায়ূন আহমদের দ্বিতীয় ছবি "শ্যামল ছায়া" । যুদ্ধের সময় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকা একদল মানুষের জীবন নিয়ে সিনেমাটি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু মানুষ জীবন বাঁচাতে একটা ইঞ্জিনচালিত নৌকা য় আশ্রয় নেয়। নৌকা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে এগুতে থাকে। মানুষের স্বপ্ন, বেদনা ও মৃত্যভয়ের চিত্রবর্ণনা এ সিনেমায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

উচ্চবিত্ত এক কিশোরীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে "আমার আছে জল" সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ মানব সম্পর্কের অন্তর্মুখী শূন্যতাকে এ সিনেমায় তুলে ধরেছেন। সিনেমার প্রতিটি চরিত্র ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতি "একান্ত ব্যক্তিগত" করে রাখে সারাক্ষণ অথচ তারা একে অপরের সাথে জড়িয়ে রেখেছে অথবা জড়িয়ে ফেলেছে। মানুষ অসহায় হয়ে পড়লে মৃত্যুতে নিজের আশ্রয় খোঁজে। ছবিটির শে ষ হয়েছে আত্মহত্যা দিয়ে।

"নয় নম্বর বিপদ সংকেত" হুমায়ূন আহমদ পরিচালিত একটি আলোচিত ছবি। এ ছবি নিয়ে একটি মহল বেশ সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। অনেকে অভিযোগ করেছিল এ ছবিতে কোন মেসেজ নাই, এ ছবি অত্যন্ত নিম্নমানের। এ অভিযোগের জবাব হুমায়ূন আহমেদ দিয়েছেন। তিনি এ ছবিটিকে একটি হাসির ছবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন এ ছবি দেখে মানুষ হাসুক। মানুষের জীবনে হাসির অনেক দরকার। "নয় নম্বর বিপদ সংকেত" ছবিটি দেখে দর্শক হেসেছে, মুগ্ধ হয়েছে, হাসতে হাসতে হল থেকে বের হয়েছে। নাক সিটকানো সেই সব লোকেদের দিকে আঙ্গুল না তুলে বলতে চাই , সিনেমা দেখে মানুষ হাসলেই কি সিনেমা নিম্নমানের হয়ে যায়?

হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ ছবির নাম "ঘেটুপুত্র কমলা"। ছবিটির কাজ শেষ , এখন মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এ ছবিটি শুরু করার সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এরপর আর ছবি বানাবেন না। সত্যিই তিনি আর ছবি বানাবেন না, বানাতে পারবেন না। কারণ তিনি তো এখন "না ফেরার দেশে", "ছবি না বানানোর দেশে"।

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস নিয়েও বেশ কয়েকটি সিনেমা হয়েছে। এর মধ্যে মোরশেদুল ইসলাম বানিয়েছেন দু'টি চলচ্চিত্র। প্রথমটির নাম "দূরত্ব"। পুতুল উপন্যাস অবলম্বনে এ শিশুতোষ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো "প্রিয়তমেষু"। "প্রিয়তমেষু" দেখে হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হয়েছিলেন। মোরশেদুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মুগ্ধতার কথা নিয়ে একটা লেখাও লেখেন। এছাড়াও বেলাল আহমেদ বানিয়েছেন "নন্দিত নরকে", আবু সাইয়িদ "জনম জনম" উপন্যাস অবলম্বনে বানিয়েছেন " নিরন্তর", শাহ আলম কিরন বানিয়েছেন "সাজঘর", তৌকির আহমেদ বানিয়েছেন "দারুচিনি দ্বীপ"।

হুমায়ূন আহমেদ জ্যোৎস্না ও বৃষ্টি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর প্রতিটি সিনেমায় জ্যোৎস্না ও বৃষ্টি আছে। তিনি মারা যেতে চেয়েছিলেন কোন এক জ্যোৎস্নার রাতে। প্রকৃতি তাকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করে নি। কে জানে, হয়তো প্রকৃতিও আমাদের মতো প্রস্তুত ছিল না তাঁর মৃত্যুর জন্য। সিনেমাপাগল এ লেখক বেঁচে থাকুক তাঁর লেখায়-সিনেমায়, বৃষ্টিতে-জ্যোৎস্নায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতা দিয়ে শেষ করতে চাই_

"আমার মতো বাতাস জানে ডানা

আমার মতো সূর্য জানে ফুল,

তোমার চোখে নিদ্রা হলো টানা

মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে

আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল।"

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টকর্মের কপিরাইটের ভবিষ্যৎ কী ?

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের অনবদ্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সৃষ্টকর্মগুলোর কপিরাইট কী হবে? তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর লেখা বই, নাটক, চলচ্চিত্র, গান– এ মেধাসম্পদগুলোর অধিকার কারা ভোগ করবে, কীভাবে ভোগ করবে, কে হবে এসবের বৈধ উত্তরাধিকার। এসব কর্ম থেকে অর্জিত আয়ের সুবিধাই বা কে ভোগ করবে। এসব নির্ধারণে কোনো আইনি জটিলতা রয়েছে কি না , এ বিষয় নিয়েই কয়েকজন কপিরাইট আইন বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তানজিম আল ইসলাম ও আকরামুল ইসলাম

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের লিখিত অনুমোদন লাগবে

মো. মনজুরুর রহমান

সাবেক কপিরাইট রেজিস্ট্রার, কপিরাইট অফিস, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ন কনভেনশন এবং আমাদের দেশের কপিরাইট আইন অনুযায়ী হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারীরা। এ ক্ষেত্রে রয়্যালটিও পাবেন তাঁরা। ৬০ বছর পার হয়ে গেলে এগুলো জনসাধারণ প্রকাশ করতে পারবে। হুমায়ূন আহমেদের কিছু বইয়ের স্বত্ব তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন, কিছু দ্বিতীয় স্ত্রী শাওন এবং আরও অন্যদের দিয়ে গেছেন। এই প্রকাশনাগুলোর ক্ষেত্রে যাঁদের স্বত্ব দিয়ে গেছেন, তাঁরাই ভোগ করবেন জীবিতকালীন। কপিরাইট আইন অনুযায়ী দুভাবে অধিকার জন্মায়। একটি হলো অর্থনৈতিক অধিকার এবং আরেকটি নীতিগত অধিকার। ৬০ বছর পার হয়ে গেলে জনসাধারণ অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারবে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টকর্মের কোনো বিকৃত বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

এই ৬০ বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রকাশক তাঁর বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করতে চান , তাহলে হুমায়ূন আহমেদের বৈধ উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হুমায়ূন আহমেদের বৈধ উত্তরাধিকারী কারা হবেন। এখানে মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার নির্ধারিত হবে। আমরা যতটুকু জানি যে তাঁর প্রথম স্ত্রী গুলতেকিনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে গুলতেকিন তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী নন।

তবে তাঁর প্রথমপক্ষের চারজন ছেলেমেয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। আবার তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী শাওন এবং এ পক্ষের দুই সন্তান তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। এ বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখা গেলে প্রচলিত মুসলিম আইন অনুযায়ী বিষয়টি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হবে। হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টকর্মগুলোও তাঁর সম্প দ।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি যেসব ছবির পরিচালক, সে ক্ষেত্রে তিনি এ চলচ্চিত্রগুলোর কপিরাইট পাবেন না। শুধু যে চলচ্চিত্রগুলো তিনি প্রযোজনা করেছেন , সেগুলোতেই তাঁর কপিরাইট আছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারীরা কপিরাইটের দাবি করতে পারবেন। কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হয়তো রয়ে গেছে তাঁর। এ ক্ষেত্রে যেদিন তিনি রচনা করে গেছেন, সেদিনই তিনি কপিরাইট অর্জন করে গেছেন।

এগুলোও তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারীরা ছাড়া কেউ প্রকাশ করতে পারবেন না। দেয়াল উপন্যাসটির ক্ষেত্রে কিংবা যেকোনো পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

মৃত্যুর ৬০ বছর পর্যন্ত উত্তরাধিকারীরা অধিকার ভোগ করবেন

তানজীব-উল আলম

আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

আমাদের দেশে কপিরাইট অনুযায়ী কোনো লেখক মারা গেলে তাঁর মৃত্যু র তারিখের পরবর্তী ৬০ বছর পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারীরা কপিরাইট অধিকার ভোগ করতে পারবেন। কপিরাইট সাধারণত যিনি লেখক তাঁরই হয়ে থাকে। তবে তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টকর্মের স্বত্বাধিকারী হিসেবে লিখিতভাবে অন্য কাউকে নিয়োগ করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে লিখিতপত্র লেখক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির দ্বারা অবশ্যই স্বাক্ষরিত হতে হবে। লেখক সম্পূর্ণ বা আংশিক কিংবা নির্দিষ্ট কোনো শর্তসাপেক্ষে এ অধিকার হস্তান্তর করতে পারেন।

যেমন লেখক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর অনেক বইয়ের স্বত্ব তাঁর প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদের নামে দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে তিনি যদি সেই সব বইয়ের স্বত্বাধিকারী হিসেবে গুলতেকিন আহমেদকে শুধু নির্দিষ্ট কোনো সংস্করণের জন্য নিয়োগ করে থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি শুধু ওই নির্দিষ্ট কোনো সংস্করণের জন্যই স্বত্বাধিকারী হিসেবে রয়্যালটি পাবেন। অথবা এমনভাবে নিয়োগ করতে পারেন যেখানে যতবার বইটি ছাপা হবে, প্রতিবারই স্বত্বাধিকারী হিসেবে গুলতেকিন আহমেদ রয়্যালটি পাবেন।

এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাকে স্বত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে কী শর্তে দেওয়া হয়েছে। গুলতেকিনের স্বত্বে থাকা বইয়ের দাবি অন্য কেউ করতে পারবে না। নিয়োগকৃত স্বত্বাধিকারীর রয়্যালটি স্বত্বাধিকারের ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করবে এবং লেখক মারা গেলে নিয়োগকৃত স্বত্বাধিকারীও রয়্যালটি পাবেন।

স্বত্বাধিকারী রয়্যালটি সুবিধা পাবেন

মোরশেদ মাহমুদ খান

কপিরাইট আইন গবেষক, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

হুমায়ূন আহমেদ যদি তাঁর গ্রন্থস্বত্বাধিকার হিসেবে কাউকে নিয়োগ করে যান কিংবা গ্রন্থস্বত্ব কারও কাছে বিক্রি করে দেন, তবে তাঁরাই সেই বইয়ের স্বত্বাধিকার হিসেবে তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পর্যন্ত রয়্যালটি-সুবিধা পাবেন। হুমায়ূন আহমেদের যেসব অপ্রকাশিত সাহিত্যকর্ম রয়েছে, সেগুলো তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিসাপেক্ষে প্রকাশ করা যাবে এবং যে তারিখে তা প্রকাশ করা হবে, সেই তারিখ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত যাঁকে স্বত্বাধিকার হিসেবে নিয়োগ করা হবে, তিনি এ রয়্যালটি সুবিধা পাবেন। তবে কেউ যদি হুমায়ূন আহমেদের অপ্রকাশিত সৃষ্টি প্রকাশ করতে চান এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনুমতি প্রদান না করেন, তবে সেই প্রকাশক কপিরাইট বোর্ডের কাছে আবেদন করতে পারবেন।

আজীবন হুমায়ূন আহমেদের কর্ম তাঁর নামেই প্রকাশ করতে হবে

আরিফ জামিল

সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে লেখক মারা যাওয়ার পর ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট অধিকার বলবৎ থাকে এবং ওই সময়ের মধ্যে ওই লেখকের কর্ম তাঁর পরিবারের অনুমতি ব্যতীত কেউ নিজের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রকাশ, পুনরায় উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না। এই সময়ের মধ্যে লেখকের প্রকাশিত কর্ম থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশে ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক লাভ হবে, তা লেখকের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করবেন। যেমন- হুমায়ূন আহমেদের যেসব সৃষ্টকর্মের স্বত্বাধিকারী তাঁর নামে করা আছে, তা থেকে সকল অর্থনৈতিক সুবিধা তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারীরা পাবেন। তবে জেনে নিতে হবে , হুমায়ূন আহমেদ তাঁর স্বত্বাধিকার কারও কাছে হস্তান্তর করেছেন কি না। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর স্বত্বাধিকার প্রকাশক কিংবা তাঁর পছন্দমতো অন্য যেকোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারেন। যদি হস্তান্তর করে

থাকেন, তবে যে শর্তে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে, সে শর্তেই তিনি অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করবেন এবং হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর তিনি ৬০ বছর পর্যন্ত অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করবেন। আজীবন হুমায়ূন আহমেদের কর্ম তাঁর নামেই প্রকাশ করতে হবে এবং কোনোভাবেই তা পরিবর্তন করা যাবে না। তবে মৃত্যুর ৬০ বছর পর হুমায়ূন আহমেদের উত্তরাধিকারীরা কিংবা যে প্রকাশনী থেকে তা প্রকাশ করা হয়েছিল, শুধু সেই প্রকাশকই অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে ন না। যে কেউই ব্যবসায়িক উদ্দেশে নিজ লাভের জন্য নাম ব্যবহার করে লেখা প্রকাশ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদের পরিবার বা তাঁর প্রকাশক কোনো অভিযোগ করতে পারবেন না। আমাদের দেশে যেহেতু যেকোনো প্রকাশনারই কপিরাইটের জন্য নিবন্ধন করা লাগে, তাই ধরে নেওয়া যায় যে হুমায়ূন আহমেদের প্রতিটি বইয়ের কপিরাইট আইনানুসারে নিবন্ধন করা হয়েছে। তাই বইয়ে স্বত্বাধিকারী হিসেবে যাঁর নাম লেখা আছে , আইন অনুযায়ী তিনিই রয়্যালটি ভোগ করবেন।

আদালতে প্রতিকার চাইতে পারেন উত্তরাধিকারীরা

আহসান কবির

কপিরাইট আইনের শিক্ষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হুমায়ূন আহমেদ যেসব কর্মের স্বত্বাধিকারী হিসেবে তাঁর প্রথম স্ত্রী গুলতেকিন কিংবা শাওনকে নিয়োগ করেছেন, সেসব কর্মের স্বত্বাধিকার হিসেবে তাঁরাই রয়্যালটি সুবিধা ভোগ করবেন। কেননা , আইন অনুসারে লেখক তাঁর কর্মের স্বত্বাধিকারী অন্য কারও কাছে দলি লের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের নাম রয়েছে, সেসব তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীরা পাবে।

তবে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিসাপেক্ষে সেগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। যদি কেউ কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে, তবে সে অবশ্যই আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে।

কপিরাইট কেউ ভঙ্গ করলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে কপিরাইট আইন অনুযায়ী প্রতিকার চাইতে পারে লেখকের উত্তরাধিকারীরা। তবে ৬০ বছর পর হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকর্মের কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বত্বাধিকারী থাকবে না। তখন তাঁর সাহিত্যকর্মগুলো পাবলিক খাতে চলে যাবে এবং যে কেউ তখন যেকোনো উদ্দেশ্যে (যেমন–প্রকাশনা বা অনুবাদ) সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে।

হুমায়ূনের কবরে বাবার কবরের মাটি

ছেলের কবরে বাবার কবরের মাটি ছড়িয়ে দিলেন মা। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মা আয়েশা ফয়েজ গতকাল শনিবার গাজীপুরের পি রুজালী গ্রামের নুহাশপল্লীতে ছেলের কবর জিয়ারত করেন।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে হুমায়ূন আহমেদের মা আয়েশা ফয়েজ, ছোট ভাই আহসান হাবীব, বোন সুফিয়া হায়দার, ভগ্নিপতি আপেল হায়দার, ছোট বোন রোকসানা আহমেদ, খালা রিজিয়া খানমসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নুহাশপল্লীতে আসেন। কবরের পা শে গিয়ে মা আয়েশা ফয়েজ কবরের মাটিতে বার বার হাত বুলাতে থাকেন। তিনি ছেলের আত্মার শান্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানিয়ে প্রার্থনা করেন, 'আল্লাহ হুমায়ূনকে দুনিয়াতে যেমন সমঞ্চান দিয়েছ, আখেরাতেও সে ধরনের সমঞ্চান দিয়ো।' তিনি কিছু সময় কবরের পাশে থেকে কোরআন তেলাওয়াত করেন। পরে সবাই হুমায়ূনের কবরে ফাতেহা পাঠ করেন এবং আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করেন।

এরপর হুমায়ূনের মা ও ভাইবোনেরা পিরোজপুর কবরস্থান থেকে আনা হুমায়ূনের বাবা ফয়জুর রহমানের কবরের মাটি তাঁর কবরে ছড়িয়ে দেন। হুমায়ূনের বাবা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শহী দ হন। কবর জিয়ারত শেষে আয়েশা ফয়েজ তাঁর ছেলের আত্মার শান্তির জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

পরে হুমায়ূন আহমেদের মা নুহাশপল্লীর প্রধান ফটকের পাশে 'মা ও শিশু' ভাস্কর্যের পশ্চিমে একটি বিরল প্রজাতির তালিপামগাছের চারা রোপণ করেন। হুমায়ূন আহমেদের দাফনের পর তাঁর মা এই প্রথম নুহাশপল্লীতে এলেন।

হুমায়ূন আহমেদের ছোট ভাই আহসান হাবীব এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, 'নুহাশপল্লী নুহাশপল্লীর মতোই থাকবে। শান্তি নিকেতনের মতোই হতে হবে এমন নয়।' হুমায়ূন আহমেদকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এটা একটা খুব বাজে বিষয়, এটা হওয়া উচিত নয়।' কবর জিয়ারতের পর তাঁরা বাগানবাড়িটি ঘুরে দেখেন ও কর্মচারীদের খোঁজখবর নেন। বেলা সোয়া তিনটার দিকে দ্বিতীয়বার কবর জিয়ারত শেষে তাঁরা ঢাকার পথে রওনা হন।

বইয়ের বাজারের নামকরণের দাবি

যেখানে সব সৃজনশীল বই পাওয়া যা বে–এমন একটি বইয়ের বাজারের নামকরণ সদ্যপ্রয়াত জননন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের নামে করার দাবি জানিয়েছে বই প্রকাশক ও বিপণন সমবায় সমিতি। গতকাল শনিবার শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের বিএফসি মিলনায়তনে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ স্মরণসভায় বক্তারা এ দাবি করেন। বই প্রকাশক ও বিপণন সমবায় সমিতি এই স্মরণসভার আয়োজন করে। বক্তারা বলেন, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়

বা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে এবং দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে নির্দিষ্ট সৃজনশীল বইয়ের মার্কেট স্থাপন করতে হবে। হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর পরিবার নিয়ে অসংলগ্ন ও কুরুচিপূর্ণ বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান বক্তারা। তাঁরা আরও বলেন, এতে করে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিব্রত হচ্ছেন এমনকি তাঁদের বিকশিত হওয়ার পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কবি বেলাল চৌধুরী স্মৃতিচারণা করে বলেন, 'হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন নিপাট সাধু একজন মানুষ। তিনি সাধারণ জীবনযাপনের বাইরে অসাধারণ আনন্দ খুঁজতেন নুহাশপল্লীতে গিয়ে। নিজ হাতে সাজিয়েছেন ঔষধিপল্লী।' তিনি আরও বলেন, 'হুমায়ূনের প্রতিটি লেখায় একটা নির্দিষ্ট ছকে চরিত্রগুলো আসে, বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা পাওয়া যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ১৪ বছর হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে, ভাবিনি এমন দিন আসবে তাঁকে নিয়ে স্মরণসভায় আসতে হবে।' তিনি হুমায়ূন আহমেদের অসাধারণ কর্মজীবনের নানা স্মৃতিচারণা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্মৃতিচারণা করেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন, লেখক হারিসুল হক, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, অন্য প্রকাশের প্রচ্ছদ শিল্পী মাসুম রহমান, রবীন আহসান প্রমুখ।

বিতর্কিত কিছু না করার আহ্বান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, হুমায়ূন আহমেদ কোনো দল বা ব্যক্তির সম্পদ নন। তিনি দেশের সম্পদ। তাই তাঁকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় –এমন কিছু না করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে জাতীয়তাবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) আয়োজিত অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরু ল এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি একটি মামলা হয়েছে বলে জানি। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা দরকার। তাঁকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা ঠিক নয়।'

জাসাসের সভাপতি আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন কবি আবু সালেহ, গাজী মাজহারুল ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখ।

তাঁকে শান্তিতে ঘুমাতে দিই
শাকুর মজিদ

শান্তিপ্রিয় মানুষটি মরে গিয়েও আর শান্তি পাচ্ছেন না। ১৬ হাজার মাইল থেকে উড়ে এসেও খুব সহজে ঠাঁই পাননি মাটির আশ্রয়ে। এত টানাহেঁচড়ার পর সব যখন শান্ত হবে, সবাই যখন বলতে শুরু করবে

‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ/ তাই তব জীবনের রথ/ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার, বারংবার’–তখন শুরু হলো নতুন নাটক।

প্রথমে এক ঘণ্টার, তারপর দীর্ঘ ধারাবাহিক, এখন শুরু হয়েছে ডেইলি সোপ। প্রতিদিনের নাটক। নতুন নতুন নাটকের কাহিনি তৈরি হচ্ছে আর উদ্ধার করা হচ্ছে নতুন করে তাঁর মৃত্যুরহস্য। কথা উঠছে, তাঁর একান্ত স্বজনেরাই নাকি তাঁকে অবহেলায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শুধু তা -ই নয়, অত্যন্ত ব্যয়বহুল হাসপাতাল থেকে সাশ্রয়ী হাসপাতালে লেখক সুস্থ অবস্থায় স্বেচ্ছায় কেন স্থানান্তরিত হলেন , সেটা নিয়েও এসব মায়াকান্নাকারীর বিলাপের শেষ নেই। অথচ অন্তর্বর্তীকালীন চিকিৎসা-ছুটিতে লেখক যখন দেশে আসেন, তখন তো নিজের মুখেই হাসপাতাল স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকে যথাযথ সিদ্ধান্ত বলেই বহুবার তাঁর বন্ধুমহলে বলেছিলেন।

স্লোয়ান-ক্যাটারিং মেমোরিয়াল নামের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এই ক্যানসার হাসপাতালে এই লেখককে যদি সম্পূর্ণ চিকিৎসা নিতে হতো, তাহলে পুরো সময়ের জন্য এর বিল আসত বাংলাদেশি টাকায় ২০ থেকে ৩০ কোটি। এ তথ্য জানা গেছে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের কাছ থেকে, সেখানে বাংলাদেশের একজন লেখকের পক্ষে তাঁর সমূহ সঞ্চয় খরচ করেও এর চিকিৎসা ব্যয় মেটানো সম্ভব হতো না। আর যেহেতু তিনি মানুষের কাছে হাত পাতার মতো কেউ ছিলেন না, এমনকি সরকারি সাহায্যও ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে যদি হাসপাতালের কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় তিনি সাশ্রয়ী চিকিৎসাসেবা নিয়েও থাকেন, সে জন্য কেন তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে? ছোটখাটো রাগ-অভিমান-অনুযোগ নিয়ে কেউ কেউ বিষোদ্গার করেছেন ফেসবুক-ব্লগে। প্রিয় মানুষের হারিয়ে যাওয়ার এই শোক ভুলতে গিয়ে একে অন্যকে দোষারোপও হয়তো করেছেন, কিন্তু তাঁর একান্ত প্রিয়জনেরা ‘ষড়যন্ত্র করে’ তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে এবং এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে–এমন কেন?

একজন লেখক, তিনি যতটা না তাঁর পরিবারের, তার চেয়ে বেশি পাঠকের। কিন্তু আমরা কয়েক দিন ধরে এই লেখককে একটি পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে ফেলে সেই লেখকের মহান সত্তাকে অনেক বেশি খেলনা বানিয়ে ফেলছি। আমরা আর কত ফেলনা হতে দেব এই মহান লেখককে?

এই ডিজিটাল বিশ্বপাড়ায় নাগরিকেরা এখন কেউ কারও চেয়ে কোনো দূরত্বেই অবস্থান করেন না। সামান্য আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে কেউ হয়তো নিজের অজান্তেই এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে থাকেন , সেটা কী পরিমাণ ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে, তা হয়তো চিন্তাও করেন না।

প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মৃত্যুচিন্তার কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক উপন্যাসের শুরুতে 'আলেকজান্ডার পোপ'-এর কয়েক ছত্র ব্যবহার করেছিলেন। লাইনগুলো ছিল এমন–

'When I am dead, dearest

Sing no song for me,

Plant thou no roses at my head

Nor shady cypress tree.'

বোঝাই যাচ্ছে, খুব নীরবে, নিভৃতে, একান্তে শুয়ে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর শেষের দিকে আত্মজৈবনিক গ্রন্থ কাঠপেন্সিল–এও 'অসুখ' নামক একটা অধ্যায়েও তাঁর এই চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। (পৃষ্ঠা-৭৫)

'...আমার উচিত, কাগজ-কলম নিয়ে এপিটাফ লিখে ফেলা। কল্পনায় দেখছি, নুহাশপল্লীর সবুজের মধ্যে ধবধবে শ্বেতপাথরের কবর। তার গায়ে লেখা–

'চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে

নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।'

আসুন, লোকটিকে আমরা শান্তিতে ঘুমাতে দিই ।

 শাকুর মজিদ: স্থপতি ও লেখক।

মহান ফিহা
আহসান হাবীব

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ কখনো আমার বই পড়েনি বলেই আমার ধারণা। কারণ, আমার লেখা নিয়ে তাকে কখনো কোনো মন্তব্য করতে শুনিনি। আমিও আমার কোনো বই তাকে কখনো পড়তে দিইনি, মেজো ভাই জাফর ইকবালকেও না। কারণ, আমার একটু লজ্জাই লাগত। ছোট ভাই বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও একটু বেশিই হতো। মেলায় বেশি বই বেরোলে বলত , 'শাহীন তো দেখছি বইয়ের ফ্যাক্টরি হয়ে উঠছে...' এই ধরনের (আমার বাসার নাম শাহীন)। তো সেই বড় ভাই হঠাৎ একদিন আমাকে ফোন করল।

–এই শাহীন?

–বল।

তোর লেখা সমরেশ মজুমদার খুব পছন্দ করেছে...আচ্ছা রাখি। বলে ফোন রেখে দিল।

তার তরফ থেকে লেখালেখি নিয়ে সেই একবার মাত্র প্রশংসাবাক্য। তা-ও আরেকজনের মন্তব্য তার মুখে। তবে যেবার আমি কিউবার হাভানা কনটেস্টে কার্টুনে পুরস্কার পেলাম, তখন সে আমার পল্লবীর বাসায় এসে নগদ কিছু টাকা দিল খুশি হয়ে। আমার লেখালেখি আর কার্টুনে ওই দুইবার তার প্রতিক্রিয়া...একবার ক্যাশ, একবার কাউন্ট! আমার সেই ভাইটা আর নেই।

তার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরটা যখন পেলাম...সে বেশ চাঁছাছোলাভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে ফোনে বলল–শোন, লুকোছাপার কিছু নেই, ক্যানসার ধরা পড়েছে, দ্রুত ছড়াচ্ছে। আম্মাকে বল এখনি বল...আর ভাইবোনদের বল দোয়া করতে...আচ্ছা রাখি।

আমি মাকে বললাম। মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তার মৃত্যুসংবাদটাও আমি মাকে দিলাম...এই কঠিন কাজটাও আমাকেই করতে হয়েছে।

১৯ জুলাই। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম কার্টুনিস্ট কাজী আবুল কাসেমের (দোপেঁয়াজা) মৃত্যুবার্ষিকী ছিল, তাঁকে স্মরণ করে একটা লেখা লিখেছিলাম বণিক বার্তায়, রাতে বাড়ি ফিরে সেটাই পড়ছিলাম (কে জানত তারও মৃত্যু ওই ১৯ জুলাই হবে)। এ সময় আমেরিকা থেকে মেজো ভাবি (ইয়াসমিন হক) ফোন করলেন। তিনি খুবই শক্ত ধাতের মানুষ। তখন রাত এগারোটা বিশের মতো বাজে...তিনি ফোনে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–শাহীন, আমরা দাদাভাইকে ধরে রাখতে পারছি না...তিনি চলে যাচ্ছেন...তাঁর সবকিছু একে একে ফেইল করছে...তাঁর প্রেশার এখন ৪০..., শাহীন, এখন ৩০..., শাহীন এখন ২০..., শাহীন এখন ১০... ... ... শাহীন, দাদাভাই নেই। ওপাশে তার আর্তনাদ শুনলাম। ফোন কেটে গেল। আমি তার পরও ফোন কানে ধরে রইলাম, নিঃশব্দ ফোন। বোনেরা ছুটে এসে ঘিরে ধরল।

–কী রে? কী হলো??

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'দাদাভাই মারা গেছে...' কী অসম্ভব একটা বাক্য। মনে আছে, ঠিক ৪০ বছর আগে আমার মেজো ভাই জাফর ইকবাল আম্মাকে বলেছিল, 'আম্মা, আব্বাকে মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছে...!'

ঠিক সেই রকম আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আম্মা, দাদাভাই মারা গেছে...'

বহু বছর পর...প্রায় ৪০ বছর পরই বলব আমাদের পুরো পরিবার একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল...আহ্, কী কষ্ট!

...তার পরের ঘটনা সবাই জানে। তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ঢাকায় আনা হলো। আপামর জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে প্রথমে শহীদ মিনার, তারপর জাতীয় ঈদগাহে জানাজা...সবশেষে নুহাশপল্লীতে দাফন।

মাঝখানে তাকে আমরা পরিবারের সদস্যরা দেখতে গেলাম বারডেমের হিমঘরে। কী আশ্চর্য একটা জায়গা! ঝকঝকে পরিষ্কার। স্টেইনলেস স্টিলের একটা বিশাল ফ্রিজ। সশব্দে একটা ট্রে টেনে বের করা হলো। সাদা কাফনে জড়ানো হুমায়ূন আহমেদ। ঠান্ডার একটা ধোঁয়াটে ভাপ বেরোল...তার মুখের কাপড় সরানো হলো। নীল একটা মুখ...ক্লিন শেভড ক্লান্ত চোখ দুটো বোজা...ভেজা চুলগুলো এলোমেলো...চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এ যেন তার সেই তোমাদের জন্য ভালোবাসা উপন্যাসের একটা দৃশ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি...মহান ফিহা শুয়ে আছে ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টিলের একটা ট্রেতে নিথর...আহ্! এত কষ্ট ছিল এক জীবনে? আমার মা মহান ফিহার গালে গাল ঠেকিয়ে কেঁদে উঠলেন হু হু করে...আমি স্পর্শ করলাম, তার চুল গাল মুখ...আমার প্রিয় বড় ভাইটা প্রতিবাদহীন শুয়ে রইল...ছোটবেলায় তার মাথায় বিলি কেটে দিলে গল্প শোনাত...আমি বিলি কাটার মতো তার ভেজা চুলে হাত রাখলাম...

নুহাশপল্লীতে তার কবরে আমি নেমেছি। আমার পাশে নুহাশ...আমরা অপেক্ষা কর ছি। তাকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে , এ যেন তার বিখ্যাত উপন্যাস নন্দিত নরকের মন্টুর জন্য অপেক্ষা করা। আমরা তাকেই শুইয়ে দেব মাটিতে, যেখানে সে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকবে একা। ওপরে তাকিয়ে দেখি পুলিশ , র‍্যাব আর বর্ডার গার্ডের একটা জটিল বেষ্টনী, তার ওপর শত শত ক্যামেরা...সবাই অপেক্ষায় তাকে আনা হবে...এখনই আনা হবে। আনা হলো। কফিন থেকে বের করা হলো...ডাক্তার এজাজ কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের দিকটা আমার দিকে তুলে দিয়ে বলল , 'শাহীন ভাই, স্যারকে ধরেন...।' আমরা তাকে ধরে নামালাম গহিন কবরে। হালকা নরম একটা শরীর। শুইয়ে দিলাম তাকে শেষশয্যায়। আমি তখন বসে পড়ে তার পা, হাত সব ধরে ধরে দেখছিলাম। সবই কাফনের কাপড়ে ঢাকা। তার পরও ধরছিলাম তার চেনা হাত-পাগুলো, এখন কত অচেনা! একটা বিষয় খেয়াল করলাম, তার ডান পা-টা হাঁটুর কাছে একটু ভাঁজ করা। মৃত্যুর পর ঠিক এ রকমটাই ছিল আমার বাবারও , ভাইয়ার মুখে শুনেছিলাম। কেন এই মিল?

সে অলৌকিক বিষয়গুলো খুব পছন্দ করত। আর তখনই যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখি , আমার পেছনে কবরের কোনায় দুটো জিনিস পড়ে আছে। একটু আগেও এ দুটো ছিল না। আমি কিছু না ভেবেই জিনিস দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম।

ফেরার পথে গাড়িতে বসে জিনিস দুটো পকেট থেকে বের করলাম। একটা ছোট্ট কার্ড সুতো বাঁধা ট্যাগের মতো, তার ওপরে ইংরেজিতে লেখা আহমেদ হুমায়ূন, নিচে ডাক্তারের নাম, হাসপাতালের নাম, একটা সিরিয়াল নাম্বার আর তারও নিচে ছোট্ট করে লেখা 'এটাচড টু টো'। তার মানে এই ট্যাগটা তার বুড়ো আঙুলে বাঁধা ছিল আর ছিল একটা প্লাস্টি কের ব্যান্ড।

সেটাও নিশ্চয়ই পায়ে রিংয়ের মতো পরানো ছিল। কিন্তু খুলে গেল কীভাবে ? নিউইয়র্কে তাকে ধোয়ানোর সময় খুলে যেতে পারে। কিন্তু কাফনের ভেতরেই থাকার কথা , বাইরে এল কীভাবে? বাইরে এলই যদি, আমার হাতে কেন পড়ল? তবে কি তার শেষ চিহ্নটা আমাকেই দিয়ে গেল আমার প্রিয় বড় ভাইটা?

অনেক আগে থেকেই আমার মানিব্যাগে সব সময় একটু মাটি রাখতাম , শহীদ বাবার কবরের মাটি। আর এখন আছে বড় ভাইয়ের ট্যাগটা। দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়েই ঘুরি...কেন , আমি নিজেই জানি না।

মহান চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস একবার তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন:

–আজ আমি তোমাদের একটা কৌতুক বলব। শিষ্যরা সবাই হতভম্ব। কারণ , চীনা দার্শনিকেরা তখন মনে করতেন হাস্য-কৌতুক এসব মূর্খদের কাজ, জ্ঞানীদের নয়। শিষ্যরা কিছু বলল না। কনফুসিয়াস কৌতুকটি বললেন, সবাই হাসল তাঁর কৌতুক শুনে। কনফুসিয়াস দ্বিতীয়বারও ওই একই কৌতুক বললেন...এবার কেউ হাসল না, তৃতীয়বারও তিনি ওই একই কৌতুক বললেন , এবারও কেউ হাসল না। তখন কনফুসিয়াস বললেন, 'আমরা একটা হাসির ঘটনায় একবারই হাসি। কিন্তু একটা দুঃখের ঘটনায় কেন বারবার কাঁদব?'

হে মহান কনফুসিয়াস...ক্ষমা করবেন...আমাদের পুরো পরিবারকে বারবার কাঁদতে হচ্ছে...একটি দুঃখের ঘটনা আমাদের বারবার চোখের পানি ফেলতে বাধ্য করছে...কে জানে, হয়তো একদিন সময় বদলে দেবে সবকিছু...

যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের–মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা...

(জীবনানন্দের এই লাইনটা বড় ভাই সব সময় ব্যবহার করত...এবার আমি করলাম তার জন্য...)

 আহসান হাবীব: লেখক ও কার্টুনিস্ট।

পাঠকের নিজস্ব হুমায়ূন
আনিসুল হক

হুমায়ূন পড়ে প্রথম কেঁদেছিলাম আমি যখন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন। শহীদ স্মৃতি হলে থাকি। বন্ধু তাজুল আমার উল্টো দিকের রুমে থাকে। ও বলল , হুমায়ূন আহমেদের নির্বাসন পড়ো। তুমি কাঁদতে বাধ্য। আমি বললাম , পড়েছি। কই, কান্না তো আসেনি।

তারপর একদিন, কোনো এক ছুটির সকালে নির্বাসন বইটা হাতে নিলাম আবারও। এক পাতা দুপাতা করে পড়ছি। বুঁদ হয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে বইটা যখন শেষ হয়ে আসছে , আমি হু হু করে কাঁদছি। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম পাশের রুমে। তাজুলকে ডেকে বললাম , তাজুল, তাজুল, আমার চোখের দিকে তাকাও। কী দেখছ! অশ্রু। আমি নির্বাসন পড়ছিলাম।

আমি যে গল্পটা বললাম, বাংলাদেশের অন্তত এক কোটি মানুষ হুমায়ূনকে নিয়ে এ রকম কোনো না কোনো গল্প বলতে পারবেন।

গাড়িতে বসে এবিসি রেডিও শুনছি। হুমায়ূন আহমেদ মারা গেছেন, বেতারবন্ধু ঘুরেফিরে সেই প্রসঙ্গেই কথা বলছেন। একবার তিনি বললেন, 'আমি প্রথম হুমায়ূন পড়ি ক্লাস সেভেনে থাকতে।' আমি ওই বেতারবন্ধুর নাম জানি না, তাঁকে চিনি না। কিন্তু কেন তিনি ভাবছেন যে তিনি কোন ক্লাসে থাকতে প্রথম হুমায়ূন পড়লেন, সেটা জানা তাঁর শ্রোতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ? প্রথম আলো বন্ধুসভার পাতায় ইমাম হাসান লিখেছেন, 'সপ্তম শ্রেণীতে উঠে একটি নতুন বই পাই। বইটির নাম শঙ্খনীল কারাগার। ' এই ইমাম হাসানও খুব বিখ্যাত কেউ নন , কিন্তু তিনিও কেন এই তথ্যটা জানানো প্রয়োজন বলে বোধ করলেন।

বোধ হয়, একজন লেখক তাঁর পাঠকের অভিজ্ঞতার অংশ, তার পরিবারের একজন হয়ে ওঠেন। একটা বই তার ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় , তার বইয়ের র‍্যাকে থাকে, বিছানায় বালিশের পাশে স্থান পায়, আর কখন, কীভাবে, জীবনের কোন সময়টা ওই বইটা (বা ওই চলচ্চিত্রটা) তাকে গ্রস্ত করে রেখেছিল, সেটা তার, ওই পাঠকের আত্মজীবনীরই অংশ হয়ে যায়।

হুমায়ূন আহমেদ যেহেতু বেশি পাঠকের প্রিয় , বেশি মানুষের ঘরে ঠাঁই পেয়েছেন, সেহেতু বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রত্যেকে হুমায়ূন আহমেদকে তাঁর আপনজন বলে মনে করেন , তাঁর চলে যাওয়াটাকে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে মনে করছেন–মনে করছেন, এটা তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্যেরই চলে যাওয়া। কিংবা হয়তো তারও বেশি। লেখক তাঁকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন, বিনোদন জুগিয়েছেন–শুধু তা-ই নয়, তাঁর মন, তাঁর ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন। ফলে হুমায়ূনের চলে যাওয়া তাঁর নিজের অস্তিত্বের একটা অংশের চলে যাওয়া। তিনি নিজের ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছেন।

আমার ভাস্তি হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর খবর পেয়ে অনে ক কান্নাকাটি করেছে। ভাবি আমাকে এই খবর দিচ্ছেন। তখন আমার ভাই বললেন, 'মেয়ের কথা কী বলব, আমার নিজেরই তো অবস্থা খারাপ, রাতের

বেলা ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় উঠে বসে থাকলাম , কী যে একটা হাহাকারের মতো লাগছে, হুমায়ূন আহমেদ আর নেই।'

আসলে প্রত্যেকেরই আছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে নিজস্ব গল্প, অনেক গল্প। কে কবে কখন প্রথম হুমায়ূন পড়লেন, কোন বইটা তাঁকে কাঁদাল, কোন বইটা খুব হাসিয়েছে, কোন বইটা ঘোরগ্রস্ত করেছে। আর আছে তাঁর টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র, গান।

অন্য সব পাঠকের মতো, দর্শকের মতো আমারও আছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি। না, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া না-হওয়ার কথা বলছি না। বলছি একজন পাঠক বা দর্শক হিসেবে হুমায়ূনকে কখন পেলাম, কীভাবে পেলাম, সেসব কথা।

আমরা বড় হয়েছি হুমায়ূনের কালে। হুমায়ূনের নন্দিত নরকে বের হয় ১৯৭২ সালে, তখন আমি পড়ি ক্লাস টুয়ে। আমি যখন বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে , তখন এইসব দিনরাত্রি দেখানো হচ্ছে টেলিভিশনে। হুমায়ূন আহমেদ তাই আমাদের প্রজন্মের বেড়ে ওঠার অংশ। আমি সব সময়ই মনে মনে হুমায়ূন আহমেদকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে এসেছি যে তিনি আমাদের বেড়ে ওঠার কালটাকে আনন্দপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

রংপুর শহরে কেটেছে আমার ছোটবেলা। খুব বেশি বই তো তখন ওই শহরে পাওয়া যেত না। সত্যি কথা বলতে কি; নিমাই, ফাল্গুনি, নীহাররঞ্জনের বটতলার পাইরেটেড সংস্করণ ছাড়া বাজারে কোনো বই-ই ছিল না। সেই কালে বেরোতে লাগল ঈদসংখ্যাগুলো। ঈদসংখ্যা উল্টিয়ে দুটো জিনিস আছে কি না খুঁজতাম – সৈয়দ শামসুল হক এবং হুমায়ূন আহমেদ। তখন এবং এখনো ঈদসংখ্যা হাতে পাওয়ার পরে সবার আগে পড়ি ওই হুমায়ূন আহমেদই।

তারপর শুরু হলো টেলিভিশনে হুমায়ূন আহমেদের নাটক। ইশ্, যে রাতে হুমায়ূনের নাটক হতো, সেই রাতটাকে মনে হতো একটা উৎসবের রাত। কী যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হতো সেসব নাটক দেখে, দেখার সময়ে, দেখার পরে। হুমায়ুন ফরীদি যে বুড়োর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন , তাঁকে বাচ্চা মেয়েটা বলল, আপনার যাওয়া লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা কী মোচড়টাই না দিয়ে উঠেছিল! তারানা হালিম বললেন, 'না, হাসছি কই, এই রকম একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আমি হাসব', বলেই তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ড্রয়িংরুমে আমরা হেসে উঠলাম খিকখিক করে। সেসব দিন কি এই বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরগুলোয় আর কোনো দিনও আসবে? সাদাকালো টেলিভিশন ড্রয়িংরুমে। টিউবলাইটের মতো আলো জানালা দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে রাতের অন্ধকার চিরে। তাই দেখে দু-চারজন পথচারীও টেলিভিশন দেখার জন্য সেই জানালায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে টেলিভিশনের সামনে তিন সারি দর্শক। প্রথম ভাগে, মেঝেতে গৃহপরিচারক বা পরিচারিকারা। তারপর টুল নিয়ে একটু অল্প বয়সীরা।

শেষে চেয়ারে, সোফায় মুরব্বিরা। খাটে কলেজে পড়া সদস্যরা। এর মধ্যে চশমা চোখে দাদি -নানি গোছের কেউ আছেন। কী হচ্ছে? না, হুমায়ূন আহমেদের নাটক হচ্ছে। ঈদের রাতগুলোয় হুমায়ূন আহমেদের নাটক আমরা যেন দেখতাম না, রীতিমতো গিলতাম। হুমায়ুন ফরীদি গৃহশিক্ষক , তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে একটা ঘরে, তাঁর বাথরুম পেয়েছে...

নাটক হচ্ছে, এই সময় দোরঘণ্টি বেজে উঠল। কে এই ব্যাকুল মেহমান, হুমায়ূনের নাটকের সময় বাসায় আসে? আমাদের রংপুরের ঢেউটিনে ছাওয়া বাসায় আসতেন বারী ভাই , মোহাম্মদ বারী–এখন থিয়েটার আর্টের প্রধান সংগঠক, নাট্যজন। পরে তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, বারী, তুমি হয় আগে আসবে, না-হয় পরে আসবে; নাটক চলাকালে প্রবেশ নিষেধ।

ঈদে মাঝেমধ্যে অন্য নাট্যকারের নাটকও হতো। সেসবে আমাদের আশ মিটত না। আমার বড় ভাই বললেন, সরকারের উচিত আইন পাস করা, যত দিন হুমায়ূন আহমেদ থাকবেন, তত দিন হুমায়ূন আহমেদের নাটক ছাড়া আর কারও নাটক ঈদে টেলিভিশনে প্রচার করা যাবে না।

কোথাও কেউ নেই যখন বিটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে, তখনকার একটা রাতের কথা

মনে আছে। আমি, আদিত্য কবির আর আমিনুর রশীদ বাইরে বাইরে ঘুরছি। হঠাৎ মনে হলো , কোথাও কেউ নেই প্রচার করা হবে একটু পরে। আশপাশে কার বাসা আছে ? জ ই মামুনের। আমরা ছুটতে শুরু করলাম। কী যে প্রাণপণ সেই ছোটা। যেন একটু পরে কারফিউ হবে , তাই কারফিউয়ের আগেই একটা নিরাপদ স্থানে ঢুকে পড়তে হবে। আর যা-ই করি না কেন, কোথাও কেউ নেইয়ের কোনো পর্ব মিস করা যাবে না।

হুমায়ূনের বই পড়ে নিশ্চয়ই অনেকবার আপন মনে হেসে উঠেছি। একটা দিনের কথা মনে আছে। বই পড়তে পড়তে খিকখিক করে হেসে উঠেছি। ঘটনাটা এই রকম: বাড়ির কর্তা চা খাবেন। চায়ের ওপরে দুধের সর ভাসুক, এটা তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু দেখা গেল, চায়ের ওপরে ঠিকই সর ভাসছে। তিনি পরিচারিকাকে বললেন, একটা চামচ আনো, এই সর তুলে ফেলতে হবে। পরিচারিকা একটা ভাত তোলা বিশাল চামচ নিয়ে হাজির। তিনি বললেন, আমি এই চামচ দিয়ে কী করব? পরিচারিকা বলল, চামচের উল্টা দিক দিয়া তুলেন। আমি বই পড়া বন্ধ করে একা একা খিলখিল করে হাসতে লাগলাম।

আমার উচ্চতাভীতি আছে। দেশের ভেতরে বিমান যখন আকাশে ওঠে, তখন আমি খুব ভয় পাই। একদিন বিমানে আমার সঙ্গে ছিল হুমায়ূন আহমেদের একটা বই। যেই না হাতে নিয়েছি, অমনি ডুবে গেছি তার ভেতরে। কখন যে বিমান আকাশে উড়েছে টেরই পাইনি। হয়তো ভেঙে পড়লেও টের পেতাম না। এই

গুণটাকে আমরা কী বলব, যে একজন লেখকের বই যে কোনোখানে বসে পড়তে আরম্ভ করলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভেতরে নিমজ্জিত হওয়া যায়!

আগুনের পরশমণির শেষ দৃশ্য দেখে কার না চোখে জল আসবে। ওই সিনেমার উদ্বোধনী প্রদর্শনী দেখে এসে ভোরের কাগজ সম্পাদক মতিউর রহমান আমাদের বললেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চেতনা চিৎকার করে আমরা যতটা না করতে পেরেছি, হুমায়ূনের এক সিনেমা তার চেয়ে বেশি কাজে লাগবে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বই দিয়ে, সিনেমা দিয়ে অনেকবার কাঁদিয়েছেন। সর্বশেষ কাঁদালেন দুদিন আগে। ইউটিউবে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের ভিডিও কেউ আপলোড করেছে। একটা টিভি চ্যানেল সেটা দেখাচ্ছে। নিউইয়র্কের কোনো বাড়িতে বসেছে একটা ঘরোয়া আসর। টেবিলে বসে শাওন গান গাইছেন। মরিলে কান্দিস না আমার দায় ও জাদুধন। হুমায়ূন আহমেদ মেঝেতে বসে আছেন। বোঝাই যাচ্ছে, ক্যানসারের চিকিৎসা নিতে নিউইয়র্ক যাওয়ার পরের সময় এটা। শাওন খুব দরদ দিয়ে গানটা গাইছেন। হুমায়ূন আহমেদের চোখে জল এল। তিনি চোখ মুছতে লাগলেন ।

এই দৃশ্য দেখে আমার দুচোখ আপনা-আপনিই ভিজে গেল। আমাদের বেড়ে ওঠার সময়টাকে যিনি আনন্দপূর্ণ করে রেখেছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিলাম। সেটা জা নানো হয়নি। কিছু কথা তো হয়েছে আমার তাঁর সঙ্গে। এই কথাটা কেন বললাম না? এর আগেই তিনি মরে গেলেন। এখন যদি বলি, হুমায়ূন আহমেদ কি তা শুনতে পাবেন? স্যার, আপনার বই পড়ে, আপনার নাটক দেখে আমরা বড় হয়েছি। আমাদের মন, আমাদের চেতনা, আমাদের গদ্য গড়ে উঠেছে আপনার প্রভাবে। আমাদের নিম্নবিত্ত টানাটানির শৈশব-কৈশোর কিন্তু খুবই আনন্দপূর্ণ ছিল। সেই আনন্দের একটা বড় অংশ আপনার অবদানে ঋদ্ধ। আপনাকে ধন্যবাদ। হুমায়ূন স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?

হুমায়ূন আহমেদের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার
কিছু অলৌকিক ঘটনার বয়ান
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলীম আজিজ ও তৈমুর রেজা

সুদীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি আর দশটি সাক্ষাৎকারের মতো নয়। এটা এক ঘরোয়া আলাপচারিতা। এখানে লেখক হুমায়ূন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেশকাল, রাজনীতি, ইতিহাস মানব-মানবীর সম্পর্কসহ অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। ২২ মে ২০১১ সালে নেওয়া সাক্ষাৎকারটির প্রেম ও সৃষ্টিরহস্য-বিষয়ক আলাপচারিতার কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য।

প্রশ্ন: আপনার উপন্যাস বাদশানামদারে পরাজিতের লেখা কোনো ইতিহাস উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়নি?

হুমায়ূন: হবে কী করে? ইতিহাস কে লেখে জানো? যারা জয়লাভ করে, ইতিহাস সব সময় তারাই লিখে। বিজয়ের ইতিহাস লেখে। পরাজিতরা কখনো ইতিহাস লিখতে পারে না। পরাজিতরা কখনো ইতিহাস লেখার সুযোগ পায় নাই। এ সময়েই দেখো না , হিটলারের পক্ষে কোনো ইতিহাস লিখতে পেরেছে কেউ?

প্রশ্ন: বাংলা অঞ্চলের কোনো বীরকে নিয়ে কি আপনার কিছু লেখার ইচ্ছে আছে ? উদাহরণ হিসেবে তিতুমীরের কথা বলা যায়। এঁদের নিয়ে তো কোনো লেখা হয়নি বললেই চলে।

হুমায়ূন: আমাদের কিশোরগঞ্জেই তো আছে। বীরাঙ্গনা সখিনা। 'আউলায়ে খুলল কন্যা পিন্ধনের বেশ।' আমার লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এগুলো খুবই আঞ্চলিক। বীরাঙ্গনা সখিনা , তিতুমীর বা ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ।

প্রশ্ন: লাতিন আমেরিকার মতো ভাবা যায়? লাতিন আমেরিকার লেখকেরা একটা চরিত্র খাড়া করে প্রতীকী উপস্থাপনের দিকে চলে যান। মানে, সরাসরি কথাটা না বলে, রূপকের মধ্য দিয়ে বলা। যেমন, মার্কেস লিখেছেন অটাম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক। মানে, ওই সময়টাকে ঠিকই ধরেছেন উনি। কিন্তু চরিত্রগুলো তাঁর মতো করে বদলে নিচ্ছেন। আপনার হাত দিয়ে এ ধরনের একটা কাজ কি হতে পারত না?

হুমায়ূন: হ্যাঁ, নানাভাবেই ভাবা যায়। কিন্তু এতে যথার্থতার একটা সমস্যা থেকে যায়। যিনি যখনই কিছু বলছেন বা লিখছেন, তাঁর রাজনৈতিক পছন্দের বাইরে সাধারণত যেতে পারেন না। মার্কেসও পারেননি।

প্রশ্ন: আপনার রাজনীতির ব্যাপারে অনাগ্রহ, রাজনৈতিক লেখালেখিতে খুব সরব না , এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

হুমায়ূন: আসলে, আমার দেখা প্রথম মানুষ তো আমার বাবা। উনি ইত্তেফাক -এর নাম দিছিলেন মিথ্যা-ফাঁক।

প্রশ্ন: আপনার ওপর বাবার যতটা প্রভাব, মুহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর কিন্তু প্রভাব ততটা না।

হুমায়ূন: সে তো বাবাকে কম দিন দেখেছে, এটা একটা কারণ হতে পারে। তবে আমার কাছে মানবিক সম্পর্ক রাজনীতির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। যেমন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নারী পুরুষের ভালোবাসার কথা বলুন। বলুন প্রেম কী ? সংজ্ঞা দিন। আচ্ছা, প্রেম সম্পর্কে তোমাদের সংজ্ঞা কী এই সময়ে? এখনকার তরুণ-তরুণীরা কীভাবে?

প্রশ্ন: সংজ্ঞা আর কী? এটা একধরনের অনুভূতি। মানসিক অবস্থা।

হুমায়ূন: আমার সংজ্ঞাটা শোনো, প্রেম হচ্ছে 'ভেতরে লুকিয়ে থাকা কিছু একটা।' ধরা যাক, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটা মেয়েটার প্রেমে পড়েছে। মেয়েটা যখন সামনে আসবে, তখন ছেলেটার ভেতরে লুকিয়ে থাকা কিছু একটা বের হয়ে আসবে। তখন যেটা হবে , সেটা ইউফোরিয়া। একধরনের আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষাদ, সে কতক্ষণ থাকবে। একটু পরেই তো সে চলে যাবে , তখন কী হবে! তারপর আবার কখন দেখা হবে? এই যে অনিশ্চয়তা, এর মধ্যে কিন্তু দারুণ এক আনন্দ আছে। প্রেমিকার কথা ভাবলে প্রেমিকের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রেমিকা চলে যাবে , সে তো থাকবে না। এই বিষাদ, প্রশ্ন, অনিশ্চয়তা; অর্থাৎ 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।' যখন চলে গেল, ইউফোরিয়া শেষ। গভীর হতাশায় তুমি নি মজ্জিত। আবার যখন আসবে, লুকিয়ে থাকা জিনিসটা তখন আবার বেরিয়ে আসবে। এখন বলো প্রেমের রসায়ন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

প্রশ্ন: শারীরিক কিছু?

হুমায়ূন: এটাকে আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা যায়। তুমি কি একটা কুরূপা , দেখতে ভালো না। অসুন্দর, খাটো মেয়ের প্রেমে পড়বে? উল্টো ভাবেও ভাবা যায়, কুদর্শন পুরুষের প্রেমে কি একটি সুন্দরী মেয়ে পড়বে? আসলে অত্যন্ত রূপবতী কাউকে দেখলেই প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা তোমার বেশি। এর অর্থ হলো, প্রকৃতি চাচ্ছে, তার সন্তান-সন্ততি যেন সুন্দর হয়। এটা প্রকৃতির চাহিদা। প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য এমন একটি প্রজাতি তৈরি করা, যেটি হবে অসম্ভব রূপবান, যেটি হবে অসম্ভব জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন , যেটি হবে বিত্তবান। প্রকৃতি মনে করে এই বিশ্বকে বাসযোগ্য রাখার জন্য , সচল রাখার জন্য এটা জরুরি। নিরন্তর প্রকৃতি তার এই প্রক্রিয়া সচল রেখে চলেছে।

প্রশ্ন: কিন্তু অসুন্দর নারী-পুরুষের জীবনও তো একেবারে প্রেমহীন বলা যাবে না। তাদের প্রেমেও তো কেউ না কেউ পড়ে?

হুমায়ূন: হ্যাঁ, সেটা ঘটে। যৌবনে কুদর্শনও একভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতি তার কথাও যে ভাববে না , এমন না। প্রকৃতি সেটাও ভাবে। অনেক সময় অনেক সুন্দরী মেয়েও অসুন্দর পুরুষের প্রেমে পড়ে। এতেও ভারসাম্য রক্ষা হয়। ওই জুটির ঘরেও সুদর্শন সন্তান -সন্ততির জন্ম হয়। এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু নয়। এভাবেও প্রকৃতি কাজ করে। চারপাশে তাকালে এটা বুঝতেও পার বে। এবং এটার মূলেও আছে কিন্তু ওই একই জিনিস। এটাও প্রেমের রসায়ন। এগুলো আমার কথা না সিরিয়াস গবেষণা করে এগুলো বের করা হয়েছে। এ রহস্য একদিনে উদ্ধার হয়নি।

প্রশ্ন: প্রেমের মতো স্রষ্টা নিয়েও আপনার ভাবনা আছে?

হুমায়ূন: আমি মনে করি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। আমি স্টিফেন হকিংয়ের একটা লেখা পড়লাম। প্রকৃতির মধ্যে কিছু নিদর্শন তো আছেই। তোমাকে একটা যুক্তি দিই , শোনো। এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি। তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়েছ। সেখানে গিয়ে তুমি দেখলে পাহাড় , পর্বত, পাথর। পাথর দেখে তুমি বলবে, বহুকাল থেকে, সেই আদ্যিকাল থেকে পাথরগুলো এভাবেই আছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তুমি দেখতে পেলে একটা নাইকন ক্যামেরা। তুমি সেটা হাতে নেবে। তখন তোমাকে বলতেই হবে , এর একজন স্রষ্টা আছে। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে তুমি এ কথা ভাবতে পারবে না যে শূন্য থেকে এটা আপনা -আপনি এসে হাজির হয়েছে। কারণ, এটা একটা জটিল যন্ত্র। এবার, আরেকটু এগিয়ে গেলে। কোত্থেকে একটা খরগোশ বেরিয়ে এসে তোমার দিকে তাকাল। নাইকন ক্যামেরা কী করে? ছবি তোলে। খরগোশ কী করে? অনেক কাজই করে। খরগোশের একটা কাজ হলো দেখা। এই খরগোশের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জটিল। নাইকন ক্যামেরাটা দেখে তোমার যদি মনে হয় যে এর একটা নির্মাতা থাকা দরকার, তাহলে খরগোশের বেলায় এটা তোমার মনে হবে না কেন? আমার প্রথম যুক্তি যদি গ্রহণ করো, আমার দ্বিতীয় যুক্তিটাও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল এ রকম। অণু -পরমাণুতে ধাক্কাধাক্কির ফলে একটা জটিল অণু র জন্ম হয়েছে। একসময় এটা এত দূর জটিল হয়ে উঠছে , সেটা একেবারে নিজের মতো আরেকটা জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছে। তারপর তৈরি হলো মানুষ। অসম্ভব ধীমান একটি প্রাণী। একটা গোলাপ ফুল দেখে যে মানুষ তারিফ করতে পারে , একটা পরম শৃঙ্খলা ছাড়া শুধু ধাক্কাধাক্কি করে কি এটা সম্ভব হতে পারে? এবং এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে অণু -পরমাণুর ধাক্কাধাক্কির ফলে আমরা গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি ? এই পৃথিবীর সবকিছু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনে চলে। প্রোটন হবে ইলেকট্রনের চেয়ে ১,৮৩৬ গুণ বড়। সমস্ত তত্ত্ব, সংখ্যা ধ্রুব। এই ধ্রুবত্ব কে নির্ধারণ করেছে?

বিজ্ঞান কোনো বিষয় সম্পর্কে হুট করেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। তার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই পদ্ধতি তো শুরু থেকে ছিল না। যেমন–অ্যারিস্টটল বলছিলেন, মানুষের মস্তিষ্কের কাজ হলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা। কথাটা অ্যারিস্টটল বলেছিলেন বলেই আমরা এক হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। এখন বিজ্ঞান অনেক অদ্ভুত কথা বলছে। যেমন–মানুষের শরীরের মধ্যে যে ডিএনএ থাকে, তার মৃত্যু নেই।

তাই আমি মনে করি, আমরা এখনো খুব অল্প বিষয়ই জানতে পেরেছি। একজন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে রসায়ন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব না । জ্ঞানের পরিধি অনেক অনেক বড়। যুগে যুগে যেসব ধর্মপ্রচারক এসেছেন–তাঁরা কিন্তু একটা সামগ্রিক ধারণা রাখতেন জগৎ বিষয়ে। আল্লাহ তাঁদের কাছে সব সময় সরাসরি জ্ঞান দেন নাই। তাঁরা সব সময় যে সরাসরি ওহি পেয়েছেন তা তো না? জিবরাইল কি সব সময় সশরীরে এসে ওহি পৌঁছে দিয়েছেন? না। অনেক সময় শব্দের মাধ্যমে, অনেক সময় আলোর

মাধ্যমেও ওহি পাঠানোর ব্যপারটা ঘটেছে। এ কারণে আমার মনে হয়, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সৃষ্টিকর্তাকে পুরোপুরি কখনো জানা সম্ভব না।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের মতো এটা ধরে নিয়ে কিন্তু আমি চিন্তা করছি না। আমি চিন্তা করছি এমন একটা অস্তিত্ব নিয়ে, যে সর্বব্যাপী। তাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনাশক্তি দিয়ে কল্পনা করতে পারছি না। তিনি আমাদের কল্পনাসীমার বাইরে। অনেক সূরায় নানাভাবে এসেছে এ প্রসঙ্গ। সূরা এখলাসও এ বিষয়েই।

কিন্তু আমি সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চাই। আমার নিজের জীবনে নানা ঘটনা বিভিন্ন সময়ে আমাকে ভাবিয়েছে।

প্রশ্ন: সেটা কেমন?

হুমায়ূন: নুহাশপল্লীতে একটা অংশ আছে যেখানে প্রচুর গাছগাছালি। ওদিকটায় কেউ যায় না , যেহেতু গাছগাছালি ছাড়া কিছু নাই। একবার এক দুপুর বেলা একা একা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছুই ভালো লাগছে না। এ সময় আমার প্রস্রাবের বেগ পেয়ে গেল। এখন ওখান থেকে হেঁটে ফিরে গিয়ে পেশাব করব? এখানে যেহেতু সুবিধাটা আছে...গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পেশাব করছি। অর্ধেকের মতো পেশাব করা হয়েছে , পেশাবের মাঝখানে খুব মিষ্টি একটা গলা , মেয়েদের গলা: এখানে এই কাজ করছেন? আমরা এখানে বেড়াই! আমার যা মনে হলো, যেহেতু মেয়ের গলা, আর পেশাবের মাঝখানে ঘুরে দাঁড়াতেও পারছি না। মনে হলো, প্রায়ইতো নুহাশপল্লীতে লোকজন ঘুরতে আসে –এদেরই কেউ হয়তো। তড়িঘড়ি পেশাব শেষ করে ঘুরে তাকালাম , দেখি কেউ নেই। কেউ না। আমি দৌড়ে বার হয়ে এসে খুঁজলাম , দেখলাম কোথাও কেউ নেই। তারপর আমি ম্যানেজারকে ডাকলাম: অর্ডার দিয়ে দিলাম এখানে কেউ যেন বাথরুম না করে। এবং দ্রুত কাছেই একটা টয়লেট তৈরির করার ব্যবস্থা করতে বলে দিলাম।

প্রশ্ন: এখন এই ঘটনাটার কী ব্যাখ্যা?

হুমায়ূন: না, এভাবে না। এর প্রথম ব্যাখ্যা হলো; ওটা ওই কোনো একটা এনটিটি, যাদের আমরা চোখে দেখি না। ওদের কেউ। এটা একটা ইজি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা বলি: আমার সাবকনসাস লেবেল এই কাজটা পছন্দ করে নাই। সাবকনসাস লেবেল হয়তো চায় নাই আমি এই কাজটা করি, তাই নিজে নিজে একটা এনটিটি তৈরি করে তাকে দিয়ে আমাকে বলিয়েছে। শেষটাই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন: এ রকম ঘটনার মুখোমুখি আপনি আরও হয়েছেন ?

হুমায়ূন: হ্যাঁ, অনেকবার। আরও একটা ঘটনা শোনো। তখন আমি মুহসীন হলে থাকি। আমার বড় মামা , তাঁর পড়াশোনা হলো মেট্রিক। নানা দেখলেন তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাচ্ছে না , তখন উনাকে একটা ফার্মেসি করে দিলেন। গ্রামে যারা ফার্মেসি চালায় তারা কিন্তু প্রত্যেকেই ডাক্তার হয়ে যায়। কোয়াক। মামা

কোয়াক ডাক্তার হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর এমন যশ হলো, ওই হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আশপাশের এমবিএস ডাক্তারদের কাছে কেউ যায় না। মামা রোগী দেখছেন। এতে কখনো রোগী বাঁচছে, কখনো মারা যাচ্ছে। বেশ পয়সা হচ্ছে। তো আমাদের গ্রামের কাছেই একটা জঙ্গল মতো ছিল। একবার জঙ্গলের কাছ দিয়ে রোগী দেখে বাড়ি ফিরছেন মামা। বর্ষাকাল যেতে যেতে মামা এক সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফনা তুলে ফেলল সাপ। ভয়ংকর সাপ। মামা শুধু বলার সুযোগ পেল , আল্লাহ আমাকে বাঁচাও আমি বাকি জীবন তোমার সেবা করব। সাপ ধীরে ধীরে ফনা নামিয়ে নিল। মামা পা তুলল , সাপটা চলে গেল। ফিরে আসার পর, তাঁর ডাক্তারি বিদ্যা শেষ, মামা সারা দিন শুধু আল্লাহকে ডাকেন। আমি বড় মামাকে বললাম, বড় মামা এই যে শুধু আল্লাহকে ডাকেন –এভাবে ডেকে কিছু কি পাইছেন? জবাবে মামা বললেন পাইছি। জিজ্ঞেস করলাম কী পাইছেন? আমি আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে একটা পর্যায়ে নিজেকে দেখতে পাই। দেখি আমি নিজের সামনে বসে আছি। আমি হেসে বললাম, এটা এমন আর কি! আয়না ধরলেই তো আমরা নিজেকে দেখতে পাই। মামা বললেন, এটা সে দেখা না–আমি দেখতে পাই আমি আমার সামনে বসে জিকির করছি। তখন আমার ইচ্ছে হলো এই লাইনে একটু ভেবে দেখা যায়।

প্রশ্ন: মানে আপনিও মামার মত শুরু করলেন?

হুমায়ূন: হ্যাঁ, মামাকে বললাম। মামা বলল, আল্লাহর একটা ডাকনাম তোমাকে শিখিয়ে দিই। এইটাই তুমি সব সময় জপ করবে, শুরুতে অল্প অল্প পারবে পরে দেখবে অভ্যস্ত হয়ে গেছো। কী নাম, নাম আল্লাহু, খুবই সরল। ঢাকায় ফিরে আসলাম। মুহসীন হলে থাকি। শুরুতে কখনো হয় আবার হয় না, প্রায়ই ভুলে থাকি। কিন্তু হঠাৎ করে যদি কোনো মাওলানা দেখি, কোনো দাড়ি-টুপির সৌম্য চেহারার লোক দেখি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আল্লাহু করতে থাকি। এই শুরু হলো। এরপর অভ্যাস হয়ে গেল, তারপর দেখি সারাক্ষণ করছি। এটা কেমন হলো! চাইলেও থামাতে পারছি না। পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যাই। পাবলিক লাইব্রেরিতে তখন খুব ভালো ভালো গল্পের বই ছিল। একদিন বই নিয়ে পড়ছি , পাশের টেবিল থেকে একজন এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, কী, আপনার সমস্যা কী? আমি যে সারাক্ষণই আল্লাহু আল্লাহু করছি, এটা আমি নিজেই আর বুঝতে পারছিলাম না। এটা যে সাউন্ড হিসেবে বাইরে চলে আসছে বুঝতে পারিনি। ক্লাসে গিয়ে এই ভয়ে একেবারে দূরে গিয়ে , একলা বসি। যাতে কেউ শুনতে না পায়। একদিন শিক্ষক এসে বললেন, কী ব্যাপার, তুমি একলা পেছনে বসে আছ কেন? আসো আসো সামনে এসে বসো। তখন আমি কঠিনভাবে চেষ্টা করি যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়। এদিকে রাত্রে স্বপ্ন দেখি একটা বিশাল ঘর, বহু লোকজন বসে আছে এবং প্রত্যেকেই আল্লাহু আল্লাহু করছে। চারদিকে শুধু একটা সাউন্ড হচ্ছে। এক লয়ের সাউন্ড হচ্ছে, চারদিকে। একসময় ঘুম ভেঙে যায় , আমি দেখি নিজেই আল্লাহু আল্লাহু করছি। বিষয়টা এতই কষ্টের হয়েদাঁড়ায়, ভাবি কীভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আমার জীবন শেষ। প্রতি রাত্রেই এই ঘটনা। আল্লাহু আল্লাহু শব্দে ঘুম ভাঙে , দেখি আমি সিজদার ওপরে। ঘুম ভাঙে আবার ঘুম

ধরে, এক রাতে চোখ খুলে দেখি , ঠিক আমার মুখের সামনে এক বিঘত দূরে একটা ফেস। ফেসটা মাথার সামনে চুল নাই, পেছনেও চুল নাই। কঠিন চেহারা, দাঁত নাই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার মনে হলো চোখে চশমা নাই, কী দেখতে কী দেখেছি। চোখে চশমা দেব, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব সময় চশমা হাতের কাছে রাখতাম। চোখে চশমা পরলাম, দেখি আছে। যেন ভেসে আছে মুখটা।

প্রশ্ন: শুধু ফেস না পুরো শরীরধারী?

হুমায়ূন: বলতে পারব না। অনেকে পরে জিজ্ঞেস করেছে ওটার শরীর ছিল কি না। আমি মনে করতে পারি নাই। চোখটা আবার বন্ধ করলাম। ভাবছি দিস ইজ এন্ড অফ মাই লাইফ। আই অ্যাম গোয়িং টু ডাই। সমস্ত শরীর দিয়ে পানির মতো ঘাম ঝরছে। তখন কেন যেন মনে হলো, কেউ যদি এই মুহূর্তে, আশপাশের কোথাও থেকে আজান দেয়, তাহলে জিনিসটা চলে যাবে। কিন্তু কে আজান দেবে। একবার মনে হলো আমি আজান দিই। কিন্তু দেখলাম আমি আজান জানি না। তারপর একমনে শুধু বলছি আজান - আজান। আজান। এভাবে বলতে বলতে ইউনিভার্সিটি মসজিদ থেকে আজান শুরু হয়ে গেল। আজান চলল। তারপর চোখ মেললাম, দেখি চলে গেছে। বহু কষ্টে দরজা খুলে পাশের রুমে গেলাম। পাশের রুমমেট মাওলানা মোহাদ্দেস পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। অজু করে এসেছে। আমি তাকে বললাম, ভাই আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। আপনি কি আপনার নামাজটা আমার ঘরে পড়বেন? উনি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন না, বললেন অবশ্যই অবশ্যই হুমায়ূন। উনি নামাজ পড়লেন। আমি আর ক্লাসে গেলাম না। আমার সমস্ত শরীর ফুলে গেছে , সারাক্ষণ হাতের তালু আর পা চুলকাচ্ছে। বাবাকে খবর দেওয়া হলো। আব্বা নিজে এসে আমাকে হল থেকে নিয়ে গেলেন। এক মাস থাকলাম বগুড়ায়। এক মাস পর একটু সুস্থ হলে আবার হলে ফিরে এলাম। জীবনযাপন আবার শুরু হলো।

প্রশ্ন: কেন এমন হলো মামাকে আর জিজ্ঞেস করেননি?

হুমায়ূন: করেছি। পরে মামার ব্যাখ্যা ছিল আমি ভুল করেছি। এটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে করতে হতো। রং ওয়ে টু ডু। আমি সিরিয়াসলি নিইনি। মামার কথা ঠিক ছিল। যে কারণে আমি বিষয়টার জন্য আসলে নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত ছিলাম।

প্রশ্ন: অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

হুমায়ুন: অনেক মানুষের ভেতরে কঠিন ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ থাকতে পারে। যে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। আমি যদি দূর থেকে তাকে মনে মনে বলি আসসালামুয়ালাইকুম। তাহলে তার টের পাওয়া উচিত এবং সালামের জবাব দেওয়া উচিত। এটা একধরনের খেলা।

প্রশ্ন: আরেকটি ঘটনা?

হুমায়ূন: শোনো, হলো কি? আমি যাকেই দেখি মনে মনে বলি আসসালামুয়ালাইকুম। শীতের রাত শহীদ মিনার চত্বরে চা খেয়ে রওনা দিয়েছি। রোকেয়া হলের সামনে বড় রাস্তাটা ক্রস করতে হবে। আমার সঙ্গে ড. আতিকুর রহমান। এখন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। দুই বন্ধু কথা বলতে বলতে , গল্প করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছি। যথারীতি অভ্যাসবশে প্রবীণ লুঙ্গি পরা খালি গায়ে এক লোক যাচ্ছে , অভ্যাসবশে সালাম দিয়ে বসলাম। আমরা রাস্তা ক্রস করে এপারে এসেছি–ওই লোক দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, এই শুনে যা! আমার বন্ধু আতিক খুব রেগে গেল। এত বড় স্পর্ধা! তুই করে বলছে! আমি থামা লাম তাকে। লোকটা কাছে এগিয়ে এল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল , ওয়ালাইকুম সালাম। এবার যা!

আমি তো স্তম্ভিত। ও মাই গড! এ তো সেই লোক, আমি এদ্দিন যাকে খুঁজছিলাম। এমন ভয় পেলাম আতিককে টানতে টানতে আমি হাঁটা দিলাম। দূরে এসে পেছনে ফিরে দেখি ওই লোক তখনো তাকিয়ে আছে। একদৃষ্টে।

হুমায়ূন, ভাটির পুরুষ ও কিছু মুগ্ধতার গল্প
শাকুর মজিদ

শাহ আবদুল করিম শুধু নয় হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন আরও অনেক বাউল -শিল্পীর সমঝদার

২০০৪ সালের অক্টোবর মাস। সুনামগঞ্জের দিরাই থানার ধলগ্রামে শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে ভাটির পুরুষ নামের একটি প্রামাণ্যচিত্রের চতুর্থ দফার শুটিং করে এসেছি। করিম সাহেব হুমায়ূন আহমেদের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'বড় একটা বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। অনেক লোকজন ছিল, ক্যামেরা ছিল।' করিম সাহেব বেশি কিছু মনে করতে পারেননি , কিন্তু তাঁর ছেলে শাহ নূর জালাল হুমায়ূন আহমেদের ওপর খুব নাখোশ। বললেন, 'বিদায়ের সময় ড্রাইভারকে দিয়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন , তিনি নিজে একবার বাবার সঙ্গে দেখাও করলেন না।'

আমি ঢাকা এসে ঠিক করি, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যে করেই হোক দেখা করে বিষয়টা আমার জেনে নিতে হবে।

গায়ক সেলিম চৌধুরীর কাছ থেকে নম্বর নিয়ে আমি ফোন করি একটা টি অ্যান্ডটি নম্বরে এবং আমার দেখা করার কারণ জানানোর এক ঘণ্টার মধ্যে আমি তাঁর সামনে হাজির হয়ে যাই। ধানমন্ডির 'দখিন হাওয়া'র ছয়তলার একটা ফ্ল্যাটের প্রায় সব কামরাই ফাঁকা। রান্নাঘরের সঙ্গে লাগানো গেস্টরুম থেকে এক তরুণ

বেরিয়ে এলেন। তাঁকে আমি কিছু নাটকে দেখেছি। লন্ড ন থেকে এই ভদ্রলোক চলে এসেছেন মূলত হুমায়ূন আহমেদের সংস্পর্শে থেকে নাটক-সিনেমা বানাবেন, এমন আশায়। তাঁর নাম স্বাধীন খসরু। হুমায়ূন আহমেদ চন্দ্রকথা নামক একটি সিনেমা বানিয়েছেন, সেই ছবিতে তিনি অর্ধেক মূলধন লগ্নি করেছেন , গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। স্বাধী ন খসরুর ব্রিটিশ স্কুল অব অ্যাকটিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু শেষমেশ হুমায়ূন আহমেদকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু হিসেবে। সে কারণে বিলেতের পাট প্রায় চুকিয়েই তিনি ভরসা করেছিলেন হুমায়ূন আহমেদের ওপর। ঢাকায় তাঁর নিজের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে প্রায় নিঃসঙ্গ লোকটি এই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ধানমন্ডির এই বাড়িতেই থাকেন। রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই, পাশের ফ্ল্যাট থেকে খাবার আসে। কখনো নিজেরা চা বানিয়ে খাওয়ান পরস্পরকে এবং তার ভাগ আমিও পেয়ে যাই।

ধানমন্ডি ৩/এ 'দখিন হাওয়া'র ছয়তলার ফ্ল্যাটের যে কামরায় হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার নিতে বসি, সেখানে সে অর্থে কোনো আসবাবপত্রই নেই। একটা তোশকের এক পাশে মহাজনি একটা ডেস্ক। বোঝার বাকি থাকে না, এটা লেখকের লেখার ডেস্ক। তিনি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে বসে লেখেন এই ডেস্কে , লিখতে লিখতে ক্লান্ত হলে শরীর এলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রমাণ সাইজের তোশক আছে পেছনে। তার পেছনে একটা অসমাপ্ত পেইন্টিং। একজন লেখকের একান্ত নিজস্ব এমন আঙিনা আমাকে মুগ্ধ করে।

এই তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটের আরেকটি ঘর দেখে মনে হয় একটা লাইব্রেরি। ছাদ থেকে দেয়াল অবদি টানা বুকশেলফ। মাঝখানের জায়গায় কতগুলো ইজেল দাঁড় করানো। ইজেলে ছবি আঁকা হয়েছে । অয়েল পেইন্টিং। কয়েকটা শেষ পর্যায়ে, কয়েকটা অর্ধেক, কিছু ইজেল সাদা, পেনসিলের দাগ। এলোমেলো পড়ে আছে রং, তুলি, প্যালেট। আমার ক্যামেরা প্যান করে পুরো ঘর। এক জায়গায় এসে স্থির হয় হুমায়ূন আহমেদের ওপর এবং তিনি খালি গা ঢাকার জন্য একটা কুঁচকানো হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে যান আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য।

শুটিং শুরু করব। ক্যামেরা তাক করে আছি। হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'তোমার ক্যামেরাম্যান কোথায়?'

বলি, 'স্যার, আমিই ক্যামেরাম্যান।'

ও, ড্রাইভার কাম কন্ডাকটর! বিদেশে এমন কিছু বাস আছে। সেই বাসগুলোতে যিনি গাড়ি চালান , তিনি টিকিটও চেক করেন। ড্রাইভার কাম কন্ডাকটর। তুমিও তাই দেখছি! ঠিক আছে , চলো শুরু করি। প্রথম প্রশ্ন কি তোমার?

আমি শুরু করি। এবং সেই সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরেই বলছি। শাহ আবদুল করিমের নাম হুমায়ূন আহমেদ শুনেছিলেন ১৯৯৪ সালে, একবার যখন সুনামগঞ্জে গিয়েছিলেন হাসন উৎসবে। তিন দিনের এই উৎসবের

এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বিশেষ অতিথি। ঢাকা থেকে গায়ক সেলিম চৌধুরী আয়োজন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে সেখানে। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক ও কবি হাসান হাফিজ, সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমান, গায়ক মলয় কুমার গাঙ্গুলী আর ফজলুর রহমান তুহীন ছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ সেই উৎসবে হাসন রাজার গানের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু বাউলের গানও শুনতে গিয়ে একসময় একটা গান শোনেন , 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'। গায়ক সেলিম চৌধুরী গানটি গেয়ে শোনালেন। গানটি শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল, যে লোকটি এই গান লিখেছে, সে কে? কোথায় থাকে? বাড়ি কত দূর? সেলিম চৌধুরী জানান, এই লোকের নাম আবদুল করিম, বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই থানার উজান ধল গ্রামে , এবং তিনি এখনো বেঁচে আছেন, বয়স প্রায় ৮০ বছর।

সেলিম চৌধুরীই পরে পরিচয় করিয়ে দেন আবদুল করিমের সঙ্গে। এর বেশ কয়েক মাস পর হুমায়ূ ন আহমেদের ধানমন্ডির বাসায় যথারীতি আগমন ঘটে আবদুল করিমের। হুমায়ূন আহমেদ দেখলেন, লোকটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হলো, এই লোকটার কিছু কথা তিনি রেকর্ড করে রাখবেন।

যথারীতি আয়োজন হলো শুটিংয়ের। হুমায়ূন আহমেদের ধানমন্ডির ১০ নম্বর রোডের বাড়ির লাইব্রেরি রুমেই তাঁকে বসানো হলো। সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ডাকা হলো আরেক প্রবীণ অভিনেতা আবুল খায়েরকে। সেদিন রাতে হুমায়ূন আহমেদের বাসায়ই আবদুল করিম ছিলেন। 'এই গুণী মানুষটিকে আমার সাধ্যমতো সম্মান দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি।' বললেন হুমায়ূন আহমেদ।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্যাকেজ প্রোগামের আওতায় নুহাশ চলচ্চিত্রের ব্যানারে 'জলসা ঘর' নামে একটা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

শাহ আবদুল করিমের গানগুলো নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ যখন 'জলসা ঘর' নামের প্যাকেজ অনুষ্ঠান বিটিভিতে জমা দেন, তখন বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে যান। যে গীতিকারের লেখা গানগুলো নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি, তিনি বিটিভির তালিকাভুক্ত গীতিকার নন। সুতরাং বিটিভি তাঁর গান প্রচার করতে পারবে না। এ সময় বিটিভির জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন বরকতউল্লাহ। তাঁর পরামর্শে শাহ আবদুল করিমকে প্রথমে বিটিভির তালিকাভুক্ত গীতিকার করা হয় এবং অনুষ্ঠানটি প্রচারের অনুমতি পায়।

তবে শাহ আবদুল করিমকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম দেখানো হয় মুস্তাফা জামান আব্বাসীর উপাস্থাপনায় 'ভরা নদীর বাঁকে' নামের এক অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেই আয়োজনটি ছিল ভিন্ন। এবার এই 'জলসা ঘর' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাউল শাহ আবদুল করিম পেলেন তালিকাভুক্ত গীতিকারের মর্যাদা।

সেলিম চৌধুরীর সঙ্গে হাসন উৎসবে সুনামগঞ্জে যাওয়ার ঘটনা হুমায়ূন আহমেদের অন্য একটা চোখকে খুলে দেয়। পরে তাঁর বেশ কিছু নাটকে হাসন রাজা , রাধারমন আর আবদুল করিমের গান সংযুক্ত হয়।

একই ভৌগোলিক এলাকা নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলের বাউলদের গানও বিশাল একটা ভূমিকা রাখে। ভাটি বাংলার মানুষের জীবনচরিত্র নিয়ে শ্রাবণ মেঘের দিন নামের যে চলচ্চিত্রটি বানিয়েছিলেন , তার বেশ কয়েকটি গানও নিয়েছিলেন ভাটি বাংলার বাউল রশিদ উদ্দিন, উকিল মুন্সির কাছ থেকে। শাহ আবদুল করিমও ছিলেন একই বলয়ের বাউল।

শাহ আবদুল করিম একুশে পদক পেয়েছিলেন। এই সংবাদটি শুনে কী মনে হয়েছিল আপনার? প্রশ্ন করি হুমায়ূন আহমেদকে।

হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, ২০০১ সালে শাহ আবদুল করিম যখন এই পুরস্কার পান , তখন মনে হয়েছিল একুশে পদকটি একটি যোগ্য লোকের কাছে গেল। শাহ আবদুল করিম ছাড়াও হুমায়ূন আহমেদ সিলেট অঞ্চলের অনেক বাউল বা গীতিকবির গানের ভক্ত ছিলেন। প্রয়াত গিয়াসউদ্দিন সাহেবের লেখা ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটি তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে তিনি তিনজন শিল্পীকে দিয়ে তিনবারে গানটি রেকর্ড করিয়েছিলেন। শেষমেশ সুবীর নন্দীর কণ্ঠে গাওয়া গানটি তিনি রেখেছিলেন ব্যবহারের জন্য।

শাহ আবদুল করিমের মতো একজন স্বশিক্ষিত লেখাপড়া না জানা গীতিকবির গান সম্পর্কে বলেছেন, ‘এই লোকটি প্রাচীন ও বর্তমান এই দুইয়ের মিশ্রণ। তাঁর গানে সুরের যে ব্যবহার , তা খুবই বৈচিত্র্যময়।’

ভাটির পুরুষ তথ্যচিত্রের জন্য হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার রেকর্ড শেষে আমি বিদায় নেওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়াই। কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল কিছু মুগ্ধ হওয়ার মুহূর্ত।

স্যার খুব ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। তিনি বিদায় না দিয়ে আমাকে এ ঘর -ও ঘর দেখান, আঁকা ছবিগুলো নিয়ে কথা বলেন।

একসময় একটা ড্রয়ার খুলে কতগুলো পাথর বের করেন। মার্বেলের মতোই পাথর , কিন্তু আকার ও আয়তনে বিশাল। আমি এত বিশাল আকারের মার্বেল কখনো দেখিনি। তিনি একটি একটি করে বের করেন। আমাকে হাতের মধ্যে ধরে রাখতে বলেন। কোনোটি আমি এক হাতে ধরি, কোনটি ধরতে দুই হাত ব্যবহার করতে হয়।

আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘বলো তো, একেকটা পাথরের দাম কত?’

আমি বলতে পারি না। আমার কোনো ধারণাই নেই এসব পাথরের মূল্য সম্পর্কে। স্যার আমাকে দাম শোনান। দাম শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। পাঁচ-ছয় হাজার ডলার খরচ করে এ রকম গোলক মানুষ কেন কিনবে, আমি বুঝতে পারি না!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, এত দাম দিয়ে এসব পাথর কেন কিনেছেন?'

তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

আমি মানুষের মুগ্ধতা দেখে আনন্দ পাই। তুমি মুগ্ধ হওনি ?

জি স্যার, হয়েছি।

তোমার মুগ্ধতার কাছে এর মূল্য অনেক কম। মানুষকে মুগ্ধ করা আমার আরেকটা কাজ। আসো , তোমাকে এবার আরেকটা জিনিস দেব, এটা তুমি নিয়ে যাবে।

এবার তিনি ক্যাসেটের শেলফ খুঁজতে শুরু করেন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা ভিএইচএস ক্যাসেট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও, এটা তোমার, নিয়ে যাও।'

আমি তাকিয়ে দেখি, ক্যাসেটের গায়ে আমারই হাতে লেখা একটা নাটকের নাম লন্ডনী কইন্যা।

এবার আমার সত্যি সত্যি মুগ্ধ হওয়ার পালা।

আমি প্রশ্ন করি, 'স্যার, এটা তো ১৯৯৯ সালের, পাঁচ বছর আগের ক্যাসেট। আপনার হাতে এল কী করে? আমি তো আপনাকে দিইনি?'

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দেন না। আমাকে বলেন,

- তুমি মুগ্ধ হওনি?

-জি স্যার, আমি দারুণ মুগ্ধ হয়েছি।

-আমি আনন্দ পেয়েছি তোমার মুগ্ধ হওয়ার দৃশ্য দেখে। এই ক্যাসেটটি আমি অন্যভাবেও তোমার কাছে ফেরত দিতে পারতাম, তাতে আমি আমার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। আজ তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে, যাওয়ার সময় তোমাকে আমি একটা সারপ্রাইজ দেব।

-স্যার, আমি সারপ্রাইজড।

-যাও এবার। ভালো থেকো।

আমি মুগ্ধতার স্মৃতি নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের ঘর থেকে বেরিয়ে যা ই। এরপর বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় না।

মৃদু মানুষের দ্রষ্টা

ফারুক ওয়াসিফ

হুমায়ূনেরই প্রিয় ছিল গানটা, 'উইড়া যায়রে শুয়া পঙ্খি, পইড়া থাকে ছায়া।' হুমায়ূন আর ছায়া ফেলবেন না, মায়া ফেলবেন। মায়াই তাঁর ছায়া। মায়ার পাখি হয়ে এসেছিলেন, মানুষের মনে মায়াই বুনে গেছেন। যা ছুঁয়েছেন, মায়ার স্পর্শে তা-ই সুন্দর হয়ে ফুটেছে। এই মায়ার ফুল দেখা যায় , রাখা যায় না।

আমরা যারা শহর-নিমশহরে মানুষ, আমাদের শৈশব-কৈশোরটা কোনোভাবেই পথের পাঁচালীর অপু -দুর্গার মতো হওয়ার নয়। অপরাজিতর তরুণ অপুর কলকাতাবাসের গল্প আমাদের নয়। আমাদের উদাস দুপু র, আমাদের অকারণ মন খারাপের কথা কেউ তো বলেনি। আমাদের অসচ্ছল সংসারের এইসব দিনরাত্রিতে কত ছোট ছোট অনুভূতির ফুল ফোটে আর ঝরে , কে তা খেয়াল করে? এসব মৃদু মানুষের মৃদু জীবনের নন্দিত নরকের কথা বলবেন কোন ঈশ্বর? কে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের মায়াকে আমাদেরই একজন হয়ে, আমাদেরই মতো করে, আমাদেরই ভাষায় প্রকাশ করবেন? নগর-উপনগর আর মফস্বলে আমরা সামান্য হয়ে ছিলাম। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের তুলে নিয়ে তাঁর জগৎ সাজালেন , মনের আয়নায় বড় করে দেখালেন। আজ সেই আয়নাখানা হারিয়ে গেল। মায়ার পাখি উড়াল দিল।

আমাদের বেড়ে ওঠার একেকটি অধ্যায়ের হাতে, টেবিলে, বালিশের নিচে, ব্যাগের ভেতর হুমায়ূনের একেকটা বই। মন খারাপের বিকেল, জ্বরতাপিত রাত, নিঃসঙ্গ দুপুর, নিশিবৃষ্টির ক্ষণ, মন দেওয়া-নেওয়ার লগ্নগুলোর স্মারক হয়ে আছে হুমায়ূনের একেকটা বই। হুমায়ূনের খোকা, আনিস, পরী, নীলা, রুনু, রাবেয়া ও মন্টুদের সঙ্গ পেয়ে আমরা বড় হয়ে উঠি। তাঁর উপন্যাসের মা-বাবা, ভাইবোনদের মধ্যে আমরা আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোনদের আবিষ্কার করে আপ্লুত হয়ে যাই। পাড়ার মাস্তানটি তাঁর কাহিনিতে ভালোবাসার রাজপুত্তুর হয়ে ওঠে। হুমায়ূনের মায়ার ছোঁয়ায় সবই কত মানবিক , কত আপন আর চেনা। এভাবে হুমায়ূন আমাদের গত তিন-চার দশকের জীবনীর অংশ হয়ে ওঠেন। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা তাই আমাদের অতীতকেই ফিরে দেখি।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে হুমায়ূন একবার আমাদের শহরে এলেন। ভোরবেলা দেখা করার সময় পাওয়া গেল। স্থানীয় পর্যটন মোটেলে উঠেছেন। প্রথম বর্ষের ছাত্র আমি। শীতের ভোরে সেখানে গিয়ে দেখি, মোটেলের বারান্দায় পায়চারি করছেন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। হাঁটছেন, আর শীতের কুয়াশা বারবার তাঁকে ঢেকে ফেলছে। সেই কুয়াশা ফুঁড়ে আবার তিনি বেরিয়ে আসছেন। আজ তাঁর জীবনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, চিরটা কালই ভেতরের মানুষটা কুয়াশাঘেরা হয়েই ছিলেন। মৃত্যুতে সেই কুয়াশা যেন আরও ঘন হয়ে এল, ব্যক্তিমানুষটা সেই কুয়াশার ভেতরে আরও বেশি করে যেন ঢুকে যাচ্ছেন ; আর ফিরছেন না।

দুই.

একাত্তরের পরের জঙ্গম সময়ে ঠান্ডা নিরুচ্চার বেদনার ধাক্কা নিয়ে এলেন হুমায়ূন আহমেদ। কোথায় পেলেন এই গল্প? এই গল্পের কোথাও বোঝার উপায় নেই, দেশ-ভূগোল-মন থেঁতলানো একটা যুদ্ধসময় পার করে করেও ত্বরাতে পারছে না নতুন দেশটা। এ রকম গোলমালে একাত্তরের সাত কোটি মানুষের সাত কোটি গল্প হঠাৎ মুখ বুজে ফেলল। এ রকম সময় লোকে মায়াকভস্কি চায় , গোর্কি-নেরুদা-নাজিম হিকমতকে চায়। কেননা, বিপ্লব শেষ হয়নি, সোনার বাংলার সাধ তখনো মেটেনি। জীবনবাদ্য তখন চড়া তালে বাজছে। তার ভেতরে বসে গুণগুণ করে এক সামান্য পরিবারের তৎসামান্য আলেখ্য বলতে বসলেন এই লেখক। নন্দিত নরকের জন্ম হলো।

সংগ্রামের উত্তাপ তখনো শুকায়নি। জাসদ-সর্বহারা-রক্ষীবাহিনীর যুগ। দুঃশাসন -নৈরাজ্য-অনাহারের দিন। সেটাও একরকম নন্দিত নরক। কিন্তু হুমায়ূনের সেই নরকে উত্তাপ নেই। সেখানে ঠান্ডা-স্যাঁতসেঁতে দিশাহীন এক পরিবেশে মৃদু মানুষেরা জীবন অতিবাহিত করছে। সেসব সামান্য মানুষের স্বপ্নহীনতা দিয়েই তাঁর শুরু। ছোট ছোট কেরানিপ্রতিম স্বপ্ন তারা দেখে বটে, সেও স্বপ্নহীনতার শঙ্খনীল কারাগার ভালোবাসার জন্যই। তারা ইতিহাস গড়বে না। তারা কেবল একটু ভালো করে জীবনের আস্বাদন চায়। হঠাৎ কোনো সুসংবাদে দারা -পুত্র-পরিবার নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে চায়। কিন্তু দিনশেষে তারা অতি সাধারণ। অসাধারণ কিছুই ঘটে না তাদের জীবনে। মামুলি খুটখাটে ভরা তাদের কর্মকাণ্ড। সব আহ্লাদ সব সুখসাধ বিসর্জনে গেলেও শান্ত মনে পরের দিনটি শুরু করার অধ্যবসায়ে কোনো কমতি নেই তাদের। কুড়িগ্রামের রাজারহাটে এক কৃষককে দেখেছিলাম , ভর সন্ধ্যায় দেড় মানুষ সমান উঁচু পাটখেতের গোড়ার অন্ধকারে বসে নীরবে কাজ করছে, কোথাও কেউ নেই, পাটের গোড়ার মাটি ছাড়া আর কোনো দিকে নজরও নেই। হুমায়ূনের মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা এভাবে জীবনের গোড়া বাঁধতে বাঁধতেই জীবন শেষ করে দেয়। শেষাবধি তারা পারিবারিক-সাংসারিক-অযান্ত্রিক। তারা সীমা ডিঙায় না, বিদ্রোহ করে না। নিজের ভেতরের দেব ও দানবকে অনায়াসেই নিস্তেজ করে রাখতে তারা পারঙ্গম।

সারা জীবন এসব অযান্ত্রিক মৃদু মানুষদের নিস্তেজ জীবনের বিস্তারিত দেখিয়ে যেতে যেতে তাদের ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এসব মানুষ জানে , তাদের ঈশ্বর তাদের স্বর্গ বা নরকে কোথাও পাঠাবেন না। এই পার্থিবতাতেই তিনি তাদের রাখবেন এবং ভালোবাসবেন। সেই ঈশ্বর তাদের একের পর এক আয়না জুগিয়ে গেছেন। সেই আয়না সামান্য মায়াবী অধিকটা দুনিয়াবি। মায়ার এই মিশেলের জন্যই আয়না তাদের আত্মদহনে ঠেলে না। তাদের চেতনের আকুতি , অচেতনের বিকার এই আয়নার শুশ্রূষা পায়। এভাবে তিনি এবং তাঁর চরিত্ররা একই সমতলে একই মানস-আবহের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকেন। এভাবে তাঁর সাহিত্যে সত্তর-আশির দশকের ঢাকাই মধ্যবিত্তের জীবনালেখ্য সংরক্ষিত হয়ে আছে

স্মৃতিপুঞ্জের আকারে। স্মৃতির ছবিতে কথায় ঘটনায় যেমন সন -তারিখ দাগানো থাকে না, তেমনি হুমায়ূনের চরিত্ররাও সময়হীন এক মায়াপুরীর বাসিন্দা।

আশির দশকে এই মধ্যবিত্ত বড় স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে। ঘর-সংসার-চাকরি-প্রেম এবং হঠাৎ গরিমার মধ্যে নিজেকে দেখার সাধ ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। এদের কথা পশ্চিমবঙ্গের নিমাই -শংকর-সুনীল-শীর্ষেন্দুরা কোনো দিন বলেননি। বলার কথাও নয়। মহান কথাশিল্পীরা চিরটা কাল এদের শ্লেষভরা রসকষ উপেক্ষা করে মানবতার প্রবাহ খুঁজেছেন আরও তলার মানুষের জীবনে। অথচ এরা আছে, একটু একটু করে জীবন গোছাচ্ছে, জগৎ-সংসারের মধ্যে আরও ঘন হয়ে লেপ্টে থাকতে চাচ্ছে। এই বিরাট মধ্যবিত্ত সমাজের সাংসারিক আর অলীক আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসী জীবনীকার তিনি। আর কিছু না হোক , উঠতি বাঙালি মুসলমান সমাজের আটপৌরে জীবনী খুঁজতে হুমায়ূনকে আমাদের লাগবেই।

এই মহিমাহীন মধ্যবিত্তের মনেই তো হিমুর মতো বাঁধনছেঁড়া দীনতামুক্ত অকপট তরুণের প্রতি আসক্তি জন্মে। নৈতিকতার দেহবন্ধনী আর অসামর্থ্যের শাসানিতে আটক বাসনা ও বিকারের নিদান পাওয়ার মিসির আলিকে দরকার হয়। তারা যা পারে না, হিমু তা পারে। মনের যে ধন্ধ তাদের জবরজং করে রাখে , মিসির আলি সেসব জট ছুটিয়ে দেন। হিমুর অযুক্তির উচ্ছ্বাস আর মিসির আলির যুক্তির স্থিরশীতলতায় মধ্যবিত্তের আত্মদর্শন হয়। নাগরিক বিচ্ছিন্নতায় মানুষের আত্মা পরম কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কথাশিল্পী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রদের দেখি নানা রকম অতীন্দ্রি য়বাদী ঘোরে ডুবে সেই ক্ষুধা মেটায়। হুমায়ূন সে পথে নেন না পাঠককে, হিমু আর মিসির আলির মতো মানবিক ইহবাদী চরিত্রের সঙ্গ দিয়ে তাদের আত্মিক তৃষ্ণা মেটানোর উপায় করেন।

ষাটের দশকের মধ্যবিত্তের তেমন আত্মিক সংকটের দেখা পাওয়া যায় না সে সময়ের উপন্যাসে। সবই তখন জাতীয় সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক লক্ষ্য খুঁজছে। কিছু অস্তিত্ববাদী নড়াচড়া কারও কারও মধ্যে দেখা দিলেও তা ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্য উপভোগ কিংবা তদনুযায়ী জীবনযাপনের পার্শ্বফল। তখনো তাদের গ্রাম আছে, সমাজ আছে, ঐতিহ্য আছে; ফলে শূন্যতা কম। কিন্তু যুদ্ধ পেরোনো সমাজ এক ধাক্কায় সাবালক হয়ে মাটি-ভবন কামড়ে থাকার উপায় খুঁজতে হয়রান। গ্রাম দূরে চলে গেছে , পরিবারের বাঁধন আলগা হচ্ছে, সংস্কৃতির রস পানসে লাগছে, ভবিষ্যৎ ভরসা দিচ্ছে না। আশির দশকে এসে এই নগরজীবন বিচ্ছিন্নতার দেখা পায়। এই বিচ্ছিন্নতার ঘের কাটানোর মতো বড় প্রেরণাও তখন সমাজে অনুপস্থিত; বিশেষ করে উঠতি তরুণ-তরুণীর মনের তৃষ্ণা মেটানোর কিছু ছিল না। হুমায়ূনের সামাজিক আখ্যানের ভেতরে এই নাগরিক চাপা হাহাকার বদ্ধ ঘরের পাখির মতো ছটফট করে। তাই হিমু আর মিসির আলি চরিত্র তাদের মনের তলাকার ফাঁপর আর গুমরের মানবিক বিহিতের দায়িত্ব নেয়। তাঁর তোমাদের জন্য ভালবাসা, ইরিনা, বা নির মতো সায়েন্স ফিকশনগুলোও যতটা না বিজ্ঞান, তার থেকে বেশি মানবীয়

সম্ভাবনার দিগন্তকে দেখায়। বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিত এক রসের জন্ম হয়। বাদবাকিটা অসম্ভব প্রতিভাধর এক রসরাজের রসের খেলা, ভাষা আর বাক্যের লীলা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তার চরিত্রেরা ভাবে না, কেবল কথা বলে আর কাজ করে। হুমায়ূন অবলীলায় কয়েকটি বাক্যে এদের জীবনটা এঁকে ফেলেন। কিন্তু এতটুকুতেই তাদের অন্তরাত্মার খবর পাওয়া যায়। তাদের নানা রকম ইচ্ছা হয়, খামখেয়াল হয়, আর তারা সেসব করে ফেলে কিংবা করতে পারে না। আত্মচিন্তা ছাড়া উপন্যাস হয় না, কিন্তু হুমায়ূনের উপন্যাসে তেমন চিন্তা নেই। এদের মনের তলায় অন্য মন যেন নেই, তারা একমনা একটানা মৃদু মানুষের মৃদু জীবন কাটিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে নব্বই সাল আসে। সত্তরের ধুঁকতে থাকা অনিশ্চয়তা , আশিতে সামলে নিয়ে গোছগাছে মন দেওয়ার পর নব্বইয়ে সে মুক্ত হতে চায়। যে সেনাশাসনের ধাঁচের মধ্যে সাবেকি জীবনধারা, অন্তর্মুখী সময়, বাঁধো বাঁধো নাগরিকতা একধরনের স্থিতির মধ্যে ছিল; বিশ্বায়িত গণতন্ত্র আর মুক্তবাজারের যুগল ডানায় এবার তা উড়তে শুরু করে। বহিরাগত বাসনা আর ভেতরগত তাড়নার তোড়ে পুরোনো জগৎ , পুরোনো ঘরগেরস্থালি, পুরোনো দেহমন সাততাড়াতাড়ি বদলাতে শুরু করে। হুমায়ূনের পাত্রপাত্রীরা পলাশী থেকে দূরে সিরাজউদ্দৌলার কৃষকের মতো ভবিতব্যজ্ঞানহীনই থেকে যায়। বদলের এই ছবি হুমায়ূনীয় আয়নায় ততটা ধরা পড়ে না।

শূন্য দশকে মৃদু মানুষের অনেকেই প্রবল হওয়া শুরু করে। অনেকে তাল সামলাতে না পেরে ভাসতে থাকে। তরুণদের সামনে আসে নতুন উত্তেজনা। কেনাকাটার হাত খোলা , মেলামেশায় শরীরখোলা, যোগাযোগে অজড়িত থাকার এই নতুন পরিবেশে হুমায়ূনের আনিস , সাবেত, পরী, নীলারা এক পাশে সরে যায় তাদের নিদাগ হৃদয়সহ। তিনি তখন আরও পেছনে তাকাতে শুরু করেন , আরও আগের গল্প বুনতে থাকেন, ইতিহাসের জমিন হাতড়াতে থাকেন এই মাতাল হাওয়ায়। চক্র পূর্ণ হয় , মৃদু মানুষের ঈশ্বর আরও একা হতে শুরু করেন। হয়তো তাঁর সাহিত্যিক ক্ষয়ও শুরু হয়।

তিন.

অবশেষে একদিন মৃত্যু আসে। আর মধ্যবিত্ত তার হারানো মন আর সময়ের স্মৃতিপুঞ্জসমেত এক বৃষ্টির দিনে তাঁদের নায়ককে কবর দিতে যায়। ফিরে আসার সময় তাদের খেয়াল হয়, তাদের প্রথম যৌবন থেকে প্রতিটি যৌবনাগত নতুন যুবক -যুবতী হুমায়ূনি জোছনার কুহকধরায় ধরা ছিল। সেই সময় , সেসব মানুষ আর সেসব কুহক অবসিত হলে পরে , হুমায়ূনের সাহিত্যিক জীবনীর আজ প্রথম প্রহর। ইহকাল শেষে হুমায়ূন সাহিত্যের মহাকালে উঠে বসলেন। সেই কাল ইতিমধ্যে তাঁর সাহিত্যে দাঁত বসানো শুরু করে দিয়েছে। কতটা খেয়ে কতটা রাখে, দেখা যাক।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প

খাদক

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহংকারও আছে। কিসের অহংকার, কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন_ এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম_ খাদক মানে?

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না, আমাদের গ্রামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি আছে। নামকরা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কী সব যেন বলেছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

ও আচ্ছা।

আমি ভালো খাদকের দিকে তাকালাম।

রোগা বেঁটে খাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাকা; পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না , ইস্ত্রি করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রাবারের জুতা।

জুতা জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেওয়া হয়। যেমন আজ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম_ আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম _এসব কী করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ -জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আরে আসুন, বসুন। অনুমতি আবার কিসের।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার মতো ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দুদিন ধরে আমি এই অজপাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চের দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দকার সাহেব আমার অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আদর -যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক জাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখানে কেউ খায়নি, কারণ গাছটার ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মতো গাছ _দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধ মণ গোশত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই প্রফেসর সাহেবকে মেডেল দেখা।

মতি মিয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সিও, রেভেন্যু, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেডমাস্টার। অন্যটিতে নামধাম কিছুু নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল_ একজন লোক পরিমাণে বেশি খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিকে হায়ার করে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মতির সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই দেখতে চায়।

কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই বললাম _ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা! দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা -নেওয়ার খরচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।

কর না কেন?

একসঙ্গে দুই-তিনটা কাম করলে কোনোটাই ভালো হয় না। আল্লাহ তায়ালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা, অন্য কোনো বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বিদ্যার অহংকারে মতি মিয়ার চোখ চিক চিক করতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না -কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের ১০ জনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রাম দেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসার সাব।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রান্না করা গোশত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে মতি, পারবি তো?

মতি হাসিমুখে বলল, আপনাদের ১০ জনের দোয়া।

খাওয়ার পরে দুই সের চমচমও খাবি। বিদেশি মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।

আলহামদুলিল্লাহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব, এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্রহ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সঙ্গে আমাকেও বসে থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হতো।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হলো। খোন্দকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারি হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতি খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এ রকম ওস্তাদ বেশি না থাকাই ভালো। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই গরু জবাই দিলাম, তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপ রে ভাই।

রান্নার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাওয়ার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে বলল_ গোশত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

তাই নাকি?

জ্বি। আর চাবাইতে হয় খুব ভালো কইরা । গোশত যখন মুখের মধ্যে তুলার মতো হয় তখন গিলতে হয়।

কায়দা-কানুন তো অনেক আছে দেখি।

বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোত্থেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানান ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্যবিষয়ক। দুই বছর আগে কোনো এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তাঁর সামনে আধমণ জিলেপি খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপির ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

জ্বি খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। ২০০ টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। পেসিডেন সাবরে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?

খুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশি হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন।

মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কী খাদক নাকি?

জ্বি না। তারা না-খাওন্তির দল। খাইতে পায় না। কাজ কামতো কিছুই করি না , খাওয়ামু কি? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন খাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যে আরাম আছে।

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হলো রাত ১০টার দিকে। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলোকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলো ক্ষুধার্ত। হয়তো রাতেও কোনো কিছু খায়নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন। স্কুলের হেডমাস্টার , গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ওসি সাহেব, পোস্টমাস্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসি জবেহ হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনায় প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এর আগেরবার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত ১২টার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনের চারপাশে সবাই বসে। শুধু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দুটি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হবো মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যা পারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন _ কেমন দেখছেন?

ভালোই।

বলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাইতো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরি হবে। সকাল ১০টার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্লো হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

জ্বি। শেষের দিকে এক টুকরো গোশত গিলতে ১০ মিনিট সময় নেয়। আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী মতি খারাপ লাগছে?

জ্বে না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, অসম্ভব_একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব! রাত ১টার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে_বাকি গোশত আমি খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয় _মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে_ কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে_হারলে হারব।

আমি জানি, বাস্তবে তা হবে না। সকাল ১০টা হোক, ১১টা হোক মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোনো দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।

চোখ

চোখ গল্পটি হুমায়ূন আহমেদের সেরা গল্পের একটি। প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য গল্পটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো

আজ বাদ-আছর খেজুর কাঁটা দিয়ে মতি মিয়ার চোখ তুলে ফেলা হবে। চোখ তুলবে নবীনগরের ইদরিস। এই কাজ সে আগেও একবার করেছে।

মতি মিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে বরকতসাহেবের বাংলাঘরে। তার হাতপা বাঁধা। একদল মানুষ তাকে পাহারা দিচ্ছে, যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা , মতি মিয়ার উঠে বসার শক্তি পর্যন্ত নেই। তার পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। ডান হাতের সব কটা আঙুল থেঁতলে ফেলা হয়েছে। নাকের কাছে শিকনির মতো রক্ত ঝুলে আছে। পরনের শাদা পাঞ্জাবি রক্তে মাখামাখি হয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। ঘন্টাখানিক আগেও তার জ্ঞান ছিল না। এখন জ্ঞান আছে, তবে বোধশক্তি ফিরেছে বলে মনে হয় না। তার চোখ তুলে ফেলা হবে এই খবরেও সে বিচলিত হয়নি। ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলেছে , নয়ন কখন তুলবেন?

এই পর্ব বাদ-আছর সমাধা হবে শুনে সে মনে হলো নিশ্চিত হলো। সহজ গলায় বললো, পানি খামু, পানি দেন।

পানি চাইলে পানি দিতে হয়। না দিলে গৃহস্থের দোষ লাগে। রোজ হাশরের দিন পানি পিপাসায় বুক যখন শুকিয়ে যায় তখন পানি পাওয়া যায় না। কাজেই এক বদনা পানি এনে মতির সামনে রাখা হলো। মতি বিরক্ত গলায় বললো, মুখের উপর পানি ঢাইল্যা না দিলে খামু ক্যামনে ? আমার দুই হাত বান্ধা। আপনেরার এই কেমুন বিবেচনা?

হাসান আলি মতিকে কেন্দুয়া বাজার থেকে ধরে এনেছে। মতির ওপর এই কারণেই তার অধিকার সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। মতির বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে হাসান আলীর মতামত জানা দরকার। হাসান আলী পানি বিষয়ে কোনো মতামত দিল না, বিস্মিত হয়ে বললো, হারামজাদা কেমন ঢঙে কথা কয় শুনছেন? তার চউখ তোলা হইব এইটা নিয়ে কোনো চিন্তা নাই। ক্যাটক্যাট কইরা কথা বলতাছে। কী আচানক বিষয়! ঐ হারামজাদা, তোর মনে ভয়-ডর নাই?

মতি জবাব দিলো না, থু করে থুতু ফেলল। থুতুর সঙ্গে রক্ত বের হয়ে এল। তাকে ঘিরে ভিড় বাড়ছে। খবর ছড়িয়ে পড়ছে। একজন জীবিত মানুষের চোখ খেজুর কাঁটা দিয়ে তুলে ফেলা হবে এমন উত্তেজক ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আশা করা যাচ্ছে, আছর ওয়াক্ত নাগাদ লোকে লোকারণ্য হবে। মতিকে দেখতে শুধু যে সাধারণ লোকজন আসছে তা না, বিশিষ্ট লোকজনও আসছেন। কেন্দুয়া থেকে এসেছেন রিটায়ার্ড স্টেশনমাস্টার মোবারক সাহেব। নয়াপাড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবও এসেছেন। হাসান আলী নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিলো। তিনি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চশমা বের করতে করতে বললেন, এরই নাম মতি?

হাসান আলী হাসিমুখে বললো , জ্বে হেডমাস্টার সাব, এই হারামজাদাই মতি। বাদ-আছর হারামজাদার চোউখ তোলা হইবে।

‘এরে ধরলা ক্যামনে?’

‘সেইটা আপনের এক ইতিহাস’।

পানদানিতে পান চলে এসেছে। হেডমাস্টার সাহেব পান মুখে দিতে দিতে উৎসাহের সঙ্গে বললেন , ঘটনাটা বলো শুনি। সংক্ষেপে বলবা।

হাসান আলী এগিয়ে এল। মতিকে ধরে আনার গল্প সে এ পর্যন্ত এগারবার বলেছে। আরো অনেকবার বলতে হবে। বিশিষ্ট লোকজন অনেকেই এখনো আসেননি। সবাই আলাদা আলাদা করে শুনতে চাইবেন। তাতে অসুবিধা নেই। এই গল্প একলক্ষ বার করা যায়। হাসান আলী কেশে গলা পরিস্কার করে নিলো।

‘ঘরে কেরাছি ছেল না। আমার পরিবার বললো, কেরাছি নাই। আমার মিজাজ গেল খারাপ হইয়া। হাটবারে কেরাছি আনলাম, আর আইজ বলে কেরাছি নাই, বিষয় কি! যাই হউক, কেরাছির বোতল হাতে লইয়া রওনা দিলাম। পথে সুলেমানের সঙ্গে দেখা। সুলেমান কইলো , চাচাজি, যান কই?

মতি নিজেও হাসান আলীর গল্প আগ্রহ নিয়ে শুনছে। প্রতিবারই গল্পের কিছু শাখা -প্রশাখা বের হচ্ছে। সুলেমানের কথা এর আগে কোনো গল্পে আসেনি। এইবার এল। সুলেমানে ভূমিকা কী কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

হাসান আলী গল্প শেষ করলো। হেডমাস্টার সাহেব মুগ্ধ গলায় বললেন , বিরাট সাহসের কাম করছ হাসান। বিরাট সাহস দেখাইছ। কামের কাম করছ। মতির সঙ্গে অস্ত্রপাতি কিছু ছিল না ?

‘জ্বে না।’

‘আল্লাপাক তোমারে বাঁচাইছে। অস্ত্রপাতি থাকলে উপায় ছিল না। তোমারে জানে শেষ কইরা দিত।’ উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, চউখ তোলা হইব কথাটা কি সত্য?

‘জ্বে সত্য। এইটা সকলের সিদ্ধান্ত। চউখ তুললেই জন্মের মতো অচল হইব। থানা -পুলিশ কইরা কোনো ফায়দা নাই।’

‘অতি সত্য কথা, কোনো ফায়দা নাই। তবে থানাওয়ালা ঝামেলা করে কিনা এইটা বিবেচনায় রাখা দরকার।’

‘আছে, সবই বিবেচনার মইধ্যে আছে। মেম্বর সাব থানাওয়ালার কাছে গেছে।’

মতি লক্ষ করল, হেডমাস্টার সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেডমাস্টার সাহেবের চোখে শিশুসুলভ বিস্ময় ও আনন্দ। মনে হচ্ছে, চোখ তোলার ঘটনা দেখার জন্য তিনি আছর পর্যন্ত থেকে যাবেন। মতি তেমন ভয় পাচ্ছে না। প্রাথমিক ঝড় কেটে গেছে এটাই বড় কথা। প্রথম ধাক্কায় চোখ চলে যেতে পারতো। সেটা যখন যায়নি তখন আশা আছে। আছরের আগেই কেউ না কেউ দয়াপরবশ হয়ে বলে ফেলবে—'থাউক, বাদ দেন। চউখ তুইলা লাভ নাই। শক্ত মাইর দিয়া ছাইড়া দেন। ' একজন বললেই অনেকে তাকে সমর্থন করবে। তবে একজন কাউকে বলতে হবে। মতি নিজে ক্ষমা চাইলে হবে না। এতে এরা আরো রেগে যাবে। সে দুর্বল হলে সর্বনাশ। দুর্বলকে মানুষ করুণা করে না , ঘৃণা করে। মতি ঠান্ডা মাথায় ভাবে । চোখ বাঁচানোর পথ বের করতে হবে। হাতে অবশ্যি সময় আছে। আছরের এখনো অনেক দেরি। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করাও সমস্যা হযে দাঁড়িয়েছে। সারা শরীরের যন্ত্রণা, পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির বদনা সামনে আছে কিন্তু কেউ মুখে ঢেলে না দিলে খা বে কিভাবে?

হেডমাস্টার সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কিরে মতি সিগ্রেট খাবি?

সবাই হো-হো করে হেসে ফেললো। মতি চিন্তিত বোধ করছে। এটা ভালো লক্ষণ না। এরা তাকে দেখে মজা পেতে শুরু করেছে। মানুষ মজা পায় জন্তু -জানোয়ার দেখে। এরা তাকে জন্তু-জানোয়ার ভাবতে শুরু করেছে। হাত-পা বাঁধা একটা ভয়াবহ প্রাণী। ভয়াবহ প্রাণীর চোখ ওঠানো কঠিন কিছু না। তাছাড়া দূর - দূরান্ত থেকে লোকজন মজা পাবার জন্যে আসছে। মজা না পেয়ে তারা যাবে না। মতি হেডমাস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললো—স্যার, পানি খাব। একজন বদনার পুরো পানিটা তার মুখের উপর ঢেলে দিলো। সবাই আবার হো-হো করে হেসে উঠল। মতির বুক ধক করে উঠল। অবস্থা ভালো না। তাকে দ্রুত এমন কিছু করত হবে যেন সে পশুস্তর থেকে উঠে আসতে পারে । কি করা যায় কিছুই মাথায় আসছে না। চোখদুটা কি আজ চলেই যাবে? মায়া-মমতা দুনিয়া থেকে উঠে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন তার মতো লোকের শাস্তি ছিল মাথা কামিয়ে গলায় জুতার মালা ঝোলানো। তারপর এল ঠ্যাং -ভাঙা শাস্তি, ঠ্যাং ভেঙে লুলা করে দেওয়া। আর এখন চোখ তুলে দেওয়া। একটা খেজুর কাঁটা দিয়ে পুট করে চোখ বের করে আনা। এতগুলি লোক তাকে ঘিরে আছে, কারো চোখে কোনো মমতা নেই। অবশ্যি হাতে এখনো সময় আছে। মমতা চট করে তৈরি হয় না। মমতা তৈরি হতেও সময় লাগে। মতি হাসান আলীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মানুষের হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। জন্তু -জানোয়ার হাসতে পারে না। মানুষ হাসে। একজন 'হাসন্ত' মানুষের ওপর রাগ থাকে না।

হাসান আলী চেঁচিয়া উঠল, দেখ, হারামজাদা হাসে। ভয়ের চিহ্নটা নাই। কিছুক্ষণের মইধ্যে চউখ চইল্যা যাইতেছে, তারপরেও হাসি। দেখি, এর গালে একটা চড় দেও দেখি।

প্রচণ্ড চড়ে মতি দলা পাকিয়ে গেল। হাত-পা বাঁধা, নয়তো চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ত। কিছুক্ষণের জন্যে মতির বোধশক্তি লোপ পেল। মাথার ভেতর ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার। এরা কি চোখ তুলে ফেলেছে? মনে হয় তাই। পানির পিপাসা দূর হয়েছে। পিপাসা নেই। এটা মন্দ না। মাথার ভেতর পাক দিচ্ছে, মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান হবার আগে আগে এরকম হয়। অজ্ঞান হওয়া খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার। দ্রুত শরীরের ব্যথা-বেদনা চলে যায়, শরীর হালকা হতে থাকে।

না, চোখ যায়নি। চোখ এখনো আছে। এইতো সবকিছু দেখা যাচ্ছে। মতি মনে -মনে বলল, 'শালার লোক কী হইছে! মেলা বইস্যা গেছে।' বেলা পড়ে এসেছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেল নাকি? না মনে হয়। আলো খুব বেশি। তাকে বাংলা -ঘর থেকে বের করে উঠোনে শুইয়ে রাখ হয়েছে। এইজন্যেই আলো বেশি লাগছে।

মতি বলল, কয়টা বাজে?

'কয়টা বাজে তা দিয়া দরকার নাই। সময় হইয়া আসছে। যা দেখনের দেইখ্যা নে রে মতি।'

মতি চারদিকে তাকাল। তার আশেপাশে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে নেই। মহিলা নেই। এদের বোধহয় সরিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকজন তাকে ঘিরে গোল হয়ে আছে। তার সামনে জলচৌকির উপর নীল গেঞ্জি এবং শাদা লুঙি পরে যে বসেআছে সে-ই কি চোখ তুলবে? সে-ই কি নবীনগরের ইদরিস? কখন এসেছে ইদরিস? লোকটার ভাবভঙ্গি দশজনের মতো না। তাকাচ্ছে অন্যরকম করে। তার চেয়েও বড় কথা, আশেপাশের লোকজন এখন নীল গেঞ্জিঅলাকেই দেখছে। মতির প্রতি তাদের এখন আর কোনো আগ্রহ নেই। তারা অপেক্ষা করছে বড় ঘটনার জন্য। নীল গেঞ্জি-পরা লোকটার সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নেয়া যায়। মতি অপেক্ষা করছে কখন লোকটা তাকায় তার দিকে। যেই তাকাবে অমনি মতি কথা বলবে। চোখের দিকে না-তাকিয়ে কথা বললে কোনো আরাম নেই, কিন্তু লোকটা তাকাচ্ছে না।

'ভাইজান, ও ভাইজান'

নীল গেঞ্জি তাকাল মাতির দিকে। মতি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আফনের নাম কি ইদরিস মিয়া?

নীল গেঞ্জি জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে নিল। মতি আরো আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল , ভাইজান, আফনেই কি আমার চউখ তুলবেন?

পেছন থেকে একজন বলল—হারামজাদা কয় কী! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। এই কথায় হাসার কী আছে মতি বুঝতে পারছে না। কথাটা কি সে বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে বলেছে? সাধারণ কথাও কেউ কেউ খুব মজা করে বলতে পারে। তার বৌ পারত। অতি সাধারণ কথা এমনভাবে বলত যে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যেত। ভাত বেড়ে ডাকতে এলে বলত—ভাত দিছি, আসেন। কষ্ট কইরা তিন-চাইরটা

ভাত খান। না, বৌয়ের কথা ভাবার এখন সময় না। এখন নিজের নয়ন বাঁচানোর বুদ্ধি বের করতে হবে। নয়ন বাঁচলে বৌয়ের কথা ভাবা যাবে। নয়ন না-বাঁচলেও ভাবা যাবে। ভাবার জন্যে নয়ন লাগে না। বৌয়ের কথা সে অবশ্যি এমনিতেও বিশেষ ভাবে না। শুধু হাজতে বা জেলখানায় থাকলেই তার কথা মনে আসে । তখন তার কথা ভাবতেও ভালো লাগে। মেয়েটার অবশ্যি কষ্টের সীমা ছিল না। সে জেলে গেলেই রাতদুপুর চৌকিদার, থানাঅলা বাড়িতে উপস্থিত হত। বিষয় কি? খোঁজ নিতে আসছে মতি ঘরে আছে কি-না। সুন্দর একটা মেয়ে। খালি-বাড়িতে থাকে। থানাঅলারা তো রাতদুপুরে সেই বাড়িতে যাবেই। বাড়িতে যাবে। পান খাবে। আরও কত কি করবে। ডাকাতের বৌ হল সবার বৌ। এই অবস্থায় কোনো মেয়ে থাকে না। তার বৌটা তারপরেও অনেক দিন ছিল। মতি প্রতিবারই বাড়ি ফিরত আতঙ্ক নিয়ে। বাড়ির সামনে এসে মনে হত এইবার বাড়িতে ঢুকে দেখবে , বাড়ি খালি। কেউ নেই।

বৌ চলে গেছে গত বৈশাখ মাসে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পাড়ার কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিল। কেউ বলতে পারে না। একজন বলল—অনেক দিন তো থাকল, আর কত? বাজারে গিয়া খোঁজ নেও। মনে হয় বাজারে ঘর নিছে। জগতের অনেক সত্যের মতো এই সত্যও সে গ্রহণ করেছে সহজভাবে। চোর-ডাকাতের বৌদের শেষ আশ্রয় হয় বাজার। বাজারে তারা মোটামুটি সুখেই থাকে। মুখে রঙ -চঙ মেখে সন্ধ্যাকালে চিকন গলায় ডাকে—ও বেপারি, আহেন, পান-তামুক খাইয়া যান। শীতের দিন শইলডা গরম করন দরকার আছে।

অবসর পেলেই মতি আজকাল বাজারে-বাজারে ঘোরে। বৌটাকে পাওয়া গেলে মনে শান্তি। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার আর করবে না। তাতে লাভ কী? বৌটা কোনো-এক জায়গায় থিতু হয়েছে এটা জানা থাকলেও মনে আনন্দ। মাঝেমধ্যে আসা যাবে। আপনার মানুষের কাছে কিছুক্ষণ বসলেও ভালো লাগে। আপনার মানুষ সংসারে থাকলেও আপনার, বাজারে থাকলেও আপনার।

বৌ কেন্দুয়া বাজারে আছে এরকম একটা উড়া-খবর শুনে মতি কেন্দুয়া এসেছিল। উড়া-খবর কখনো ঠিক হয় না। তার বেলা ঠিক হয়ে গেল। বৌ এখানেই আছে। নাম নিয়েছে মর্জিনা। বাজারে ঘর নিলে নতুন নাম নিতে হয়। মর্জিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার মুখে এই বিপদ।

আজান হচ্ছে। আছর ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মতি অনেক কষ্টে পাশ ফিরল। তারা চোখ কখন তুলবে ? নামাজের আগে নিশ্চয়ই না। কিছুটা সময় এখনো হাতে আছে। এর মধ্যে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। মহাখালি রেলস্টেশনে সে একবার ধরা পড়ল। তাকে মেরেই ফেলত। ট্রেনের কামরা থেকে একটা মেয়ে ছুটে নেমে এল। চিৎকার করে বলল—আপনারা কি মানুষটাকে মেরে ফেলবেন ? খবরদার, আর না। খবরদার! মেয়েটির মূর্তি দেখেই লোকজন হকচকিয়ে গেল। লোকজনের কথা বাদ থাক , সে নিজেই হতভম্ব। জীবন বাঁচানোর

জন্যে মেয়েটিকে সামান্য ধন্যবাদও দেয়া হয়নি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সেই মেয়ে চলে গেছে কোথায়-না-কোথায়!

আজ এই-যে এত লোক চারপাশে ভিড় করে আছে, এদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ আছে ঐ মেয়েটির মতো। সে অবশ্যই শেষমুহূর্তে ছুটে এসে বলবে , 'করেন কী! করেন কী!' আর এতেই মতির নয়ন রক্ষা পাবে। এইটুকু বিশ্বাস তো মানুষের প্রতি রাখতেই হবে। মতি মিয়া অপেক্ষা করে। কে হবে সেই লোকটি। না-জানি সে দেখতে কেমন। সেই লোকটির চোখ কি ট্রেনের মেয়েটির চোখের মতো মমতামাখা হবে?—যে চোখের দিকে তাকালে ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছা করে? মতি মিয়া চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করতে তার ভালোই লাগে।

হুমায়ূন ৫০ গ্রন্থ থেকে নেওয়া

সেলুয়েডের ফিতায় বন্দী : হুমায়ূন আহমেদের অবিস্মরণীয় আটটি চলচ্চিত্র

ইমপ্রেস প্রযোজিত নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচালনায় 'শ্রাবণ মেঘের দিন', 'শ্যামল ছায়া', 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' ও 'আমার আছে জল' এই চলচ্চিত্রগুলো এখন স্টার সিনেপ্লেক্সে প্রদর্শন হচ্ছে। ইমপ্রেস এবং স্টার সিনেপ্লেক্স মিলে গত ২৭ জুলাই থেকে এই চলচ্চিত্রগুলো নিয়মিতভাবে প্রদর্শন করে আসছে। প্রদর্শন চলবে ২ আগস্ট পর্যন্ত। হুমায়ূন আহমেদের এই চারটি চলচ্চিত্রসহ তার নির্মিত সবকটি চলচ্চিত্র নিয়ে লিখেছেন আরিফুর রহমান

হে বন্ধু হে প্রিয়,

ডাক্তারের কঠিন নিষেধÑবেশি মানুষের

ভিড়ে যাওয়া যাবে না তারপরেও

সবাইকে নিয়ে 'ঘেটুপুত্র কমলা'Ñ

দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

ছবি দেখে সরাসরি আমাকে গালাগালি করার সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

আসুন আমার সঙ্গে

'ঘেটুপুত্র কমলা' দেখুন।

বিনীত

হুমায়ূন আহমেদ

ইমপ্রেস পরিবারকে লেখা এই আমন্ত্রণপত্রটি আপনার জন্যও প্রযোজ্য। ধন্যবাদান্তে ফরিদুর রেজা সাগর

ঘেটুপুত্র কমলা

ইমপ্রেস এর ব্যানারে নির্মিত ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ চলচ্চিত্রটিই হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটি এখনও রিলিজ পায়নি। আমেরিকায় ক্যান্সারের চিকিৎসা চলাকালীন মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য তিনি দেশে আসেন। তখন ইমপ্রেস থেকে এই চলচ্চিত্রটির বিশেষ প্রিমিয়ার শো হয়। ওই বিশেষ প্রিমিয়ার শোর জন্য হুমায়ূন আহমেদ ইমপ্রেসের জন্য উপরের চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠিটিই আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য কার্ডে ছেপেছিল ইমপ্রেস। গত ২৯ মে বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে স্টার সিনেপ্লেক্সে ওই বিশেষ শোতে হুমায়ূন আহমেদ ছাড়াও ‘ঘেটুপুত্র কমলা’র অভিনয়শিল্পী এবং আমন্ত্রিত অতিথি, সাংবাদিকদের নিয়ে একত্রে চলচ্চিত্রটি দেখেন। স্টার সিনেপ্লেক্সে এটিই ছিল তার জীবনের শেষ দেখা চলচ্চিত্র।

৫০ বছর আগের সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের জুলসুকা গ্রাম নিয়ে ছবিটির পটভূমি রচিত হয়েছে। সে সময় ভাটি অঞ্চলের অভিজাত লোকেরা বালকদের নারী সাজিয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে বিলাসিতা করত। তাদের নাম ছিল ঘেটুপুত্র। অভিজাত মানুষের বিনোদনের খোরাক এইসব ঘেটুপুত্রের জী বন বঞ্চনার গল্প নিয়েই ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ ছবিটি তৈরি করেন হুমায়ূন আহমেদ। ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিশোর শিল্পী মামুন। এই চলচ্চিত্রে আরো অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান , জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, তমালিকা কর্মকার, প্রাণ রায়, কুদ্দুস বয়াতি, জুয়েল রানা, শামীমা নাজনীনসহ অনেকেই। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেছেন মাহফুজুর রহমান খান। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন মকসুদ জামিল মিন্টু ও এসআই টুটুল।

বিশেষ প্রিমিয়ার শোতে ওই চলচ্চিত্রটি দেখার আগে তিনি বলেছিলেন এটি তার শেষ চলচ্চিত্র। হুমায়ূন আহমেদের মুখ থেকে এই কথা শুনে আমন্ত্রিত অতিথিরা তার এই কথা ফিরিয়ে নেবার অনুরোধ করেন। তিনি তখন এই কথা ফিরিয়ে নিলেও সত্যিই তিনি তার কথা রেখেছেন। তিনি আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন না। সবাইকে শোক-সমুদ্রে ভাসিয়ে তিনি চলে গেছেন দূর অজানার দেশে।

আগুনের পরশমণি

'আগুনের পরশমণি' হুমায়ূন আহমেদের প্রথম চলচ্চিত্র। নিজের উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। প্রথম চলচ্চিত্রেই তিনি তার স্বভাবজাত মুন্সিয়ানার ছাপ দেখান। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন ১৯৯৫ সালে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ ঢাকার মুক্তিবাহিনীর অভিযান আর মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের সঙ্কট এতে তুলে ধরা হ য়। গল্পটিতে দেখা যায় ১৯৭১ সালের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকায় ভীষণ নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে ছুটছে হানাদার বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির বহর। তীব্র হতাশা , তীব্র ভয়ে কাঁপছে মানুষ। অবরুদ্ধ ঢাকার একটি পরিবারের কর্তা মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার শোনার চেষ্টা করছেন মৃদু ভলিউমে। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার চেষ্টা করছেন। নব ঘোরাচ্ছেন ট্রানজিস্টারের। হঠাৎ শুনতে পেলেন বজ্রকণ্ঠের অংশ বিশেষ : 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি/রক্ত আরও দিব/এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ।' মতিন সাহেবের পরিবারে কয়েকদিন পর হাজির হন তার বন্ধুর ছেলে বদি (আসাদুজ্জামান নূর) এবং তার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক অভিযানে সফলতা লাভ করে। কিন্তু এক এক করে তারা পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। ধরা পড়েও গেরিলা যোদ্ধা রাশেদুল করিম (ফজলুল কবীর তুহিন) জিজ্ঞা সাবাদের সময় থুথু ছিটিয়েছেন পাকিস্তানি মেজরের মুখে। হাতের আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে তার। মাথা নোয়াননি। অবশেষে আসাদুজ্জামান নূর গুলি খান। তাকে সারানোর মতো ডাক্তার ওষুধের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি কি পারবেন সকাল পর্যন্ত বাঁচতে? তিনি কি আরেকটি সূর্যালোক দেখতে পাবেন? এই রকম টানটান উত্তেজনা নিয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনী এগিয়ে যায়।

চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেন আসাদুজ্জামান নূর , বিপাশা হায়াত, ডলি জহুরসহ আরো অনেকেই। চলচ্চিত্রটি তখন ব্যাপক আলোচিত হয়। সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে চলচ্চিত্রটি তখন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। তার ফলশ্রুতিতে চলচ্চিত্রটি সেই সময় আটটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। চলচ্চিত্রটির আটটি ক্যাটাগরির মধ্যে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ পুরস্কৃত হন। এছাড়া চলচ্চিত্রটির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে বিপাশা হায়াত, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সত্য সাহা, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক হিসেবে মফিজুল হক , শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে শীলা আহমেদ ছাড়াও শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার হিসেবে হোসনে আরা পুতুল পুরস্কৃত হন।

শ্রাবণ মেঘের দিন

প্রথম চলচ্চিত্রের ব্যাপক সাফ্যলের পর হুমায়ূন আহমেদ দ্বিতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দেন ১৯৯৯ সালে। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের এর প্রযোজনায় চলচ্চিত্রটির নাম 'শ্রাবণ মেঘের দিন'। এটি তার 'শ্রাবণ মেঘের দিন'

উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত। চলচ্চিত্রটি ছিল ভাটি অঞ্চলের কাহিনী আর সঙ্গীত প্রধান। এই চলচ্চিত্রও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় 'মতি' (জাহিদ হাসান) একজন গাতক (গায়ক) তাকে মনে মনে ভালোবাসে ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে 'কুসুম' (শাওন)। তার গানের গলাও খুব ভালো, সে সব সময় ভাবে মতি মিয়াকে নিয়ে একটা গানের দল করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু ঢাকা থেকে আসা ঐ গ্রামের জমিদার (গোলাম মোস্তফা) নাতনি 'শাহানা'কে (মুক্তি) ভালোবাসে মতি। তবে জানে না শাহানা তাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে মাত্র। এদিকে কুসুমের বাবা উজান থেকে একটি ছেলে 'সুরুজ'কে (মাহফুজ আহমেদ) নিয়ে আসে কুসুমের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য। ঐ গ্রামের বাসিন্দা 'পরান' (ডা. এজাজ) এর স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছিল। জমিদারের নাতনি শাহানা একজন ডাক্তারÑ এই ভেবে মতি মিয়া তাকে ডেকে আনে। শাহানা এসে বুঝতে পারে তার পেটের বাচ্চা উল্টে আছে। সে বইতে পড়েছে এর চিকিৎসার ব্যাপারে, কিন্তু বাস্তবে কখনো করেনি। তবুও কোনো উপায় না দেখে সাহস করে সেই সন্তান স্বাভাবিকভাবে ডেলিভারি করাতে সক্ষম হয় এবং যে জমিদারকে এলাকার সবাই ঘৃণার চোখে দেখত তারা সবাই এখন তাকে সম্মান করে। একদিকে কুসুমের বিয়ের আয়োজন চলছে অন্যদিকে জমিদারের নাতনিরা ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে জমিদারসহ। জমিদার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারিদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিল। তাই গ্রামের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার জমিদার বাড়ি একটি হাসপাতালের জন্য দান করে বিদায় নেয়। আর তাই গ্রামের প্রায় সবাই চলে আসে তাদের বিদায় জানাতে। বাড়িতে একা মতিকে না পাওয়ার কষ্টে বিষপান করে কুসুম। কুসুমের মা টের পেয়ে সবাইকে ডাকে এবং তাকে নিয়ে মতি আর সুরুজ নৌকায় ছোটে ডাক্তার শাহানার কাছে। কিন্তু মাঝপথেই সোয়া চান পাখি চিরনিদ্রায় শায়িত হয়।

চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেন জাহিদ হাসান, মাহফুজ আহমেদ, মেহের আফরোজ শাওন, মুক্তি, গোলাম মোস্তফা, আনোয়ারা, শামীমা নাজনীন, সালেহ আহমেদ, ড.এজাজুল ইসলামসহ আরো অনেকে। প্রথম চলচ্চিত্রের মতোই এই চলচ্চিত্র সেই সময় সাতটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ওই সাতটি ক্যাটাগরি হলো শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাহিদ হাসান, শ্রেষ্ঠ পার্শ্বঅভিনেতা হিসেবে গোলাম মোস্তফা, শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে মকসুদ জামিল মিন্টু , শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে রশীদউদ্দিন আহমেদ, শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে সুবীর নন্দী, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক হিসেবে মাহফুজুর রহমান খান ও শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক হিসেবে মফিজুল হক পুরস্কা র পান।

দুই দুয়ারী

হুমায়ূন আহমেদ ২০০০ সালে নির্মাণ করেন তার তৃতীয় চলচ্চিত্র 'দুই দুয়ারী'। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবার পর দর্শকদের নিরাশ হতে হয়নি। দর্শকদের কিভাবে টেনে আনতে হয় সেটি তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ রেখেছেন। ম্যাজিক রিয়েলিজমের গল্প নিয়ে এই ছবিটিতে পরিচালক তুলে ধরেছেন একজন রহস্য মানবের কিছু রহস্যময় ঘটনা, যিনি আশ্চর্য উপায়ে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকেন। ছবিটির হাস্যরসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ওই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন রিয়াজ, মেহের আফরোজ শাওন, মাহফুজ আহমেদ, ডা. এজাজুল ইসলাম, মাসুদ আলী খানসহ আরো অনেকে। চলচ্চিত্রটি সেই বছর দুটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে রিয়াজ এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক হিসেবে মাহফুজুর রহমান খান পুরস্কার পান।

চন্দ্রকথা

২০০৩ সালে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন 'চন্দ্রকথা'। এই চলচ্চিত্রের কাহিনী ছিল পুরনো দিনের জমিদারদের কঠোর মনোভাব, বিলাসিতা আর শিল্পকর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ। এতে একই সঙ্গে মানবতা আর নিষ্ঠুরতার চিত্রও ফুটে ওঠে। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ফেরদৌস , শাওন, চম্পা, আসাদুজ্জামান নূর, আহমেদ রুবেল, স্বাধীন খসরু, ডা. এজাজুল ইসলামসহ আরো অনেকেই। 'চন্দ্রকথা' ছবিটিতে অনেকেই এর আগে বিটিভিতে প্রচারিত হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক 'অয়োময়'-এর প্রচ্ছায়া খুঁজে পান।

শ্যামল ছায়া

সাধারণ একটি ঘটনাকে অসাধারণ করে তোলার ক্ষমতা একমাত্র হুমায়ূন আহমেদের পক্ষেই সম্ভব। যারা সিনেমা হলে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখা ছেড়ে দিয়েছিল তারাই হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রের কারণে হলমুখী হতে শুরু করেন। তার চলচ্চিত্রই মানে বিশেষ কিছু পাওয়া। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রযোজনায় ২০০৫ সালে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন 'শ্যামল ছায়া'। এই চলচ্চিত্রে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গোটা জাতির মধ্যে যে দেশপ্রেম আর একতা তৈরি হয়েছিল, সেই বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্যালুয়েডের ফিতায় বন্দী করেন। চলচ্চিত্রটিতে পাশাপাশি তুলে ধরা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই বীরত্বগাথা। এতে অ ভিনয় করেন রিয়াজ, শাওন, হুমায়ুন ফরিদী, তানিয়া আহমেদ, চ্যালেঞ্জার, ডা. এজাজুল ইসলামসহ আরো অনেকে। চলচ্চিত্রটি বিশ্ব চলচ্চিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কারে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে মনোনয়ন পায়।

নয় নম্বর বিপদ সংকেত

ইমপ্রেস প্রযোজিত এই ছবিটি সম্পূর্ণ হাস্যরসে ভরপুর। এই চলচ্চিত্রে একজন ধনাঢ্য বয়স্ক ব্যক্তি হঠাৎ করে তার আপনজনদের কাছে পেতে চান। কিন্তু তাদেরকে এক করা তার জন্য হয়ে ওঠে কঠিন। সবাইকে তার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে একত্র করা হয়। এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক মজার সব ঘটনা। সম্পূর্ণ বিনোদনধর্মী এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন রফাত আলী, তানিয়া আহমেদ, রূপক, মিঠু, ডা. এজাজুল ইসলাম, ফারুক আহমেদসহ আরো অনেকে।

আমার আছে জল

২০০৮ সালে ইমপ্রেস প্রযোজিত হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করে 'আমার আছে জল' চলচ্চিত্রটি। এটি হুমায়ূন আহমেদের পাঠক নন্দিত উপন্যাস 'আমার আছে জল' চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য, গান ও তার শিল্প নির্দেশক তিনি নিজে। চলচ্চিত্রটি সিলেটের মনোরম লোকেশনে চিত্রায়িত হয়। এই চলচ্চিত্রে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার অবকাশযাপন আর ত্রিভুজ প্রেমের গল্প তুলে ধরা হয়। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেন বিদ্যা সিনহা মীম, ফেরদৌস, জাহিদ হাসান, শাওন, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সালেহ আহমেদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন আহমেদ, ডা.এজাজুল ইসলাম, মুনিয়া মিঠু, মাজনুন মিজান, পুয়ন, রুদ্র, ওয়াফেসসহ আরো অনেকে। চলচ্চিত্রটি সেই বছর দুটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। শাখা দুটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক মাহফুজুর রহমান খান ও শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী মৃধা ইংশায় নাওয়ার ওয়াফা।

হুমায়ূন আহমেদ নিজের পরিচালনায় আটটি চলচ্চিত্র ছাড়াও তার উপন্যাস অবলম্বনে আরো আটটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রগুলো হলো মুস্তাফিজুর রহমান পরিচালিত 'শঙ্খনীল কারাগার', সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'আবদার', মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত 'দূরত্ব' ও 'প্রিয়তমেষু', শাহ আলম কিরণ পরিচালিত 'সাজঘর', আবু সাইয়ীদ পরিচালিত 'নিরন্তর', বেলাল আহমেদ পরিচালিত 'নন্দিত নরকে' এবং তৌকির আহমেদ পরিচালিত 'দারুচিনি দ্বীপ'।

রিয়াজ

স্যারের সিনেমা নাটক দুই ক্ষেত্রেই আমার অভিনয়ের সুযোগ হয়েছে। আর এই অভিনয়ের সুযোগেই পেয়েছি আকাশচুম্বি দর্শকপ্রিয়তা। স্যারের নাটক চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তার মৃত্যু কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছি না।

স্বাধীন খসরু

আজকের এই আমি হূমায়ূন আহমেদের জন্যই। স্যার আসলেই একজন বড় মনের মানুষ। ন ইলে আমার মতো নগণ্য মানুষকে নিয়ে এত চরিত্র নির্মাণ করেন। তার নির্দেশনায় অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছি। তার পরিচালনায় শ্যামল ছায়া চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছি। সেই চলচ্চিত্রে আমার চরিত্র ছিল মাওলানার। সেটি ছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। সেই চলচ্চিত্রে আমার অভিনয়ের সময় স্যার আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন।

বিদ্যা সিনহা মিম

স্যারের হাত ধরেই আমার চলচ্চিত্রে আসা। আমার আছে জল সেই চলচ্চিত্রের সুবাদে স্যারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, মিশতে পেরেছি। স্যার একজন অসাধারণ ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি প্রচুর গল্প করতেন। তার সেই গল্প আমি মজা করে শুনতাম। স্যারের চলচ্চিত্রে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু তিনি আমাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর আগে গল্প করে আমার নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সবার কাছে শুনেছিলাম, স্যার নাকি রাগী মানুষ। কিন্তু শুটিং চলাকালে পুরো ১ মাস ছিলাম। কিন্তু কোনোদিন উনাকে রাগতে দেখিনি। চলচ্চিত্রটির শুটিং চলাকালে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমাকে পুকুরে নেমে একটি সিকোয়েন্সের শর্ট দিতে হবে। অর্থাৎ পানিতে ভাসতে হবে। আমি সাঁতার পারি না। স্যার বলল কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শিখতে। কিন্তু আমার সাঁতার শেখা হয়নি। শুটিংয়ের দিন পানিতে নামতে হবে আমি যে বলব ভয়ে বলা হলো না। সাহস করে পুকুরের পানিতে নেমে দেখি গলা পানি। মাঝ পুকুরে নামার পর স্যার বলল ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। দেখ তোমার পাশে পানি থেকে অর্ধেক হাত নিচে কলা গাছের ভেলা আছে। সেই ভেলাতে ভেসে থাকতে। ভেসে থাকার পর শুট হলো। সত্যি কথা বলতে কি স্যার আগে থেকে জানত আমার সাঁতার শেখা হয়নি। সেই জন্যই আমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য ওই ব্যবস্থা।

হুমায়ূন আহমেদ যে চ্যালেঞ্জ রেখে গেলেন
আলী রীয়াজ

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আগামীতেও হবে। প্রচলিত অর্থে যারা 'সাহিত্য সমালোচক' তারা হুমায়ূনের প্রতি খুব বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন না বলেই আমার মনে হয়েছে, ইংরেজিতে যাকে Unkind বলে। আমি বলব তারা অধিকাংশ সময়েই খুব আন -কাইন্ড হয়েছেন। তার লেখার এবং লেখক হিসেবে তার নিজের একটা বড় ভূমিকা আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিনি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পাঠকদের স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সাধারণ পাঠকরা হুমায়ূনের লেখালেখির আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লেখকদের পাঠক ছিলেন। যে কারণে বাংলাদেশে ভারতীয় পাইরেট বইয়ের একটা বড় বাজার ছিল। বাংলাদেশের লেখকদের একাংশ এই পাঠকদের কাছে পৌঁছলেও তাদের আবেদন পাঠকদের কাছে তুলনামূলকভাবে সীমিতই ছিল। হুমায়ূন সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতেই। সৃষ্টিশীল মানুষেরা অঙ্ক করে সৃষ্টি করেন না , তাই হুমায়ূন আহমেদও সেভাবেই এই কাজটা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেন। হুমায়ূন কেবল ঢাকায় ব সে লিখেছেন বলে, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করেছেন বলে আমি বলছি না, বলছি এই কারণেও যে তিনি বাংলাদেশের বাইরে থেকে স্বীকৃতির প্রতি কখনই পক্ষপাত দেখাননি বলে। হুমায়ূনের লেখা পড়ে , তার অন্যান্য কথাবার্তায় আমার মনে হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আর কোনো কেন্দ্র তার বিবেচনায় ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে কারণে আমার মনে হয় যে তিনি বাংলাদেশের পাঠকদের স্বদেশে ফিরিয়েছিলেন তা হলো তার বিষয়। তার সৃষ্টি একান্তভাবেই বাংলাদেশের ভেতর থেকে উৎসারিত। তার লেখায় যে মুক্তিযুদ্ধ ফিরে ফিরে আসে সেটাই পাঠকদের মনে করিয়ে দেয় যে এই অভিজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশের পাঠক, বাংলাদেশের লেখকের অভিজ্ঞতা। তার পাঠকেরা, যারা বয়সে তরুণ, যারা এই অভিজ্ঞতা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের হুমায়ূন সেই সময়টাতে নিয়ে যান এবং তাদের এই অর্জনের গৌরবের অংশীদার করে তোলেন। তার সঙ্গে তার পাঠকেরা বুঝতে পারেন ওই অর্জনগুলো হারি য়ে ফেলার বেদনা। হুমায়ূনের লেখায় যারা 'শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের অনুপস্থিতি' দেখতে পান তারা সম্ভবত এই দিকটাকে অবহেলাই করে এসেছেন।

হুমায়ূনের লেখার প্রধান চরিত্রগুলো স্বপ্নবান একই সঙ্গে তারা বাস্তবের এবং অবাস্তব এবং তারা খুব সাধারণ। সাধারণ জীবনের মধ্যেই তারা অসাধারণ। যে কারণে হুমায়ূনের পাঠকরা চান এই চরিত্রগুলো হয়ে উঠতে। স্বপ্নবান হওয়াটা সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত। হুমায়ূন তার পাঠককে সৃষ্টিশীল করে তোলেন। স্বপ্নবান মানুষেরা হতাশ হতে পারে না। হুমায়ূন তার তরুণ পাঠকদের হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো আশার দিকে নিয়ে যান। হুমায়ূন বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রথম বংশীবাদক। হুমায়ূন আহমেদের তিরোধানে বাংলাদেশের সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে কেবল যে একটা শূন্যতাই সৃষ্ট হলো তা নয় , একটা চ্যালেঞ্জও তৈরি হলো। হুমায়ূন যে লাখ লাখ পাঠককে স্বদেশে ফিরিয়ে আনলেন, লাখ লাখ তরুণকে স্বপ্ন

দেখতে শেখালেন তাদের তিনি রেখে গেলেন বাংলাদেশের হাতে, দেশের অন্য সব লেখকের হাতে; এখন তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ এই সৃষ্টিশীল , স্বপ্নবান তরুণদের তারা কী স্বপ্ন দেখাবেন। হুমায়ূন পাঠকদের সামনে চ্যালেঞ্জ তারা এই লালিত স্বপ্ন দিয়ে কী করবেন।

হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনগুলো

বিশ্বজিত সাহা

এ বছর নিউইয়র্কের বইমেলা নিয়েও ছিল হুমায়ূন ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন। একদিন নিজে থেকেই বললেন বিশ্বজিত এবারের বইমেলায় একটি অনুষ্ঠান হবে 'শতবর্ষের বাংলা গান'। টপ্পা থেকে শুরু করে হাল আমলের গান পর্যন্ত। প্রতিটি গানের শুরুতে গানটির ইতিহাস হুমায়ূন ভাই বলবেন। তখন আলো পড়বে হুমায়ূন ভাইয়ের ওপর। এরপর গান করবেন মেহের আফরোজ শাওন, তখন আলো থাকবে তাঁর ওপর। গান শেষে আলো পড়বে যন্ত্রীদের ওপর। হুমায়ূন ভাইয়ের স্বপ্নের অনুষ্ঠানটি হলো না , হলো না তাঁকে সম্মাননা জানানোর অনুষ্ঠানটি। হয়েছিল তাঁ র আঁকা প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী। ২০টি ছবি স্থান পায় এই প্রদর্শনীতে। এটিই হলো হুমায়ূন ভাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর ছবির প্রথম ও শেষ প্রদর্শনী। সে সময় তিনি ছিলেন বেলভ্যু হাসপাতালের সিসিইউতে। আসতে পারলেন না হুমায়ূন ভাই বইমেলায়।

১৯৯৭ সালে আমেরিকায় বইমেলা উদ্বোধন করলেন হুমায়ূন আহমেদ। সারাদিন মুষলধারে বরফ পড়ছে। তখন বইমেলা হতো ফেব্রুয়ারির শেষদিকে। প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে (১২ ইঞ্চির ওপর তখন বরফ পড়েছিল) উদ্বোধনের সময় লোকজন থাকবে কি না সন্দেহে ছিলাম। সন্ধ্যা ৮টায় উদ্বোধন। হুমায়ূন আহমেদ পৌনে ৭টায় মিলনায়তনে এলেন। ৩০ মিনিটের মধ্যে শত শত হুমায়ূন ভক্ত ঘিরে ধরলেন তাদের প্রিয় লেখককে। অটোগ্রাফ শিকারিদের কবল থেকে উঠে ফিতা কেটে বইমেলা উদ্বোধন করলেন তিনি। আবার অটোগ্রাফ দিতে বসলেন। একজন পাঠক গোটা ৩০টি বইতে স্বাক্ষর করালেন। অপেক্ষারতরা ছিলেন ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু সেই লাইন আমি কখনো ভুলব না। সেদিন একজন কিশোরী এসে বলেছিল স্যার আপনাকে আমি একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি ? আরেকজন মুখে বলতে পারেননি কিন্তু তাঁর প্রিয় লেখককে স্পর্শ করতে গিয়ে লেখককে ফেলেছিলেন বেকায়দায়। সে যাত্রায় রক্ষা পাওয়ার জন্য হুমায়ূন আহমেদকে সিগারেটের অজুহাতে অটো গ্রাফ দেয়া থেকে উঠে যেতে হয়।

হঠাৎ করে একদিন বিশেষ খামে একটি চিঠি এলো মুক্তধারায়। চিঠিটা খোলা হলো। আমেরিকার লসঅ্যাঞ্জেলেসের একটি জেলখানা থেকে। একজন বাঙালি জেলখানা থেকে মুক্তধারায় চিঠি লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদের ২০১০ সালে প্রকাশিত বই চেয়ে। মানে পাঠকের আগের বইগুলো পড়া। জেলখানা থেকেও হুমায়ূন আহমেদের বই পড়ার আকুতির কথা কি কখনো ভোলার ?

পাদটীকা : ২৬ জুন অনেক রাতে গিয়েছিলাম বেলভ্যু হাসপাতালে। রাত ১১টা বেজে গেছে। আমি আর আমার স্ত্রী। প্রায় দেড়ঘণ্টা ছিলাম হুমায়ূন ভাইয়ের পাশে। ২৯ জুন নিউইয়র্কের বইমেলা শুরু। তাই নানান ঝামেলায় দিনে যেতে পারতাম না। যতবারই চলে আসতে চেয়েছি, হুমায়ূন ভাই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার জন্য। দেড়ঘণ্টায় তিনবার চাইলেন পানি , পানি, পানি। আমরা পানি পান করালাম। এরপর যতবারই গিয়েছি, হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে আর কথা হয়নি। চিনতে পারেননি আমার উপস্থিতি। হুমায়ূন ভাই আর কখনো বলবেন না আর কিছুক্ষণ থাকো।

একজন মানুষের গল্প
হুমায়ূন আহমেদ

সাহিত্যিক ইবরাহীম খাঁকে নিয়ে এই অগ্রন্থিত লেখাটিতে হুমায়ূন আহমেদের স্বভাবসুলভ দক্ষতা বরাবরের মতোই উপস্থিত। লেখাটি অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। [সংগ্রহ :পিয়াস মজিদ]

অনেকদিন আগে শঙ্খনীল কারাগার নামের একটি বই লিখেছিলাম। সেখানে ভালোবাসাবাসি ছিল, চোখের জল ছিল, কাজেই মেয়ে মহলে 'লেখক' নাম হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বারো বছরের এক মেয়ে একটি চিঠি লিখে ফেললো। চিঠি পেয়ে সরাসরি উপস্থিত হলাম ভক্তার বাড়িতে। ভাবখানা এরকম যেন মুখোমুখি বসে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে আসব।

মেয়ের মা দরজা খুলে দিলেন। এক মধ্যবয়স্ক লোক এসেছে তাঁর মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে এই শুনে তাঁর ছোটখাট একটা স্ট্রোকের মতো হলো। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে কড়া গলায় বললেন, "আমার মেয়ের সঙ্গে কী দরকার তা পরিষ্কার করে বলেন।" খুবই সঙ্গিন অবস্থান। আমি কুল কুল করে ঘামছি , এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি। হঠাৎ দেখি মেয়েটি হাত ধরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে আসছে। মেয়েটি হাসিমুখে বললো,

"আমার দাদাকে আপনি কি চিনতে পারছেন?"

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

প্রথম পরিচয় অবশ্যি খুব সুখকর হয়নি। ইবরাহীম খাঁ সাহেব [খুব সম্ভব আমার চক্রকাটা লাল রঙের সার্টের জন্যেই] আমাকে খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখলেন। আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হলো।

"আমার কোন বইপত্র কি পড়েছ?"

'জ্বি হ্যাঁ।'

"দুই একটার নাম বলতে পারবে [গলার স্বরে সন্দেহের আভাস?]"

"আমি নছর পেয়াদা পড়েছি, আমাদের পাঠ্য ছিল।"

"পাঠ্যের বাইরে কিছু পড় নাই ?"

"বাতায়ন পড়েছি।"

"প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত?"

"জ্বি"।

খাঁ সাহেবের ভ্রূকুঞ্চিত হলো। বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না।

"কেমন লাগলো বাতায়ন?"

"প্রথম অর্ধেক চমৎকার!"

"বাকি অর্ধেক?"

আমি চুপচাপ [খাঁ সাহেবের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস]।

"আমার ধারণা ছিল আজকালকার ছেলেরা আমার মতো বড়দের লেখা পড়ে না।"

"আপনার ধারণা ঠিক না। আমরা ঠিকই আমরাই পড়ি, আপনারাই পড়েন না।

খাঁ সাহেব গম্ভীর হলেন। চশমা খুলে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। আমি সাহস করে বলে ফেললাম_

"আপনি নিশ্চয় হুমায়ূন আহমেদের কোন বই পড়েন নাই।"

খাঁ সাহেব থমথমে গলায় বললেন,

"হুমায়ূন আহমেদ কে?"

"আমি। আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তিনি চশমা চোখে পরলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। এক অসম বন্ধুত্বের সৃষ্টি হলো সেদিন [৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সন]। একদিকে নিবেদিতপ্রাণ ইবরাহীম খাঁ, সাহিত্য যার

প্রাণপাখি, অন্যদিকে এক যশলিপ্সু তরুণ, সাহিত্য যার কাছে এক ধরনের জীবন বিলাস। আজকের এই লেখা নিবেদিতপ্রাণ ইবরাহীম খাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাড়ির নাম দখিন হাওয়া। নাম শুনলেই মনে হয় সারাক্ষণ উথাল পাথাল বইছে। আসলে কিন্তু সে রকম নয়। পুরানা ধরনের দোতলা বাড়ি। একটু যেন গুমোট ভাব। সে বাড়ির সমস্ত হাওয়ার উৎস এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ চোখে ভারি পাথরের চশমা নিয়ে সারাদিন বাইরের ঘরে চুপচাপ পড়াশুনা করেন। বসার ঘরটি বড়ই সাদামাটা। মেঝেতে কার্পেট নেই। দেয়ালে কার্পেটের সঙ্গে রং মেশানো পেইনটিং নেই, ভারি-ভারি সোফা নেই। কাঠের একটি টেবিলের সামনে কয়েকটি চেয়ার, বাঁ পাশে একটি লম্বা বেঞ্চ। আসবাবের মধ্যে এই। সবচে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে দেয়ালের একটি লেখা :

অল্প কথায় কাজ সেরে বিদায় হন যিনি

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ, কাজের লোক তিনি।

_ মাতু মিয়া

লেখায় কাজ হয় না কিছু। যে আসে সে আর উঠতে চায় না। আর উঠবেইবা কেন ? বাড়ির দখিন দুয়ার সবার জন্যে খোলা। যেই আসে তাঁকেই হৃদয় খুলে অভ্যর্থনা : বাড়ি কোথায় ? কোন গ্রাম? কোন থানা? ছেলেমেয়ে কটি? কী নাম, কোথায় পড়ে? সবশেষে অতি বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, "কী করতে পারি আপনার জনাব?"

বিনা প্রয়োজনে কেউ তেমন আসে না। বেশির ভাগই সাহায্যপ্রার্থী; দরিদ্র ছাত্র, বেতন দিতে হবে, পরীক্ষার ফিস দিতে হবে। দরিদ্র লেখক; জীবনধারণ করতে পারছেন না। কেউ সাহায্য চেয়ে তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে গেছে_ এমন অপবাদ তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুও তাকে কোনদিন দেবে না। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে গাদা করা থাকত মনিঅর্ডার ফরম। মাসের প্রথম তারিখে নিজের হাতে লিখতেন সেসব। অধিকাংশই দুঃস্থ কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে। মনি অর্ডারে টাকা যারা পেতেন তাঁরা টাকার সঙ্গে বাড়তি পেতেন লিমেরিক জাতীয় রচনা। মনিঅর্ডার ফরমে সুন্দর করে লেখা।

স্কুল-কলেজের ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। অমুক স্কুল মঞ্জুরি পাচ্ছে না , অমুক কলেজের ফান্ডে টাকা নাই, অমুক জায়গায় নতুন কলেজ হবে, তিনি গিয়ে একটা বক্তৃতা দিলে বড় ভালো হয়। মেয়েদের একটা স্কুল দেয়া হবে, লোকজন খুব বিরোধিতা করছে। তিনি যদি একটু দেখেন। অসীম

ধৈর্য নিয়ে শুনছেন সবকিছু। একটা জবদা খাতায় নোট লেখা হচ্ছে। এই অশক্ত শরীর নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতটুকু বিরক্তি নেই মুখে। রসিকতা করছেন ক্রমাগত। উদাহরণ দেই।

ভুয়াপুর কলেজের কাজে গিয়েছেন। ভাদ্র মাসের গরম। সমস্ত দিন সভা -সমিতি- মিটিং শেষে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে দখিন হাওয়াতে ফিরে এসেছেন। এসে শুনলেন এক ভদ্রলোক দুপুর থেকে বসে আছেন। তক্ষুনি গেলেন দেখা করতে। ভদ্রলোকের ছেলেটি কলেজে ভর্তি হতে পারছেন না। তার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। ইবরাহীম খাঁ সাহেব বললেন_

"আপনার ছেলেটিতো শুনেছিলাম গুণ্ডামী করে বেড়ায়। এখনো সেই রকম নাকি?"

"নাহ্ প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, সেই ছেলে আর নাই। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাহাজ্জতের নামাজ পড়ে। দিনের মধ্যে ৭/৮ ঘণ্টা মসজিদেই থাকে।"

ইবরাহীম খাঁ খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, "হুঁ, জোয়ান ছেলে। বলছেন দিন রাত মসজিদেই থাকে। অবস্থা তো জনাব আগের চেয়েও খারাপ। কোন রকমে আগের মতো করা যায় না?"

যে সময়ের কথা লিখছি সে সময় তাঁর বয়স আশির কোঠায়। বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধি _ ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসারে কাবু হয়েও জীবনকে বাঁধলেন ঘড়ির কাঁটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা _ ভাগ ভাগ করা কখন কী করবেন। ভোর বেলা হাঁটতে বের হন। সে সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজ নেন। কে কোথায় আছে, কী করছে_ সব জানা চাই। হাঁটাহাঁটির পর মেয়ের বাড়ি যান ইনসুলিন নিতে। সেখানে নাস্তা শেষ। দখিন হাওয়ায় ফিরে পরের তিন ঘণ্টা হচ্ছে লেখার কাজ। সে সময় তাঁকে কিছুতেই বিরক্ত করা চলবে না। উদাহরণ দেই।

আমি বসে আছি তাঁর ঘরে। জনৈক সরকারি কর্মচারী এসেছেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গে উঁচুদরের কে যেন দেখা করতে চান। [খুব সম্ভব তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ; বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কী একটা ব্যাপার।] খাঁ সাহেব বললেন,

"যে সময় যেতে বলছেন সে সময়টা আমার লেখার সময়, যাওয়া সম্ভব নয়।"

"খুবই জরুরি লেখা কি?"

"[মুখে মৃদু হাসি] জনাব আমার সব লেখাই আমার কাছে জরুরি।"

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি ইবরাহীম খাঁ সাহেবের মেজো নাতনিকে বিয়ে করি [বার বছরের সেই বালিকা পাঠিকা]। বাংলাদেশের অন্য সব নাত-জামাইদের মতো তখন আমি তাঁকে যেকোন সময় বিরক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করি। কত সময় যে কাটিয়েছি তাঁর ঘরে! কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত বিচিত্র আলোচনা! তাঁর প্রিয় বিষয় হচ্ছে ইতিহাস। তিনি শুরু করতেন ইতিহাস। আমি তাঁকে টেনেটুনে নিয়ে

আসতাম ভূত-প্রেতের গল্পে। ভূত-প্রেত আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি নাস্তিক ছিলেন। আমি কিছু কিছু অলৌকিক গল্প বলে তাঁকে ব্যাখ্যা করতে বলতাম। তিনি দেখতাম কিভাবে কিভাবে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেন। তার নিজের জীবনে অলৌকিক ঘটনার তিনি অবিশ্যি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

গল্পটি এ রকম_

তাঁর বড় ভাই মারা গিয়েছেন যেদিন, সেদিন রাত্রে তিনি নামাজ পড়ছেন। গভীর রাত। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তিনি হঠাৎ দেখলেন তাঁর জায়নামাজের সামনে একটি ছোট্ট আলো। সেই আলো ক্রমাগত বড় হতে লাগল। সমস্ত ঘর আলোময় হলো। তিনি নামাজ থেকে উঠতে পারছেন না। ভয়ে কাঁপছেন। এক সময় আলো নিভে গেল। তিনি নামাজ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দাদার বেশির ভাগ গল্পই আমি শুনেছি তাঁর নাতি-নাতনিদের কাছে। তারা সব সময় বলতো, "বিখ্যাত লোকের নাতি-নাতনি হওয়ার মধ্যে সুখ যেমন, বিড়ম্বনাও সে রকম।"

উদাহরণ_

ক. দাদা লক্ষ্য করলেন তাঁর নাতি-নাতনিদের সাহিত্যের দিকে তেমন আগ্রহ নেই। যত ঝোঁক খেলাধুলার দিকে। তিনি এক ছুটির দিনে সবাইকে ডেকে বললেন , আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে সবাইকে একটি করে কবিতা লিখে জমা দিতে হবে। ভালো হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা। খারাপ হলে শাস্তির সম্ভাবনা। নাতি -নাতনিরা মুখ কালো করে কাগজ-কলম হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কবিতা আসে না কিছুতেই। একজন কোনমতে লিখল একটি। জমাও দেয়া হলো যথাসময়ে। কবিতার নমুনা :

কেরে পারে কেরে খোদা

গাছের ডালে বসে তোতা

ওরে ভোতা ওরে ভোতা

দাদার মুখ গম্ভীর। রেগেমেগে আগুন। তাঁর কণ্ঠে মেঘ গর্জন "এর মানে কী জানতে চাই।" নাতির চোখে অশ্রুজল।

খ. দাদা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। একটি নাতি আছে সঙ্গে। মজার মজার গল্প শোনাচ্ছেন দাদা। এক সময় নাতিটি বললো_

"দাদা দেখেছেন, এই বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে?"

"কারা এসেছে জান?"

"জ্বি না।"

"খুবই লজ্জার কথা। পাড়াপ্রতিবেশী কে এল , কে গেল, কিছুই জান না। আজকেই একটা পাঁচ নম্বর খাতা কিনে আনবে এবং পাড়া-প্রতিবেশী যারা আছে সবার নাম-ধাম লিখবে। তাঁরা কে কী করেন, কয় ছেলেমেয়ে সব যেন থাকে। সেই খাতা এক সপ্তাহের মধ্যে জমা নিতে হবে।"

গ. দৈনিক বাংলায় কী যেন একটা লেখা দাদার খুব মনে ধরেছে। নাতি -নাতনিদের উপর হুকুম হলো সবাই যেন লেখাটা পড়ে। নাতি-নাতনিরা খুশি-একটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না, বললেই হলো পড়েছি। কিন্তু ভুলবার নয়। দুপুরবেলা নতুন হুকুম _ লেখাটা শুধু পড়লেই হবে না , খাতায় কপি করতে হবে। কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ লিখতে হবে লাল কালিতে। সুন্দর হাতের লেখার জন্য পুরস্কার আছে।

এসব ঝামেলা সত্ত্বেও নাতি-নাতনিরা তাঁর জন্যে পাগল ছিল_ সারাক্ষণই ঘুরঘুর করতো চারপাশে। দাদা গল্প কবিতা লিখলে খুশি হন। কাজেই গল্প এবং কবিতা ও ছড়া দাদা ভালোবাসেন। সবার চেষ্টা _ কে কত সুন্দর গল্প বলতে পারে। তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছিল। নাতি -নাতনিদের লেখা এক সময় পত্র-পত্রিকায় ছোটদের আসরে ছাপা হতে শুরু করে। একজন আবার রচনা লিখে প্রেসিডেন্ট পু রস্কারও পায়।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়, সে সময় তিনি কিন্তু নাতি-নাতনিদের কাছ থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছেন। লেখাপড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমাকে বললেন , হাতে সময় কম, অনেক কাজ বাকি। তাঁর দীর্ঘ দিনের শখ শেরেবাংলার একটি জীবনী লিখবেন। সেটি হয়ে ওঠেনি, তার উপর কাজ করতে হচ্ছে। অপ্রকাশিত রচনা প্রচুর আছে। সে সবেরও ব্যবস্থা করতে হয়। নতুন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়; তাও দেখতে হয়। তাঁর একটি জীবনী লেখা হচ্ছে। সে জন্যেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হচ্ছে। মহাব্যস্ততা। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আগের মতো আর মিশতে পারেন না।

১১ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে পত্নীবিয়োগ হলো। দীর্ঘ দিনের সুখ -দুঃখের সাথীকে হারিয়ে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হলেন; কিন্তু অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন । খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছি। দখিন হাওয়া লোকে লোকারণ্য। দাদা সবার মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, মুখে শান্ত-সমাহিত ভাব। প্রিয়জনদের

কেউ চিৎকার করে কাঁদছিল, তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাদের। যে-ই দেখা করতে আসছে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁদের। দাদির কবর হলো ভুয়াপুর কলেজের মাঠে। দাদা দুজনের জন্যে সেখানেই শেষ বিশ্রামের জায়গা করে রেখেছেন। নিজের রক্ত করা পরিশ্রমের কলেজের পাশেই যেন থাকতে পারেন। ইসলামী রীতিতে স্বামীর বাঁ পাশে হয় স্ত্রীর কবর। তিনি তার উল্টোটা করলেন। বললেন, বেঁচে থাকতে আমি আমার স্ত্রীকে সম্মান দিতে পারি নাই, মরবার পর একটু সম্মান দেখাতে চাই : আমার স্ত্রীর বাঁ পাশে থাকুক আমার জন্যে। এই প্রথম চোখে জল আসল তাঁর।

ভগ্নহৃদয় ইবরাহীম খাঁ ফিরে এলেন দখিন হাওয়ায়। রণক্লান্ত সৈনিক শয্যা পাতলেন শূন্য বিছানায়। একটি যুগের সমাপ্তি হলো সেদিনই।

হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা
নাসির আলী মামুন

আমরা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় গেছি গত বছর নভেম্বরে ওয়ার্ল্ড সোস্যাল বিজনেস সামিটে। সেখানে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বললেন, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিউইয়র্কে। দেখা করতে গিয়েছিলাম তার বাসায়। ক্যান্সারের চিকিৎসায় আছেন। বেশ দুর্বল দেখলাম। কিন্তু বাপ রে বাপ, প্রাণশক্তি অসম্ভব। জিজ্ঞেস করলাম স্যার আপনারা কী আলাপ করলেন। আলাপ নয়, খোঁজ-খবর নিতে যাওয়া। কিন্তু আড্ডায় পড়ে গেলাম! গল্প আর গল্প। খুব হাসাহাসি হলো। এই ক্যান্সারের যন্ত্রণার মধ্যেও মৃত্যু নিয়ে বেশ কৌতুক করলেন। কথা শুনে মনে হলো মৃত্যুর ভয়ভীতি তার ভেতরে নেই। ওই মুহূর্তে কাছে থাকলে আপনাদের দু'জনের কিছু ছবি তুলে রাখতে পারতাম আমি। স্যার জানা লেন, ছবি তুলেছে তার ঘরের লোকেরা। তাদের ক্যামেরা ছিল। অনেকে মনে করেন প্রফেসর ইউনূস অর্থনীতির মানুষ , শিল্প-সাহিত্যের কোনো খোঁজ রাখেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে এবং দীর্ঘকাল তার আলোকচিত্র গ্রহণের সুবাদে একজন বিদগ্ধ পাঠক বলে তাঁকে আমি জানি। তিনি সময় পান না বলে তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে বিশেষ যত্নবান হতে পারেন না। তবে কে কোথায় ভালো কাজ করছেন খবরটা রাখেন। গ্রামীণ ব্যাংকে তার অফিসে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের বইটি দেখেছি। আরও দেখেছি জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প বইটিও। আমি জানি না, বইটি হুমায়ূন আহমেদ তাকে লিখে দিয়েছিলেন কি-না।

ঘটনাটি উল্লেখ করতে হলো, কারণ হুমায়ূন আহমেদ একটি দেশের কত বিবিধ পেশার বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আমাদের একজন লেখক কোটি পাঠকের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তার লেখা উপন্যাস, নাটক এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। গীতিকার হিসেবে ছিলেন সেরা। কোনো লেখকের মৃত্যুর আগে ও পরে আমরা এতটা ব্যাকুল হইনি। একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম যখন মারা গেলেন সমগ্র জাতি শোকের সাগরে ভেসেছিল। কিন্তু সেই মৃত্যু -পরবর্তী সব

আয়োজনের পেছনে ছিল তৎকালীন সরকার এবং অবশ্যই সাধারণ জনতা। হুমায়ূনের মৃত্যু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভিজিয়েছে , কেঁদেছে সবাই। জীবিতকালে হুমায়ূনকে যারা অগ্রাহ্য করেছে তারাও আবেগে বুক ভাসিয়েছে। এমন মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কোনো সুনির্দিষ্ট আয়োজক ছাড়াই তার মৃত্যুতে এত বিপুল মানুষের শোক প্র কাশ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করল বাংলাদেশ। তাকে আমরা এতকাল 'জনপ্রিয়' খেতাবটি দিয়ে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যে ধরতে চেয়েছিলাম। এটা ছিল পরিকল্পিত একটা কৌশল। অথচ অনেক আগেই হুমায়ূন আহমেদ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তিনি কারও মতো নন, তিনি সমকালীন বাংলা ভাষার একজন আধুনিক গু রু। যিনি চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের মতো একাই শুরু, একাই শেষ। দেখলাম স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন টেলিভিশনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছেন, তাকে আর কষ্ট দেবেন না। জীবিত হুমায়ূনকে আমরা বারবার হত্যা করতে চেয়েছি। তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা জানেন, এত আড্ডা এবং উল্লাসের মধ্যেও তিনি ছিলেন দুখী এক মানুষ। তাঁর গভীর কষ্টের জায়গাগুলো আমরা দেখতে পাইনি। এ দেশে তাঁর প্রচার হয়েছে অনেক মিডিয়াতে, কিন্তু তিনি বড় লেখক ছিলেন সেই হিসেবটি অগ্রাহ্য করেছি আম্রা।

১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুমায়ূন আহমেদকে আমার ক্যামেরায় বন্দি করতে যাই নিউমার্কেটের কাছে সুফিয়া ভবনের চার তলায়। ছবি তুলেছিলাম। আমার ক্যামেরাটি দেখে সম্ভবত তার মায়া হয়েছিল। কভার নেই, লেন্সটি ফাঙ্গাসে জর্জরিত। একেবারেই হতদরিদ্র একটি ক্যামেরা। পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির প্রতি আমার পাগলামির কথা শুনে এবং আমি যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল মানুষের দুর্লভ মুহূর্তগুলো ক্যামেরায় বন্দি করি সে কারণে আমার দিকেও এই অধ্যাপকের চোখ কিছুটা আটকে থাকে। অনেকক্ষণ গল্প করি। চা-বিস্কুট খাই। তিনি পা তুলে , লুঙ্গি-গেঞ্জি পরনে, বেশ গল্প করেন। হতবাক হই এই দৃশ্য দেখে, সদ্য আমেরিকা ফেরত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এত সাধারণ কেন! প্রথম দেখা এক আলোকচিত্রীর সামনে এভাবে অনায়াসে নিজের ভালো-মন্দ গল্প করছেন। ছবি তোলার আগে জামা পরতে বলি। হাফ হাতা চেক শার্ট নিয়ে এসে আমার সামনেই গায়ে জড়ালেন।

ছোটখাটো মানুষটি সরলতায় আর মমতায় স্পষ্ট করে কথা বলেন। তাঁরও ফটোগ্রাফিতে শখ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে গিয়ে কিনেছিলেন একটি ৩৫-এমএম জাপানি নাইকন ক্যামেরা। তাঁর প্রতি আমার কৌতূহল আরও অগ্রসর হয়। গল্প করতে থাকি _ বলি আমার ছবি তোলার অভিজ্ঞতা, আলো-আঁধারির মায়াময় দিকটির কথা। আরও বলি অন্ধকারের প্রতি আমার আরাধনার বিষয়টি। তিনি আরেক কাপ চায়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন আমি নিয়মিত চা পান করি না, মাঝে মধ্যে করি। যাক্, চা হাতে আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে। তিনি আমেরিকায় দেখেছেন বড় বড় বইয়ের দোকানে লেখকদের বিরাট সাদা - কালো ছবি। সেখানে নিয়মিত খ্যাতিমান লেখকরা আসেন। নোবেল বিজয়ী লেখকরা আসেন, নতুন বইতে

ভক্তদের অটোগ্রাফ দেন। যেখান থেকে ক্যামেরাটি কিনেছিলেন অনেকবার যাওয়া হয়েছিল। তাঁর ভাষায়, বাজারে তরকারি কেনার মতো দেখে-শুনে ধরে-টিপে ক্যামেরাটি কেনেন।

দেখলাম তাঁর ঘন-কালো চুলের সিঁথি উধাও, দেখা যায় না। চুল আউলা-বাউলা, কখনও বোধ হয় চিরুনি মারেন না। অধ্যাপকের চোখের মোটা চশমার ভেতরে চক্ চক্ করে চঞ্চল দুটি চোখ। টুপ্ করে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন খালি গায়ে, হাতে ক্যামেরা। তাঁর রহস্য আমাকে ব্যাকুল করল। তখন কিছু একটা বলতে গিয়ে বলা হলো না। নিজেই আগ বাড়িয়ে বললেন , ক্যামেরাটি আমার প্রিয় জিনিস। আপনার যখন লাগে নিয়ে যাবেন। কাউকে এটা ব্যবহার করতে দিই না আমি। আপনাকে দেব। প্রয়োজন মনে করে তখনই ক্যামেরাটি নিতে চাইলাম, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না। দুপুর হয়ে আসছে দেখে বিদায় নিতে চাইলাম। তাঁর লেখা তিনটি বই আমাকে উপহার দিলেন। ফেরার সময় বললাম, আমি ডার্করুমের কাজ জানি। নিজে এটি শিখেছি। সাদা-কালো ফিল্ম ডেভেলপ করতে পারি। একটু ... দাঁড়ান দাঁড়ান। ঘরের ভেতরে ঢুকে দ্রুত একটা সাদা -কালো ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম নিয়ে এলেন। আমি ছবি তুলেছি, ভালো কিছু ছবি এসেও যেতে পারে। আপনি নিজের হাতে ডেভেলপ করলে স্টুডিওর চেয়ে ভালো হবে। ফিল্ম নিয়ে সুফিয়া ভবন থেকে বেরিয়ে পড়লাম । ভাবছি ফিল্মটা তো ডেভেলপ করব। তারপর নেগেটিভ থেকে ছবিও প্রিন্ট করে দেব অধ্যাপক সাহেবকে। তিনি খুশি হলে আমাকে তাঁর ক্যামেরাটি ধার দেবেন। দিতে চেয়েছেনও তিনি। কিন্তু ওইদিন লজ্জা এসে চাইতে দেয়নি আমাকে। জরুরি মনে করে ওই রাতেই হুমায়ূন আহমেদের দেওয়া ফিল্মটি বাথরুম অন্ধকার করে খাবার প্লেটের ওপর কেমিক্যাল ঢেলে ডেভেলপ করি। কাজ হয়ে যাওয়ার পর লাইট জ্বালিয়ে দেখতে গিয়ে ধাক্কা লাগল। সব সাদা, কোনো ছবি নেই ওতে! এখন কী জবাব দেব তাঁকে। তিনি যদি ভাবেন আমার কারণে সেটি নষ্ট হয়েছে তাহলে ক্যামেরাটি ধার দিতে চেয়েছিলেন, দেবেন না। এত সুন্দর ক্যামেরার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হব! বুদ্ধি বের করতে চাইলাম, মাথায় এলো না।

পাঁচ দিন পর আবার গেলাম তাঁর বাসায়। বাজারে গেছেন শুনে ভবনের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে নিউমার্কেট থেকে বাজারের ব্যাগ হাতে ফিরলেন হুমায়ূন আহমেদ। আরেক হাতে বিচিত্রা ম্যাগাজিন। আশঙ্কায় ছিলাম ফিল্মের জন্য না জানি কী বলেন। কিন্তু আমাকে দেখেই বলেন, চলেন উপরে যাই। আমি তো ভুল করে ক্যামেরায় ছবি না তোলা ফিল্মটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার ঠিকানা না থাকাতে জানাতে পারিনি। বাঁচলাম। আমার তোলা তার মুখের দুটি সাদা -কালো পোর্ট্রেট প্রিন্ট করে রেখেছিলাম। তাঁর হাতে দিলে এত অন্ধকার কেন জানতে চাইলেন। আমি বললাম আলোছায়ার খেলা_ রহস্য। আমার জীবনটাও এ রকম, রহস্য। তিনি বুঝতে পারলেন আমাকে ক্যামেরাটি ধার দেওয়া দরকার। রহস্য প্লাস রহস্য, দু'জনের রসায়ন যেন এক হয়ে গেল। শার্টটা খুলে সোফায় রেখে পাশে র রুমে ঢুকলেন। ক্যামেরাটা এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। নিয়ে যান। কাজ করেন। আমার যখন দরকার হবে দিয়ে

যাবেন। গ্রিন রোডে আমার পরিচিত একটা স্টুডিওর ঠিকানা তাঁকে দিলাম। আর আমি পরম মমতায় হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার যে ওয়ান টোয়েন্টি ইয়াসিকা ক্যামেরা ছিল সেটি ওই সময় একটি স্টুডিওর মালিককে ধার দিয়েছিলাম, গভীর রাতে দোকানের তালা ভেঙে স্টুডিওর কিছু জিনিস চুরি হয়ে যায়। তার মধ্যে আমার ক্যামেরাটিও ছিল। তখন ক্যামেরাবিহীন অবস্থায় হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা আমার একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিদিনই ছবি তুলতে হ য়, কাজেই নিজস্ব ক্যামেরা থাকা জরুরি। আরেকজনের ক্যামেরা একনাগাড়ে কতদিনইবা আটকে রাখা যায়। ক্যামেরার কারণে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁর বাসায় আমাকে যেতে হয়। ক্যামেরা দিয়ে আসার পরই আবার সেটির খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি বিরক্ত হতে পারেন এই ভেবে, শঙ্কিতও থাকতে হতো। সেই সময়ে প্রচুর কাজ করি_ যে কোনো সময় ক্যামেরা দিয়ে দিতে হবে ভেবে অস্থির আমি প্রতিদিন ছয়-সাতজনের পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করি। সে সময় বিখ্যাত এক লেখকের ছবি তুলতে গিয়ে কথাচ্ছলে বলেছিলাম , এটি হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা। তারপর হঠাৎ তিনি অপ্রীতিকর মন্তব্য করে বসলেন এবং আমাকে ছবি তুলতে দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলেন। পরে তাকে অনুরোধ করে ছবি তুলেছিলাম আমি। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর জাতীয় দৈনিকে প্রশংসা করে একটি লেখাও লিখেছেন তিনি।

মেধাবী মানুষের হাজারো মুখভঙ্গি এবং মুহূর্ত নিয়ে আমার কারবার। খ্যাতিমান এসব মানুষ কীভাবে বদল হয়ে যায় তা ধরে রাখা আছে আমার পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির ভাষায়। আনন্দ-বেদনার যে ডায়রি আমি লিখে যাচ্ছি ৪০ বছর তাতে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তাদের ব্যক্তি জীবন যে রূপায়িত হয়েছে তা নিয়ে সেই সাবেকি আমলে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে গল্প হতো আমার, তবে সেই গল্প আড্ডায় পরিণত হতো না। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন বা আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলাম এমন অজুহাত অন্তত দাঁড় করব না। তবে রহস্য _ আমিও তার মতো রহস্যপুরের বাসিন্দা। আমার তোলা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোকচিত্রগুলো যে বাংলাদেশে এক নতুন প্রান্তরে প্রবেশ করেছে একথা জানা ছিল তাঁর। আমার সাদা-কালো ছবির রহস্যময়তা তাঁকে মুগ্ধ করত_ এ কথা অনেককে বলেছেন তিনি।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে শামসুর রাহমান , আল মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন কবির সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার স্মরণীয় সুযোগ আসে আমার। আমার তখন একটি ক্যামেরা। আরেকটি ক্যামেরা হলে যুৎসই হয় , হুমায়ূন ভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। কলকাতায় তাঁর ক্যামেরা নিয়ে যাব! বললাম না। তখনও তিনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে জানেন না। জানতেন একজন আলোকচিত্রশিল্পী বলে, এমনকি ঠিকানাও জানা ছিল না আমার। তার পারিবারিক কেউ চিনতেন না আমাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি চেয়ারের ওপর পা রেখে ব্লেড দিয়ে হাতের নখ কাটছেন। তাঁর টেবিলের ওপর ফুলদানিতে পাতাসমেত কাঁচা তেতুল! তেঁতুলের ভারে নিচের দিকে ঝুলে আছে। রহস্যটি দারুণ আকর্ষণ করল। আমি সেই দৃশ্য

দেখে ক্যামেরার কথা প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। অধ্যাপক আহমেদ বেশ চেষ্টা চালালেন পায়ের নখগুলো কাটতে, ব্লেডের ধারে কুলায়নি। ক্যামেরাটি পেলে আমার উপকার হয় বললাম। জানতে চাইলেন আধাঘণ্টা সময় আমার হবে কি-না। বলি, অনেক সময় আছে। আমাকে বসতে বলে চলে গেলেন কোথাও। ঠিক আধাঘণ্টা পর ক্যামেরা হাতে ফিরে এলেন তিনি। আমার মনে হলো এ সময়ের মধ্যে বাসায় গিয়েছিলেন তিনি দুর্লভ বস্তুটি আনতে। এতক্ষণে তা এনে আমার হাতে দিলেন। তাঁর ক্লাস আছে জেনে আমিও চলে এলাম সেদিনকার মতো ক্যামেরা হাতে।

আমার হাতের ক্যামেরাটি চলে গেল কলকাতায়। শিয়ালদাহ স্টেশনে নামলাম আমরা। স্টেশনের বাইরে আসতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাদের কবি শামসুর রাহমানকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় হুমায়ূন আহমেদের ক্যামেরা সচল হয়ে ওঠে। এই প্রথম কলকাতায়! অনেক লেখকের ছবি তুলব _ আমার আনন্দে উচ্ছ্বাসিত আমি নিজেই। ভুলে গেলাম যে ক্যামেরাটি আরেকজনের। বিশপ লেফ্রয় স্ট্রিটে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে গেলাম। তারপর সুনীল , অরূণ মিত্র, সমরেশ বসু... আরও কত কে বন্দি হতে থাকে আমার সাটারের চাপে। শিকারি যেমন তাক্ করে থাকেন তার লক্ষ্যের দিকে আমিও তেমনি ফোকাস করে থাকি কলকতার বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের মুখে। সঠিক সময়ে বন্দি করি তাদের রহস্য _ ঘনীভূত সব চরিত্র আলো-ছায়ার ফ্রেমে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি সেই শতবর্ষীয়ান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্রনাথের এক সময়ের সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী জীবন সায়াহ্নে প্রায় অচল। হুইল চেয়ার ঠেলে তাকে নিয়ে এলেন স্ত্রী হৈমন্তী_ চলচ্চিত্রের মতো সব দৃশ্য রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে আমার হাতের ইশারায়। ক্যামেরাটিকে আমার একান্তই নিজের সম্পত্তি মনে হলো। ভুলে গেলাম হুমায়ূন আহমেদের কথা।

ঢাকায় ফিরে এসে প্রায় দুই মাস ৩৫ এমএম নাইকন ক্যামেরা দিয়ে অজস্র বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি তুললাম। কলকাতা যাওয়ার পর আমার এমন একটা মায়া জন্মালো যে, ক্রমেই ক্যামেরাটি আমার মনে হতে লাগল। ততদিনে মেধাবী মানুষের মায়াবী মুখ পাঠ করে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে ক্যামেরাটি। সে আমার দক্ষ পরিচালনায় ভালই এগিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখলাম যন্ত্রটি আমার পোষা হয়ে গেছে। আমি কী চাই বুঝতে পারে সে। বের করে নিয়ে আসে খ্যাতিমানদের মনের গহিন অরণ্যের ঠিকানা। এমন সময় বাংলাদেশ ডাক বিভাগের খামে চিঠি আসে গ্রিন রোডের সেই ঠিকানায়_

প্রিয়বরেষু,

আমার ক্যামেরাটি প্রয়োজন। তুমি কি কষ্ট করে এসে দিয়ে যেতে পারবে...।

স্বাক্ষর

হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূননামা
শওকত আলী

হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে জানেন না এমন কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। তাকে সবাই চেনেন, নানান ভাবেই চেনেন। এটাই তার শক্তি। তার সম্পর্কে নতুন করে বলার তেমন কিছুই নেই। তার বিশাল সৃষ্টিজগৎ নানাভাবে তার কথাই বলে, তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে। বিপুল এক সৃজনশীলতার ভাণ্ডার যেন এই হুমায়ূন। তাকে নিয়ে বলতে যাবার আগে, এই মুহূর্তে কেবল এ কথাটাই মনের মধ্যে বেদনার সঞ্চার করে চলেছে যে, হুমায়ূন আজ এইসব বলা না বলার ঊধর্্বে অন্য এক জগতের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। তার এ নতুন যাত্রায় শোকস্তব্ধ সারা দেশ। পত্র -পত্রিকা, টেলিভিশনে দেখেছি কি বিশাল মানুষের ঢল! সবাই প্রিয় লেখককে শেষবারের মতো দেখতে এসেছে। তাকে বিদায় জানাতে এসেছে।

এমন প্রাণঢালা ভালোবাসা ক'জন লেখক পায়? হুমায়ূন পেয়েছে। কারণ হুমায়ূন আহমেদ কেবলমাত্র তার লেখা দিয়েই হুমায়ূন আহমেদ নন। হুমায়ূন আহমেদের বহুমাত্রিকতা অবিস্মরণীয়।

আমাদের পরিচিত জগতটার পাশাপাশি লেখালেখি দিয়ে রীতিমতো ভিন্ন আরেক ভুবন নির্মাণ করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। সে জগতের ভাষা ভিন্ন, অন্যরকম তার চরিত্রগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ। আমাদের পরিচিত বিষয়-আসয় এবং তৎসংক্রান্ত আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে। আর পাঠক সে জগতে ভ্রমণ করতে নামার পরের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের জানা। অদ্ভুদ এক জাদুময়তায় যেন বাঁধা, সে জগতের সবকিছু। মোহগ্রস্ত হয়ে লাখে লাখে মানুষ পড়েছে হুমায়ূনকে। তার চিত্রিত চরিত্রগুলোকে। কখনও কখনও হয়তো এই মোহ কেটে যেতে সময় লাগেনি। আবার জীবনব্যাপী গভীর বিশ্বাসও সৃষ্টি করেছে কারও কারও মনে। তাই তো হুমায়ূনকে শ্রদ্ধা জানাতে শুধু তরুণ-তরুণীরাই আসেনি, অঝোরে কেঁদেছেন প্রবীণরাও। শুনেছি হুমায়ূন জাদু দেখাতে পারত_ কান থেকে পয়সা বের করা, মুহূর্তে চোখের সামনে রুমাল উধাও করে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটাতো অহরহ। কিন্তু বাংলার মানুষের হৃদয় জয়ের অসাধারণ এক জাদু কী অবলীলায় দেখিয়ে নিজেই উধাও হয়ে গেল।

কলকাতা যখন বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র, যখন বাংলা সাহিত্যের চর্চা এবং পঠন-পাঠন অনেকটা কলকাতা নির্ভর। সে সময় বাংলাদেশে বাংলাদেশি লেখকের পাঠক সৃষ্টির যে দৃষ্টান্ত হুমায়ূন দেখিয়ে গেছে এবং নিজের স্বতন্ত্র শক্তি দিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত পাঠকদের এ তুমুল জোয়ার প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে শহীদ মিনার পর্যন্ত_ এটা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে কোনো বড় জাদুকেও হার মানায়। তার সে জাদু এত ই

সম্মোহনী শক্তি সম্পন্ন যে, পাঠকের সে জোয়ার একইভাবে বয়ে যাবে আগামী দিনগুলোতেও। তার সৃষ্টি জগতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত থাকবে।

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের নতুন যুগটাই যেন শুরু হয়েছিল এই হুমায়ূন আহমেদের মাধ্যমে। বইমেলার জমজমাট আয়োজনের পেছনেও হুমায়ূনের হাত থাকত প্রতিবছর। জনপ্রিয়তার নতুন ভিন্ন এক সূত্র , নতুন এক উদাহরণ হয়ে হুমায়ূন দেখিয়ে গেছে পাঠক কীভাবে তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে তার ক্ষমতা চোখ বন্ধ করে বলা যায় অভূতপূর্ব। এ ক্ষমতা সবার থাকে না। সেই সঙ্গে নাটক চলচ্চিত্রে জনপ্রিয়তার এমন মাত্রাও আমাদেরকে হুমায়ূনের আগে দেখাতে পারেনি কেউ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্রে নিজের মতো একটা পৃথিবী বানিয়ে, অদৃশ্য এক বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে সেই পৃথিবীর দিকে ধাবিত করত হুমায়ূন। সত্যিই গল্পের সেই হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাই যেন হুমায়ূন। টেলিভিশন নাটকে তার সৃষ্ট চরিত্রের ফাঁসি যেন না হয়, তার জন্যে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় মিছিলও হয়েছে। এমন অদ্ভুত জাদুশক্তি না থাকলে তো তার বাঁশিতে পাগল হয়ে উঠত না মানুষ।

আর সাহিত্যগুণের বিচার হুমায়ূনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিত্তির ওপর দ্বারায়। তার লেখালেখির উদ্দেশ্য এবং সুরটাই অন্য এক সূত্র ধরে হাঁটে। বাংলাদেশের সমাজ জীব নকে যেমনভাবে সে দেখেছে, তেমনিভাবে তাকে উপস্থিত করেছে। দেখা যাবে, সে যা তুলে ধরেছে তার লেখায় , তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার দেখার ভঙ্গি, উপস্থাপনের ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে এই চেনা জগৎ ও পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যে, তাদের কথার মধ্যে আমরা নতুনত্ব খুঁজে পাই, নতুন এক ধরনের আনন্দ-বিষাদের দোলায় দুলতে থাকি। এই দুলুনিই হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি।

সত্তরের দশকে যখন সদ্য লেখালেখি শুরু করেছে হুমায়ূন_ তখন ওর সাথে একবার দেখা হয়েছিল। তখন থেকেই দেখেছি কেমন অদ্ভুত ধরনের এই ছেলেটি। খুব ভদ্র আর শান্তশিষ্ট একটা ছেলে। বি শ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক, আবার লেখালেখি করছে। প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' ইতিমধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে, সেই সঙ্গে জানান দিয়েছে হুমায়ূনের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্ভাবনা।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিল অনেকদিন। পত্রিকা ও টেলিভিশন মারফত তার শারীরিক উন্নতি অবনতির খবর পেতাম। অপারেশনের আগে সর্বশেষ দেশে আসার পর, টিভিতে একদিন কথা বলতে দেখলাম হুমায়ূনকে। দেখে মনেই হয়নি এত বড় একটা রোগে আক্রান্ত এ মানুষটা। একেবারেই স্বাভাবিক এবং সাবলীল। ঠিক যেন তার লেখার মতই_ সহজ পঠনের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি। কিন্তু এই স্বাভাবিক মানুষটা অস্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসল।

হুমায়ূনের এ মৃত্যু পুরোপুরি অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের অগণিত ভক্ত , শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুদের আকাঙ্ক্ষায় ছিল সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে হুমায়ূন। আবার লেখা শুরু করবে প্রিয় লেখক। আবার জেগে উঠবে হুমায়ূনের চরিত্রগুলো। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক উল্টো। হুমায়ূন ফিরে এলো। কিন্তু চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে। তার কলম থেকে আর কোনো অক্ষর বেরোবে না। বইমেলায় তার নতুন বইয়ের খোঁজ আর করবে না কেউ।

যে ভুবনে প্রবেশ করেছে হুমায়ূন, তা থেকে ফেরার কোনো পথ নেই। কিন্তু যে ভুবন সে নির্মাণ করে গেছে, আপন মনের খামখেয়ালিপনার অন্তরালে_ সেখানে যাতায়াতের অধিকার সবার। নিজের সে ভুবনেই স্বতন্ত্র মহিমায় জেগে থাকবে বাংলার হুমায়ূন।

আনন্দ, বেঁচে থাকা, নিয়তি এবং হুমায়ূন আহমেদ
মাহবুব আজীজ

এদেশের অগণিত পাঠক-অনুরাগীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ আকস্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করলেন।

আপনি হয়তো আমার কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছেন। হুমায়ুন আহমেদের ক্যান্সার হয়েছিল; তাকে ১২টি কেমো দিতে হয়েছে; ক্যান্সার প্রাণঘাতী অসুখ, উপরন্তু সবাই জানে, তার ক্যান্সার শরীরের বেশকিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মৃত্যু তবে আকস্মিক কেন ?_ এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হুমায়ূনের লেখার সঙ্গে, তার চিন্তা-দর্শনের সঙ্গে, তার জীবনযাপনের সঙ্গে, তার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যারা গভীরভাবে পরিচিত, অবশ্যই তাদের কাছে এই মৃত্যু তীব্র আকস্মিক এবং হুমায়ূন আহমেদের এই অকাল মৃত্যু নিঃসন্দেহে নানা প্রশ্ন ও উত্তর সঞ্চারী।

২. হুমায়ূন আহমেদের লেখার গুণপনা সম্পর্কে এদেশের মোটামুটি শিক্ষিত জন থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের লেখক-বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সবাই কমবেশি জানেন। মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুণ _ কে না জানেন যে, হুমায়ূনের লেখায় আছে চুম্বক টান। একবার শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তার ছোট ছোট বাক্যে থাকে হীরক দ্যুতি, আছে তুলনারহিত রসবোধ। কয়েকটি মাত্র বাক্যে তিনি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আবার এ -ও সত্য যে, লেখক জীবনের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু অভিযোগ হুমায়ূন আহমেদের পিছু ধাওয়া করেছে। তিনি অগভীর , তার লেখায় চিন্তার ছাপ কম, সাহিত্যকে তিনি বিনোদনে রূপান্তরিত করেছেন, একই চরিত্ররা ঘুরেফিরে তার লেখায় বারবার আসে। বর্ণনার বদলে তিনি সংলাপ লিখছেন, সাহিত্যকে তিনি টিভি-সিনেমার স্ক্রিপ্ট বানিয়ে ফেলছেন! মধ্যবিত্তকে তিনি এক ধরনের

ফ্যান্টাসি বা কাল্পনিক স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। নানা রঙের বুদ্ধিজীবী -সাহিত্যিক সুযোগ পেলেই তার লেখাকে নিমেষে 'বালক পাঠ্য' হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন।

আপামর পাঠকের চূড়ান্ত অনুমোদনই হুমায়ূনকে বারবার সমালোচকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। লেখকটি এত জনপ্রিয়; তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে সারবত্তা সংক্রান্ত ঝামেলা আছে; লক্ষ লক্ষ মানুষ তার বই পড়ছে, জনরুচিকে যিনি সন্তুষ্ট করেন, তিনি উত্তম লেখক হন কী করে? হুমায়ূনের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা বরাবর তার এক শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

হুমায়ূন গভীরভাবে পাঠ করলে, প্রথম গ্রন্থ 'নন্দিত নরকে' [১৯৭২] থেকে সর্বশেষ 'নিউইয়র্কের আকাশে ঝকঝকে রোদ' [২০১২]_ তিনশ'রও অধিক গ্রন্থ, সংকলনসহ আরও পঞ্চাশঅধিক; পূর্ব কোনো রাগ-অনুরাগ না রেখে নিবিষ্ট মনে কেবল পাঠ করলে এই রচনারাজির যে কোনোটিতে স্পষ্ট দেখা মেলে এমন এক লেখক, যিনি জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবেন, জীবনের অন্বিষ্ট খোঁজেন,মানুষের চরিত্রের আলো-অন্ধকার সম্পর্কে যার ধারণা স্পষ্ট, মানুষের জীবনযাপনকে যিনি অসীম মমতা ও ভালোবাসায় নিজের কলমে ধারণ করেন। সত্য, হুমায়ূনের কিছু চরিত্র একাধিক গ্রন্থে পুনরাবৃত হয়েছে , তার লেখায় সংলাপ সচরাচর প্রাধান্য পেয়েছে । এ-ও সত্য, তার গল্পে মধ্যবিত্তের ফ্যান্টাসি বা কল্পনার জগৎ প্রায়ই উপস্থিত হয়েছে। এখন, হুমায়ূন স্বয়ং বাঙালি চিরকেলে এক মধ্যবিত্ত সমাজউদ্ভূত; তিনি তার চেনা জগৎ নিয়ে লিখবেন_ এ আর বিচিত্র কী? কিন্তু বিভ্রাট হচ্ছে, হুমায়ূনের বিপুল রচনাসম্ভার যে কত বিচিত্রমুখী , তার প্রকৃত সংবাদ 'সমালোচনাকারী'দের কেউই রাখেন না। সামান্য একটি পিপীলিকা থেকে মনুষ্য 'কবর', দুর্ধর্ষ খুনি কিংবা গড়পরতা মানুষ , যাকে ভালো বা মন্দ বা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর মধ্যেই আটকে রাখা যায় না_ এ সবই হুমায়ূনের লেখার বিষয় হয়েছে। উপন্যাস 'ফেরা', 'এই বসন্তে', '১৯৭১' কিংবা তার বহু ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষ নানা রঙে উপস্থিত। আর মধ্যবিত্তের স্বপ্ন _ 'মৃত্যুর হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?' মহান লেখকরাই তো পারেন কেবল স্বপ্ন দেখাতে। অবশ্য এই সত্য আমরা কয়জনই শনাক্ত করি যে, হুমায়ূন তার প্রথম রচনাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন_ নায়কমাত্রই 'মহামানব' গোত্রের ; সে পাপ-তাপের ঊধর্্বে। আর ভিলেন হবে সকল কুকর্মের হোতা _ এ'রকম সরল ধারণায় তিনি বিশ্বাস করেন না। হুমায়ূনের চরিত্রেরা 'মানুষ'; ভালো-মন্দের মিশেলে 'মানুষ'; পাপে-তাপে-পুণ্যে একাকার 'মানুষ'। তাই তার প্রথম গ্রন্থ 'নন্দিত নরকে'তে মন্টুকে খুন করে ফাঁসিতে যেতে হয়। পরবর্তীতে 'দ্বৈরথ'-এর চরম প্রতারকটিও ব্যাকুল হয় দয়িতার জন্য। নিষ্ঠুর প্রতারকের জন্যও পাঠক হিসেবে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়_ পাঠক হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী হবে; আমরা কি প্রতারকের পক্ষেই যাব তবে; আমাদের বড় বিপদে ফেলে দেন লেখক। সমাজে যে সত্য আমরা শিখেছি, তা যেন ভেঙে যেতে থাকে; 'একজন ক্রীতদাস' গল্পের উচ্চাভিলাষী মেয়েটিও ছুড়ে ফেলা প্রেমিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়। স্বার্থের সিড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চাওয়া নিষ্ঠুর মেয়েটির জন্যও কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায় আমাদের। মানুষ যে কেবল

'সাদা' আর 'কালো'তে দ্বিধাবিভক্ত নয়; এ দুয়ের মধ্যে মানুষের মধ্যেই আছে অনেক রঙ ; ভালো-মন্দের এ এক আশ্চর্য মিশেল_ হুমায়ূনের মতো এত নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিকভাবে আর কোন লেখক এ সত্য প্রকাশ করেছেন?

আর হুমায়ুনের রহস্য জগৎ? 'দেবী', 'নিশীথিনী' থেকে শুরু করে তার রচনাবলির একটি বড় অংশ ভয়-ভূত-রহস্যের গা ছমছমানো অধ্যায়। মিসির আলীর মতো তুখোড় মনস্তাত্ত্বিক মনের আলো -আঁধারির খোঁজই শুধু দেন না; একই সঙ্গে জানিয়ে দেন_ এর লেখকও বাঙালির মন ও মনস্তত্ত্বের এক সুদক্ষ কারিগর।

সায়েন্স ফিকশন, পরাবাস্তবতার গল্পে হুমায়ূনের কল্পনাশক্তি আর গল্প বুননের দক্ষতার অসাধারণ প্রকাশ। মনে করুন, হুমায়ূনের 'অনন্ত নক্ষত্র বীথি' কিংবা 'ইরিনা'র কথা। একটি মানুষ আয়ুর অসীমতার মধ্যে ঢুকে গেছে কিংবা 'ইরিনা'র সেই অবিস্মরণীয় পৃথিবী ধ্বংসের পরবর্তী সময়ের গল্প। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের সমাজ কাঠামো ; মানুষের কাজ ও বেঁচে থাকার এক আসামান্য ব্যাখা।

আর মুক্তিযুদ্ধ? উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি', 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'সৌরভ', 'নির্বাসন' আর তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের পর গল্পে এই কথক আমাদের সবচেয়ে সুখ আর তীব্র দুঃখের সময়কে তুলে ধরেন আসামান্য এক নৈর্ব্যক্তিক-মায়াময় দৃষ্টিতে।

৩. নিশ্চিত যে, হুমায়ূনের লেখার মধ্যেই তার প্রখর বুদ্ধি , নিবিড় পাঠাভ্যাস আর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। হুমায়ূনকে আরও একটু নিবিড় পাঠে বোঝা যাবে , এতে আছে আশ্চর্য এক দার্শনিকতা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখক হুমায়ূনের নিজস্ব ব্যাখ্যা। 'নিজের আনন্দের জন্যেই লিখি'_ বারবার তিনি জানিয়েছেন পাঠকদের। বলেছেন- 'ভেবে চিন্তে লিখি না'! মুশকিল হয়েছে, তার অনবদ্য রসিকতার ফাঁদ অনেক সময়ই 'গম্ভীর' পাঠকদের চোখ ও মনন এড়িয়ে গেছে। হুমায়ূনের গ্রন্থমাত্রেই আছে বিবরণে আশ্চর্য এক নির্লিপ্ততা, আছে এমন কোনো না কোনো চরিত্র, যে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, হয়তো রসিকতার ছলে, হয়তো তা কখনও মাত্রই একটি বাক্যে, হয়তো সেই গ্রন্থটির আয়তন নিতান্ত সামান্য; কিন্তু জীবনের গাঢ় আনন্দ যে মাত্র ৭০/৮০ পৃষ্ঠাতেই প্রায়শ ধরে দিচ্ছেন হুমায়ূন। সেখানে থাকছে জীবন সম্পর্কে তার স্পষ্ট একটি ধারণার বিবিধ প্রকাশ_ একটিই জীবন, একে আনন্দের সঙ্গে যাপন করা উচিত! আর জীবনের এই আনন্দের খোঁজে তার চরিত্রেরা কত না জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পর!

আর প্রকৃতি? বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই আসক্তি হুমায়ূন আহমেদের। জ্যোৎস্না , বৃষ্টি, রোদ...ঋতুতে ঋতুতে উদ্বেল হয়েছেন তিনি। প্রখর রোদে তার চরিত্রেরা খালি পায়ে হাঁটছে _এ শুধু

মধ্যবিত্তের কল্পনাবিলাস নয়; বিপুলা এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দকে নিজের মতো উদযাপন করাও বটে। গম্ভীর পাঠকদের দৃষ্টিতে হুমায়ূনের এই দর্শন এড়িয়ে গলেও বাঙালি সনাতন পাঠকদের মনের মুক্তিতে এই দর্শন জাদুর মতোই কাজ করেছে। তাই হিমুর প্রতি বাঙালির এই প্রেম। জীবনের খাঁচায় পোরা কোনো মানুষ না চায় বন্ধন ভেঙে অপাপবিদ্ধ শৈশবে-তারুণ্যে ফিরতে বা নিজের ইচ্ছে মতো জীবনটি যাপন করতে? হিমুসহ হুমায়ূনের অনেক চরিত্রই বাঙালিকে সেই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় জীবনে নিয়ে যায়। এই ঘোর বেঁচে থাকার ঘোর। এর মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত এক দার্শনিকতা, যার মূল ভিত্তি আনন্দের সঙ্গে বাঁচা।

৪. হ্যাঁ, আনন্দের সঙ্গে বাঁচা_ বাক্যটিতেই একটি হাহাকার উহ্য আছে। আমরা এখন টের পাই_ বাঁচবই না তো একদিন...তাই হাতে যে ক'টি দিন আছে আনন্দ নিয়ে বাঁচি। হুমায়ূন জানতেনই, মানুষের নিয়তি এই-ই...নিঃশেষ হয়ে যাওয়া! তবে বরাবর তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন; যেমন লেখায়, তেমন তার জীবনযাপনে। অভিযোগের তীর ছুড়ে চলেছেন গম্ভীর বিদ্বানরা ; তিনি ভ্রুক্ষেপও করেননি। লিখে গেছেন নিজের মতো করে, যেমনটি তিনি চান; প্রচণ্ড প্রাণশক্তির সঙ্গে নিজের লেখার ইতিবাচকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তার। তাই তার যে কোনো লেখায় জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায়, নাক সিটকে, খুঁতখুঁত করে, জীবনের প্রতি নানা বিতৃষ্ণা-অভিযোগ প্রকাশ করে বেঁচে থাকতে চান না তিনি। সেটিও তার লেখাতেই স্পষ্ট হয় গ্রন্থ থেকে গ্রন্থে। এই ধুলোময় পৃথিবীর সামান্য ধুলোকণাটিও অতি চমৎকার। ওতেও আছে বেঁচে থাকার স্বাদ _ এমন স্বাস্থ্যবান আহ্বান হুমায়ূনের লেখার অন্তর্মূলে ; এই আহ্বান আমাদের মর্মমূল ছুঁয়ে যায়।

৫. এমন যার লেখায় আহ্বান ও দার্শনিক ভিত্তি; ব্যক্তিজীবনে তিনি যে জীবনের আনন্দে পূর্ণ এক মানুষ হবেন_ এ আর বিচিত্র কী! হুমায়ূন তাই ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা টগবগে এক মানুষ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করি তবে।

গত দেড় দশকে নানাভাবে ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ। তার আগে তো আশৈশব লেখক হিসেবে তিনি আর সবার মতো আমার কাছেও প্রিয় ও পরিচিত ছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন আপাত গম্ভীর, বেশ অহঙ্কারীও বটে। সহজে কারও সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ কথা বলেন না। কাটা কাটা কথা বলেন। 'হ্যাঁ', 'না', 'আচ্ছা', 'পরে আস'...বলা যায়, শুরুতে বেশ ভালো রকমের অহঙ্কারী মানুষ-ই মনে হয়েছিল তাকে। কিন্তু ক্রমশ দেখি, লেখায় যেমন তিনি অকপট সুরসিক , কথাতেও তাই। আরও অনেকের মতো আমিও তাকে 'স্যার' বলেই ডাকতে শুরু করি। পছন্দমতো সঙ্গী পেলে হুমায়ূন স্যারের মতো অনর্গল রসিকতাময় কথা বলার অসামান্য ক্ষমতা এই জীবনে আমি আর দেখিনি। আর তার আত্মবিশ্বাস। যেমন তার লেখাপড়ার জোর, তেমন তার মনের জোর। অবিশ্বাস্য তার পড়াশোনার

পরিধি। বলতেন, ' আমি যা পড়ি, মন দিয়েই পড়ি। রবীন্দ্রনাথ পুরোটা আমার নিখুঁতভাবে পড়া। তার প্রতিটি লাইন আমার পড়া।'

একবার স্যারকে ধরলাম_ বড় একটা ইন্টারভিউ নেব। সময় দেন।

- কী আবার ইন্টারভিউ নিবা! এতগুলো বই লিখলাম। আমার সব কথা ওতেই বলা আছে। পড়ে নাও। তারপর যা ইচ্ছা লিখে দাও।

- স্যার, জীবনমরণ সমস্যা। ইন্টারভিউ লাগবেই...

এরপর ঘুরতেই থাকি। তিনি এটা -ওটা অনেক কথা বলেন কিন্তু ইন্টারভিউটি দেন না। আনুষ্ঠানিক কথা বলার চেষ্টা করলেই বলেন, বই পড়ে লিখে দাও।

তো এভাবে কিছুদিন চলার পর এক সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায় ডেকে নিয়ে বললেন

_তোমার সমস্যাটা কী?

_স্যার, কিছু প্রশ্ন ছিল।

_আচ্ছা চলো আমার পড়ার ঘরে। দেখি কত প্রশ্ন করতে পারো।

গেলাম তার পড়ার ঘরে। সন্ধ্যা ৭টা বাজে। শুরু হলো তার সঙ্গে কথা;চলল রাত ১টা পর্যন্ত। সেদিন অনর্গল কথা বলেছিলেন তিনি_ লেখা নিয়ে, জীবনযাপন নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে। কথায় কথায় স্পষ্ট হচ্ছিল তার আত্মবিশ্বাস, নিজের লেখার প্রতি নিবিড় শ্রম আর আনন্দময় জীবনযাপনের কথা।

_দেখো... আমি গতকাল নিয়ে বাঁচি না। আগামীকাল কী হবে, আমার মৃত্যুর পর আমার লেখা কে পড়লো কে পড়লো না, তা নিয়েও আমি ভাবি না। আমি আমার নিজের মতো করে লিখে যাচ্ছি। প্রবল আনন্দ নিয়েই লিখছি। জীবনটাও খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটাতে চাইছি। এবং আমি সুখী। কারণ , আমি জানি, কীভাবে সুখ খুঁজে নিতে হয়...

আত্মবিশ্বাসী হুমায়ূন বলে চলছিলেন...এক পর্যায়ে বললেন-

_টেপ রেকর্ডার বন্ধ কর। এখন যা বলব, তা ইন্টারভিউয়ের অংশ না।

আমি টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলাম।

_শোনো। দেখে তো লেখক বলেই মনে হয়; আর যা-ই কর, নিজের সংসার ভেঙে কিছু করো না....

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। সমানে সিগারেট টেনে চললেন।

বলা যায়, সেই শুরু। সেই ৬ ঘণ্টার কথোপকথনের পর স্যারের সঙ্গে আমার এক ধারাবাহিক নিবিড় ও অনেকটাই 'নীরব' কথোপথন ও মাঝেমধ্যেই 'দেখা হওয়া' শুরু হয়। কখনও দখিন হাওয়া, কখনও নুহাশ পল্লী...দেখি, সন্ধ্যায় স্যারের নিজ ভুবনে আড্ডার তুমুল ঝড়। স্যার-ই মূলত কথক, অন্যেরা শ্রোতা। মাঝে মাঝে নিজে ডেকে জানতে চাইতেন_ তরুণ কে কী লিখছেন, ফেসবুক-অনলাইনে লেখালেখির ব্যাপারটা কী? নতুন গল্পকারের অবস্থা কী? কোনো একটি লেখা তৈরি হলে নিজের ঘরে বসে সবাইকে পড়ে শোনানো, পড়তে পড়তে স্যারের কান্না-হাসি, আর কথা আর হাসি আর হাসি!

আমরা জানতাম, এই শহরে এক রাজার মতো মানুষ আছেন, যিনি পারতপক্ষে কোথাও যান না, কিন্তু সব বার্তা, মানুষের সব অনুভূতির প্রথম খবরটিই যেন তার কাছে কীভাবে যেন পৌঁছে যায়! ব্যক্তি হুমায়ূন মানেই যেন একগুচ্ছ নির্মল আনন্দের সমষ্টি। ইচ্ছে হলো 'কিছু একটা করবেন', আর তা যদি থাকে তার সামর্থ্যের মধ্যে, তা তিনি করেই ছাড়বেন।

আমরা এ-ও জানতাম, আর সবার বয়স বাড়ে; হুমায়ূন আহমেদের বয়স বাড়ে না। চিরতরুণ বলে যে কথাটি বই-পুস্তকে আছে, তার বাস্তব প্রমাণ হুমায়ূন আহমেদ। হয়তো জীবনের প্রতি তার আকুলতা আর চিরতারুণ্যই তাকে সবার মতের বিরুদ্ধে বহুল বিতর্কিত দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনায় জড়িয়েছে। শাওনকে গভীরভাবে ভালোবেসেই তিনি এই বিয়ে করেন। এর মাধ্যমে আরও একবার বোঝা যায়_ জীবনের কাছ থেকে তিনি যা চান, তা বুঝেও নিতে পারেন। প্রবল নিয়তিও যেন তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শেষ বেলায় যারাই স্যারকে কাছ থেকে দেখেছেন, কী প্রবল আকুলতায় তিনি দুই শিশুপুত্র নিষাদ ও নিনিতকে আঁকড়ে ধরে রাখতেন! একই রকম আকুলতা বোধ করতেন প্রথম চার সন্তানের জন্যও ; কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লেখক কারও কাছেই নিজের মনের দৈন্য প্রকাশ করতে চাইতেন না।

তার পরিবারের মধ্যে বিভক্তি তাকে দুঃখ দিত। এর জন্য নিজের দায়ও ভালোই বুঝতেন তিনি। কিন্তু ওই যে নিয়তি, যার কথা নানাভাবে লিখেছেন নিজের রচনায় জীবনভর, নিয়তিই তাকে বারবার ঠেলে দিয়েছে নানা বিষাদময় অভিজ্ঞতার ভেতরে। অসম্ভব মনের জোরে শেষ কয়েকটি বছর নিজের গড়ে তোলা একান্ত ভুবনে লেখালেখি, গান, নাটক , সিনেমা, শাওন, নিষাদ, নিনিত, কয়েকজন মাত্র বন্ধু নিয়ে নিজের ভাষায় 'গর্তজীবী ছিলেন তিনি। তবে এটা তার ভালোই জানা ছিল যে, দেশের অযুত ভক্ত তাকে সর্বান্তঃরণে ভালোবাসে। তাদের জন্য লিখতে হবে, কোনো লেখাই খারাপ হওয়া যাবে না। দারুণ সতর্ক ছিলেন তিনি এ ব্যাপারে।

আর তার আপন ভুবন ছিল নুহাশ পল্লী। একবার নুহাশ পল্লীর সদর দরজা পেরুলেই চোখের সামনে যে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চোখে পড়বে , তাতেই বোঝা যাবে_ এর নির্মাতার ভেতরটা কত সবুজ আর স্বপ্নময়!

৬. হুমায়ূনের প্রবল প্রাণশক্তি, তারুণ্যদীপ্ত কথোপকথন আর আগামী কাজের প্রতি অসম্ভর আকর্ষণ আশেপাশের সবাইকে তো বটেই, তার অগণিত পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছিল _ ক্যান্সারের কামড়ে সহজে মরবার পাত্র নন তিনি। বারবার বলেছেনও এই কথা। গত ১০ মে যখন এলেন দেশে, চিকিৎসার বিরতিতে তিন সপ্তাহের জন্য; বিমানবন্দর থেকে শুরু করে দখিন হাওয়া বা নুহাশ পল্লী ; যেখানেই দেখা হয়েছে; দেখেছি, টগবগ করে ফুটছেন এক কথাশিল্পী, যিনি তরুণের প্রবল প্রতিযোগী, যিনি বেঁচে থাকতে চান, যিনি জ্যোৎস্নায় ভিজতে চান, বৃষ্টিতে অবগাহন করতে চান, সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চান। কী দৃপ্ত তার কথার ভঙ্গি, কাউকে মন ভোলানোর জন্য যিনি বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলতে রাজি নন! কী অকৃত্রিম স্পষ্ট, ঝকঝকে মুখ। আর কী তুলনারহিত রসিকতা ; বললেন, আত্মীয়স্বজনরা তাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া দরুদ পড়ে ফু দিচ্ছেন। বললেন, 'ক্যান্সারে তো মরবো না, তবে নিউমোনিয়ায় মরে যাবো নির্ঘ্যাৎ।'...তার সম্ভাব্য মৃত্য নিয়েও আশ্চর্য সব রসিকতা!

সব শুভকামনা, সব আর্তি পেরিয়ে নিয়তির সামনে থেমে যেতেই হলো হুমায়ূন আহমেদকে। মানুষের আয়ুর একটি সীমা আছে। নিয়তি নির্ধারিত সেই সীমায় আমাদের সবাইকে থামতে হয়, থামতে হবে। তবে তার ৩৬২টি গ্রন্থ আর নুহাশ পল্লীর অবারিত সবুজ তার মৃত্যুকে নিশ্চিতভাবেই ম্লান করে আগামীতেও তাকে এদেশের মানুষের প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ হিসেবেই বাঁচিয়ে রাখবে। আজকের যে নতুন লিখিয়ে , তিনি জানবেন_ এদেশে লিখে, কেবল লিখেই একজন মানুষ তার অনেক স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। উদাহারণ :হুমায়ূন আহমেদ। আপনি তারুণ্যের সামনে অনিবার্য এক উদাহরণ, স্যার।

তারপরও কষ্ট হয় নিয়তির এই অমোঘ কাণ্ডকারখানা দেখে! এক্ষেত্রে নিশ্চুপ নীরবতা পালন করা ছাড়া আমাদের আর উপায় থাকে না।

...প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ, আপনার প্রিয় নুহাশ পল্লীর বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে ঘুমান আপনি। এখানে পূর্ণিমার উথাল-পাতাল জোয়ার আসবে। আসবে শ্রাবণের ঘোর ধারা। প্রখর সূর্যালোক আপনাকে ঘিরে রাখবে কখনও কখনও, সুনসান নীরবতায় আপনি থাকবেন আপনার নিজের মতো ; যেমনটি সারাজীবন চেয়েছেন_ ঈষৎ হাস্যময় মুখে আপনি জীবনের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসবেন...আহা! মানুষেরা এমন করে কেন?

...আমরা কত কিছুই না করব... প্রেমে -বিরহে-জীবনযাপনের নানা কষ্টে-আনন্দে-বিলোড়নে আমাদের একজন ব্যাখ্যাকারের কথা মনে পড়বে। আমরাও আপনারই মতো প্রবলভাবে জীবনকে ভালবাসব;

সন্তানকে বুকে চেপে ধরে বেঁচে থাকতে চাইব ; কেউ কেউ মরে যাব, কেউ আবার প্রাণপণে বেঁচে থেকে জীবনের ছোট ছোট আনন্দ দু'হাতে চেটেপুটে খাব। হুমায়ূন আহমেদ , আপনি সেই অতুল ব্যাখ্যাকার। আপনি বলেছিলেন_ আজন্ম সলজ্জ সাধ/আকাশে কিছু ফানুশ উড়াই...

আমাদের সকল সলজ্জ সাধে আমরা আপনাকেই খুঁজে নেব।

কাজল

আয়েশা ফয়েজ

বাচ্চার নাম রাখা হলো কাজল। কাজলের জন্মের খবর জানিয়ে তার বাবাকে টেলিগ্রাম করা হলো পরদিন ভোরে। তার তখন খুব কাজের চাপ। আসতে পারল না। অন্যেরা এল।

আমার নানি এসে কাজলকে মানুষ করার কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে নানা রকম গাছগাছালির পাতা ছেঁচে রস, মধু আর এক টুকরা লোহা তার সাথে গরম করে সেই তরলটুকু খাইয়ে দিলেন। তারপর খানিকটা শর্ষের তেল নিজে ঘানি থেকে ভেঙে এনেছেন। বিদঘুটে সেই জিনিস খেয়ে কাজলের সে কী চিৎকার! আমি বাচ্চা মানুষ করা নিয়ে কত বই পড়ে রেখেছি , কোথাও তো এসব দেখিনি! কাজলের চিৎকার দেখে বুকটা ভেঙে যাবার অবস্থা। এক সময় না পেরে বলেই ফেললাম , নানিজান, এসব খাওয়ানো ঠিক না।

নানি চোখ কপালে তুলে বললেন , কেন?

বাচ্চা কষ্ট পায়।

শুনে নানির সে কী হাসি! চিৎকার করে বললেন, তোমরা শুনে যাও, আমার নাতনি কী বলে! আমি নাতির ঘরে পুতি দেখছি, আর আমি নাকি বাচ্চা মানুষ করতে জানি না!

শুনে সবার সে কী হাসাহাসি! আমি আর কী করি, মুখ ভার করে সরে গেলাম। শুধু যে কাজলের ওপর অত্যাচার, তা-ই না; আমার উপরেও অত্যাচার। ঠাণ্ডা পানি খেতে পারব না, গরম পানি খেতে হবে। তাও একদিন দু'দিন নয়, পুরো চল্লিশ দিন। সাথে আতপ চালের নরম ভাত , ঘি আর আলু সেদ্ধ আদা দিয়ে মেখে। রাতের খাওয়া সেরে নিতে হতো সন্ধ্যার আগে; কবুতর, না হয় মুরগির বাচ্চা আলাদা করে রান্না করা হতো আমার জন্যে। রাতে শুধু দুধ। তার ওপর ছিল সেঁকা। আমার জন্যে সেঁক , কাজলের জন্যে সেঁক। কাজলের নাভি পড়ার আগে এক রকম সেঁক; নাভি পড়ার পর আবার অন্য রকম সেঁক।

কাজলের বয়স যখন নয় দিন, তখন নাপিত এল তার মাথা কামানোর জন্য। মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে, সেটি নাকি নাপাক; মাথায় রাখা টিক না। নাপিত এলে তাকে পান খেতে দেয়া হলো। নাপিত নতুন ধুতি পরে পান খেয়ে মুখ লাল করে চুল কামাতে বসে। তার সাথে সবার রসিকতার সম্পর্ক , ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে ক্ষুর চালিয়ে কাজলের মাথা ন্যাড়া করার সময় তার কোচ খুলে তাতে রাজ্যের জিনিস বেঁধে দেয়া হয়েছে। সে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। তাই দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি! কাজ শেষ হলে নাপিতকে ডালা ভরা চাল, পান- সুপারি আর একটা রুপার টাকা দিয়ে বিদেয় করা হলো। তখন আমি কাজলকে নিয়ে ঘর থেকে বের হবার অনুমতি পেলাম। সবাই মিলে আমাকে সাজিয়েছে ; কাজলকে সাজিয়েছে আরও বেশি। আমি যাচ্ছি আর আমার সামনে ধানের খই ছিটিয়ে দিচ্ছে সবাই। রাতে আরও হৈ চৈ। ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া করে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হলো। ঘরে দোয়া-কালাম লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ রাত ১২টায় ফেরেশতারা কাজলের ভাগ্য লিখতে আসবে। ভুল করে আবার যদি ভূত-প্রেত এসে পড়ে, তখন? আমার শাশুড়ির দেখাদেখি এখানেও তৈরি হয়েছে ভূতের ঝাড়ু। সেটাও ঝুলছে এক কোনায়। ভূত -প্রেতের সাধ্যি কি ভেতরে ঢোকে!

রাত বারোটায় আমি জেগে আছি। কপালে ভাগ্য লিখছে ফেরেশতারা। আহা, ভালো কিছু যেন লিখে দেয় আমার সোনার কপালে!

আয়েশা ফয়েজের 'জীবন যে রকম' ২০০৮ গ্রন্থ থেকে।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প
আনন্দ বেদনার কাব্য

বইটির নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নর - কঙ্কাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কঙ্কালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই। এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পা তা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টালাম। এবং এক সময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন, "দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে।

অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায়, আমার বেনু মা দেখিতে পাইল না।"

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে। সেখানে লেখা _প্রচ্ছদশিল্পী : মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণির দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি -হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারি লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয়নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয়নি মানে? আঁকুক দেখি কেউ এ রকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এ রকম বই? দু'একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপান।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হলো। সে বছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন , যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব , গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'টাউন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আব্দুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আব্দুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই। '

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেন্ড প্রুফ রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্যে চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

কোন কবিতাটির কথা বলছেন?

ঐ যে কী যেন বলে, ইয়ের উপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও, 'নব-বর্ষা'র কথা বলছেন?

হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক। কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আব্দুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেননি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মানুষ আপনি।

আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি_ হা হা হা। ক'জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে?

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরের একজন প্রবীণ উকিল বাবু নলিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন , "বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব -কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগ্রন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখনই আমি স্থির করি ...।"

'রিক্তশ্রী পৃবিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি। 'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা, 'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিকটে খরস্রোতা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয্যা) ফুটনোটটি এ রকম _ 'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হা ওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতে ছিল। আমার নবপরিণীতা বালিকাবধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতে ছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নতুন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে? না

শুনিয়ে কি পারেন? ঝড় জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কী যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ'পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রী মনে। ঘরে হয়তো টাকা -পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে চল। লিখছেন 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয়? দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাঁদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাঁদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগ ই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালো মানুষ বন্ধু -বান্ধব ছাড়া আর কারও কাছে তাঁদের আবেগের কথা পেঁৗছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান , কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মতো ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হলো। কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেননি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট , 'হে মহাসিন্ধু'।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রীত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কী আছে? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধচোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন , আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার, আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি? বাহ্ চমৎকার।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম_ 'মাগো'। কবিতাটি নূরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে উঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে।

একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পঙ্ক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।

আমার বাবা বড় মাপের শিক্ষক ছিলেন। কাউকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে তিনি আমাদের জীবনের গভীরতম বোধের শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। জীবনের জটিলতা আমরা তাঁর কাছে শিখিনি। শিখেছি জীবনের সারল্য। এই শিক্ষা কঠিন শিক্ষা।

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর এক কলিগ আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাবর রোডের বাসায় এলেন। আগমনের উদ্দেশ্য সমবেদনা জানানো। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে বললেন, বাবা ফুল তো চেন। চেন না? ফুল, পুষ্প। যে-কোনো ফুল।

আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, তোমার বাবা ছিলেন খুব সুন্দর একটা ফুল। এই কথাটা সারাজবীন মনে রাখবে। আর কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নাই।

মা আবেগে অভিভূত হয়ে বললেন, আপনি উনার জন্যে দোয়া করবেন।

ভদ্রলোক বললেন, ফয়জুর রহমানের জন্যে কারো দোয়ারই প্রয়োজন নাই।

শুরুতে একবার লিখেছিলাম, পরম করুণাময় আমার বাবার প্রতি তেমন করুণা করেননি। এখন মনে হচ্ছে ভুল লিখেছি, পরম করুণাময় বিশেষ করুণা করেছেন বলেই না তাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেউ একজন বলতে পারে_ ফয়জুর রহমানের জন্যে কারো দোয়ার প্রয়োজন নাই।

প্রথম প্রকাশ :১৯৮৬

একগুচ্ছ গান

কথা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুই অঙ্গনেই সমান সরব ছিলেন শিল্পস্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র ও নাটকের প্রয়োজনে লিখেছেন বেশকিছু গানও। কালজয়ী এই গানগুলো থেকে স্মরণীয় কয়েকটি গান কালের খেয়ায় পত্রস্থ হলো...

চান্‌িন পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়

কথা : হুমায়ূন আহমেদ

সুর, সঙ্গীত ও শিল্পী : এসআই টুটুল

ও কারিগর, দয়ার সাগর, ওগো দয়াময়

চান্‌িন পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।

চান্‌িন পসর চান্‌িন পসর আহারে আলো

কে বেসেছে কে বেসেছে তাহারে ভালো।

কে দিয়েছে নিশি রাইতে দুধের চাদর গায়

কে খেলেছে চন্দ্র খেলা ধবল ছায়ায়।

এখন খেলা থেমে গেছে মুছে গেছে রং

অনেক দূরে বাজছে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং।

এখন যাব অচিন দেশে, অচিন কোন গায়

চন্দ্রকারিগরের কাছে ধবল পঙ্খী নায়।

ও কারিগর, দয়ার সাগর, ওগো দয়াময়

চান্নি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।

ও আমার উড়াল পঙ্খী রে

কথা : হুমায়ূন আহমেদ

সুর, সঙ্গীত : মকসুদ জামিল মিন্টু

কণ্ঠ : সুবীর নন্দী

ছবি : চন্দ্রকথা

ও আমার উড়ল পঙ্খী রে

যা যা তুই উড়াল দিয়া যা

আমি থাকব মাটির ঘরে,

আমার চোক্ষে বৃষ্টি পড়ে

তোর হইবে মেঘের উপরে বাসা...

[ও] আমার মনে বেজায় কষ্ট

সেই কষ্ট হইল পষ্ট

দুই চোক্ষে ভর করিল আঁধার নিরাশা

তোর হইল মেঘের উপরে বাসা

ও আমার উড়ল পঙ্খী রে...

মেঘবতী মেঘকুমারী মেঘের উপরে থাক

সুখ-দুঃখ দুই বইনেরে কোলের উপরে রাখ

মাঝে মইধ্যে কান্দন করা মাঝে মইধ্যে হাসা

মেঘবতী আজ নিয়াছে মেঘের উপরে বাসা

ও আমার উড়াল পঙ্খীরে

যা যা তুই উড়াল দিয়া যা

আমি থাকব মাটির ঘরে

আমার চোক্ষে বৃষ্টি পড়ে,

তোর হইবে মেঘের উপরে বাসা...

আমার ভাঙা ঘরে

কথা : হুমায়ূন আহমেদ

সুর, সঙ্গীত : মকসুদ জামিল মিন্টু

কণ্ঠ : সাবিনা ইয়াসমীন/মেহের আফরোজ শাওন

ছবি : শ্রাবণ মেঘের দিন

আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা

ভাঙা বেড়ার ফাঁকে

অবাক জোছনা ঢুইকা পড়ে

হাত বাড়াইয়া ডাকে,

হাত ইশারায় ডাকে কিন্তু মুখে বলে না

আমার কাছে আইলে বন্ধু আমারে পাইবা না।

তুমি আমায় ডাকলা নাগো তুমি রইলা দূরে

তোমার হইয়া অবাক জোছনা ডাকলো অচিন সুরে।

হাত ইশারায় ডাকে কিন্তু মুখে বলে না

আমার কাছে আইলে বন্ধু আমারে পাইবা না।

ঘর খুলিয়া বাহির হইয়া জোছনা ধরতে যাই

হাত ভর্তি চান্দের আলো ধরতে গেলে নাই।

হাত ইশারায় ডাকে কিন্তু মুখে বলে না

আমার কাছে আইলে বন্ধু আমারে পাইবা না।

বরষার প্রথম দিনে

কথা : হুমায়ূন আহমেদ

কণ্ঠ :সাবিনা ইয়াসমীন

ছবি : দুই দুয়ারী

বরষার প্রথম দিনে

ঘন কালো মেঘ দেখে,

আনন্দে যদি কাঁপে তোমার হৃদয়,

সেদিন তাহার সাথে করো পরিচয়,

কাছে কাছে থেকেও যে কভু কাছে নয়।

জীবনের সব ভুল,

যদি ফুল হয়ে যায়

যদি কোনোদিন আসে

জোছনার আঁচলে ঢাকা, মধুর সময়।

তখন কাছে এসো,

তাহাকে ভালোবেসো,

সেদিন তাহার সাথে করো পরিচয়,

কাছে কাছে থেকেও যে কভু কাছে নয়।

জীবনের সব কালো,

যদি আলো হয়ে যায়।

দূর হয়ে যায় যদি ছায়াদের আঁধার সময়।

তখন কাছে এসো,

তাহাকে ভালোবেসো,

ছায়াময়ী কারো সাথে করো পরিচয়।

কাছে কাছে থেকেও যে কভু কাছে নয়।

একটা ছিল সোনার কন্যা

কথা : হুমায়ূন আহমেদ

সুর, সঙ্গীত : মকসুদ জামিল মিন্টু

কণ্ঠ : সুবীর নন্দী

ছবি : শ্রাবণ মেঘের দিন

একটা ছিল সোনার কন্যা

মেঘ বরণ কেশ

ভাটি অঞ্চলে ছিল

সেই কন্যার দেশ

দুই চোখে তার আহারে কি মায়া

নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া।

তাহার কথা বলি

তাহার কথা বলতে বলতে

নাও দৌড়াইয়া চলি।

কন্যার ছিল দীঘল চুল

তাহার কেশে জবা ফুল

সেই ফুল পানিতে ফেইলা

কন্যা করল ভুল

কন্যা ভুল করিস না

ও কন্যা ভুল করিস না

আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলব না।

হাত খালি গলা খালি

কন্যার নাকে নাকফুল

সেই ফুল পানিতে ফেইলা

কন্যা করল ভুল

এখন নিজের কথা বলি

নিজের কথা বলতে বলতে

নাও দৌড়াইয়া চলি

সবুজ বরণ লাউ ডগায়

দুধসাদা ফুল ধরে

ভুল করা কন্যার লাগি

মন আনচান করে

আমার মন আনচান করে।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প
ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব _ হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি_ তারা ভারি খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফুটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফুটে, তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পেঁৗছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওর পড়ে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো। অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম, আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনে সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড়-জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি , দু'তিনজন এক সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আর বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল_ কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা_ পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশ যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে_ দেশের অবস্থাডা কি কন দেহি ছোড মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কি ? কি দেশ ছিল আর কি হইল!

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, আমি লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দু'জন করে 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে_

'ও মনা

এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।

না না না_ আমি প্রাণে বাঁচতাম না।'

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা_ একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি , খালি গায়ে রোগামত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না। আমি বললাম_ কি রে?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম_ চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল_ না।

'নাম কি রে তোর?'

'মন্তাজ মিয়া।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোন কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু -ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম_ কি ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, থাকিস কোথায়?

উত্তরে পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অবিভূত হয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের ওপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন_ মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

'কেন?'

'বিরাট চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুই দিন পরপর মার খায়, তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কি?'

'কিছু করে না?'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়ত তোমার কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।'

'না, কিছু নেয় নি।'

'ভালো করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলে র ঘটনা আছে।'

'কি ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শুরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি, মন্তাজ মিয়াকে তিন-চার জন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে।

ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে । একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, দেখেন তো এই কলমটা আপনের কি-না? মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমারই চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোন মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হল সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পর তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলি, আজ একটা কথাও বলা হয় না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচীর কাছে। চুরির ঘটনারও দু'দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ কোন্টা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলেনি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই_

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে, শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটাই বেশ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ 'আমার পুত কই গেল রে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়, পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আছর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সব কিছুই ঘটল খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো দুপুর রাতের পর , যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হল। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কি? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে_ 'ও মরে নাই।' কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈচৈ শুরু করল যে, সবাই বাধ্য হল মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে_ আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন_ বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন_ প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্য এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...

কবর খোঁড়া হল।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের এক খণ্ড লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোন কথা সরল না। মৌ লানা সাহেব বললেন_ কি রে মন্তাজ?

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, পানির পিয়াস লাগছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এ রকম কখনো শুনি নি।

ছোট চাচাকে বললাম, মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কি দেখল না দেখল এইসব?

ছোট চাচা বললেন_ না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?

'কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল _একটা শব্দও করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।' আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে_ লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহতায়ালার কুদরত। আল্লাহতায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেন নি সে কি করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহর কুদরত। উনার কেরামতি। '

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহতালার 'কুদরত এবং কেরামতির ওপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে , আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মত গলায় বলে, 'আল্লাহর কুদরত।'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না ? ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এমনেই আসব।'

'এমনিতেই আসবে কেন?'

ছোট চাচা বললেন_ তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়ে হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম। আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোন বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না ।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছে?

'আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, আমাদের উপলক্ষে যেসব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়। '

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না, তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোন উপায় ছিল না।

আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমত এক সময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দু'টা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হল। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, কেমন আছ রহিমা?

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ভাল আছি ভাইজান।

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ হবে না! কি কন ভাইজন? অত দামি জিনিস কি আমরা কোনদিন চউক্ষে দেখছি।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কি করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে ?'

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কি কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।

'কি জন্যে মন হল?'

'জানি না ভাইজান। মনে হইল।'

'এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোন ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার ?'

'জ্বি না।'

'মন্তাজ তোমাকে কিছু বলে নি ? জ্ঞান ফিরলে সে কি দখল বা তার কি মনে হল?'

'জ্বি না।'

'জিজ্ঞেস কর নি?'

'করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সব সময় মনে হয় , বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কি ভাবল? কি সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয়, জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সব সময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুর বেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়াগাঁর ঝিম-ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুট্ করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম_ কি খবর রে মন্তাজ?

'ভাল।'

'বোন আছে_ না চলে গেছে?'

'গেছে গা।'

'আয় ভেতরে আয়।'

মন্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয়, আমাকে সে খানিকটা পছন্দও করে। এইসব ছেলেরা ভালবাসার খুব কাঙ্গাল হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর_ এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম_ তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমত জবাব দিবি তো?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা মন্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?'

'না।'

'না কেন?'

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, কি দেখলি চারদিকে অন্ধকার?

'হ।'

'কেমন অন্ধকার?'

মন্তাজ এবারো জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, _কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল?

'চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না।'

'সে কি করল?'

'আমারে আদর করল। আর কইল, কোন ভয় নাই।'

'কি ভাবে আদর করল?'

'মনে নাই।'

'কি কি কথা সে বলল?'

'মজার কথা_ খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, কি রকম মজার কথা? দু'একটা বল তো শুনি?

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই? সে কে এটা কি বলেছে?'

'জ্বি না।'

'ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো_ কোনকিছু কি মনে পড়ে?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মত গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু?'

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।

'সেটা কি?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন?'

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম_ বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

মন্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি, তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জা নি তাতেও কিছু যাবে না আসবে না।

প্রথম প্রকাশ :১৯৯০

নন্দিত নরকে'র ভূমিকা থেকে

মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি , একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তার নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলা ম ঐ নামের মোহেই।

পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর ; একজন কুশলী স্রষ্টার পাকা হাত। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর , এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।

জীবনের প্রাত্যহিকতার ও তুচ্ছতার মধ্যেই যে ভিন্নমুখী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির জটাজটিল জীবনকাব্য তার মাধুর্য, তার ঐশ্বর্য, তার মহিমা, তার গ্লানি, তার দুর্বলতা, তার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, তার শূন্যতার যন্ত্রণা ও আনন্দিত স্বপ্ন নিয়ে কলেবরে ও বৈচিত্র্যে স্ফীত হতে থাকে, এত অল্প বয়সেও লেখক তার চিন্তা-চেতনায় তা ধারণ করতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত।

বিচিত্র বৈষয়িক ও বহুমুখী মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই যে জীবনের সামগ্রিক স্বরূপ নিহিত , সে উপলব্ধিও লেখকের রয়েছে। তাই এ গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক মানুষের ভিড় , বহুজনের বিদ্যুৎ দীপ্তি এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আপাতনিস্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনের বহুমুখী সম্পর্কের বর্ণালি কিন্তু অসংলগ্ন ও বিচিত্র আলেখ্যর মাধ্যমে লেখক বহুতে ঐক্যের সুষমা দান করেছেন। তার দক্ষতা ঐ নৈপুণ্যেই নিহিত। বিড়ম্বিত জীবনে প্রীতি ও করুণার আশ্বাসই সম্বল।

হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন_ এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আহমদ শরীফ

১৬-৬-৭২

প্রকাশনার বরপুত্র
ফরিদ আহমেদ

আমাদের কথাসাহিত্যের এক অনন্য নাম হুমায়ূন আহমেদ। তার কথা নতুন করে বলবার কিছু নেই। ১৯৭২ সালে 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যের আঙিনায় তার আবির্ভাব। সেই থেকে শুরু, বাকিটা ইতিহাস। গল্প, উপন্যাসসহ সেলুলয়েডের বর্ণিল ভুবনে তার অবাধ বিচরণ আমাদের মোহিত করেছে বিগত কয়েক দশক ধরে। এভাবে যদি বলি, হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কম বলা হয়ে যাবে। তার অর্জন আর অবদান এত বিশাল ও বিস্তৃত যে, এত অল্প পরিসরে তাকে নিয়ে কিছু বলা হবে অপরাধের শামিল। হুমায়ূন আহমেদের চলে যাওয়ায় সমগ্র দেশবাসীর মতো আমিও শোকাতুর। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রকাশনা শিল্প ছিল একেবারেই নাজুক অবস্থায়। সেই অবস্থা থেকে হুমায়ূন আহমেদ, বলা

যায় নিজের চেষ্টায় এবং তার সৃষ্টির কল্যাণে দাঁড় করিয়েছেন আমাদের প্রকাশনা শিল্পকে। একটা সময় আমাদের দেশে ভারতীয় সাহিত্যিকদের বইয়ের ভালো প্রচলন ছিল। এ ছাড়াও পাইরেটেড বইয়ের অবাধ বিস্তারে আমাদের অবস্থা ছিল নাজুক। হুমায়ূন আহমেদ সেই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। আজ আমরা বিশ্বের প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম।

আজ থেকে প্রায় ২৪ বছর আগে আমাদের প্রকাশনা থেকে হুমায়ূন আহমেদের বই প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। সেই থেকে শুরু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পর তার অসংখ্য বই প্রকাশ করেছি। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে সরাসরি কাজের সুযোগ হয়েছিল আমার। কত শত স্মৃতিবিজড়িত আমাদের সেই দিনগুলো! আজ তিনি নেই। মনের গভীরে উঁকি দিয়ে যায় সেই সব স্মৃতি। হুমায়ূন আহমেদের অবদান যদি বলতে যাই, তাহলে বলতে হয়_ হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যকে এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি পাঠক তৈরি এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে তার অবদান ভোলার নয়। একটা সময় এমনও গেছে, মানুষ একুশে বইমেলায় আসত শুধু হুমায়ূন আহমেদের বই কিনতে। তার নতুন বই মাত্র অবশ্যপাঠ্য। তার রচনায় অভ্যস্ত হয়ে এদেশের অধিকাং শ মানুষের মাঝে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে তাদের এই অভ্যাস ধরে রেখে তারা আগামীতে অন্যান্য লেখকের বইও পড়েছেন। এখনও পড়ছেন। যার ফলে আমাদের এখানকার বাজার তৈরি হয়েছে। আর বাজার তৈরি হয়েছে বলেই আমাদের প্রকাশনা শিল্প আজকের এই অবস্থানে এসে পেঁৗছেছে। এখন প্রতি বছর আমাদের দেশে বই যে পরিমাণে প্রকাশ হচ্ছে তা আধুনিক অনুষঙ্গের সাহায্যে। তার একার চেষ্টা এবং প্রকাশকদের আন্তরিকতায় বাংলাদেশের প্রকাশনা আজ শিল্পের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের জাদুকরী লেখনী এবং সমাজকে বিশ্লেষণের নিজস্ব ক্ষমতার কারণে তিনি আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি বয়সের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছেন। সমাজের প্রায় প্রতিটি জায়গা তিনি দেখেছেন নিজের মতো করে। আর সেই দেখা তিনি তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন নতুন মাত্রা যোগ করে। আমাদের সমাজের এত সব বঞ্চনা আর অপ্রাপ্তির গ্লানি মুছে দিয়ে তিনি মানুষদের স্ব প্ন দেখতে শিখিয়েছেন; বাঁচতে শিখিয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদের অনুপস্থিতি আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেবে তার কথা , তার সৃষ্টির কথা। তিনি সশরীরে না থাকলেও তার বিপুল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সবার হৃদয়ের মাঝে। আগামী কয়েক প্রজন্ম মনে রাখবে তার অবদানের কথা। বিশেষ করে আমাদের প্রকাশনার যে অতুলনীয় ক্ষতি হয়েছে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ; তা কখনও পূরণ হওয়ার মতো নয়। তিনি যে পথ তৈরি করে গেছেন একার চেষ্টায়; আমরা যারা তার দেখানো পথ ধরে এত দূর এসেছি , তারা আজ এই অসীম ক্ষমতাধর মানুষটির শূন্যতায় সবার চেয়ে বেশি ভুগব।

প্রকৃতির নিয়ম মেনে নিয়ে প্রত্যেক মানুষকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হবে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তাড়াতাড়ি চলে যাবেন_ ভাবতে পারিনি। নিজের জন্য, দেশের মানুষদের জন্য তার আরও অনেক দিন বাঁচার প্রয়োজন ছিল। তার অনস্বীকার্য অবদান ভোলার মতো নয়। তিনি আমাদের প্রকাশনা বরপুত্র, সাহিত্যের প্রাণপুরুষ। তার চলে যাওয়ায় , তার মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ; তা পূরণ হওয়ার নয়। হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকবেন সবার হৃদয়ে ; অনন্তকাল ধরে।

বৃক্ষরাজিতে ঠিকানা এবং বৃক্ষ হননের মহোৎসব
আলী যাকের

আমরা, যারা হুমায়ূনকে জানি, যাদের ভালোবাসায় তিনি স্থান করে নিয়েছেন তাদের হৃদয়ে, তাদের প্রতি একটি আবেদন। যদি ইচ্ছা এবং ক্ষমতা থাকে, আমরা যেন অন্তত পক্ষে এই বর্ষায় একটি বৃক্ষ রোপণ করি তার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে। সেই বৃক্ষ যখন আস্তে আস্তে পূর্ণবয়স্ক হবে , আকাশছোঁয়ার ইচ্ছা হবে তার, তখন আমাদের ভাষা, আমাদের অভিব্যক্তি এবং সৃজনশীল চিন্তায় আমাদের এই ক্ষমতাও হুমায়ূনেরই মতো আকাশছোঁয়ার চেষ্টা করবে

শেষমেশ হুমায়ূন চলে গেল। ভেবেছিলাম, যে মানুষটি জীবনযুদ্ধে সবসময় জয়ী হয়েছে , হারেনি কখনও, সে এবারেও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবে। এই মানুষটির মধ্যে একটি প্রায় অবিশ্বাস্য প্রত্যয় ছিল, যা যদিও আমি রাশিচক্রের ধার ধারি না, বৃশ্চিক রাশির জাতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলেই সাধারণত বলা হয়ে থাকে। আমার সঙ্গে তার তেমন সখ্য ছিল না যে, আমি প্রায় প্রতিদিনই কিংবা এমনকি ঘন ঘন তার সাক্ষাৎ পেতে পারি। যখন দেখা হতো, কাজে-কর্মেই দেখা হতো। সে নাট্যকার, আমি অভিনেতা। অথবা সে পরিচালক, আমি কুশীলব। এর বাইরে হয়তো দুই কি তিনবার সামাজিক আচার -অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। তবে এক ধরনের ভালো লাগা কাজ করত আমার মধ্যে, যখনই তার সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। ভালো লাগত, কেননা মানুষটি সবসময়ই সোজাসাপ্টা কথা বল তে ভালোবাসত। এই চাঁছাছোলা কথা বলবার কারণে অনেক মানুষ বিমুখ হয়েছে তার প্রতি। কিন্তু সে কখনও তার তোয়াক্কা করেনি। যা বলবার তা স্পষ্টভাবেই বলত। আমি কখনও দেখিনি তাকে কারও মন রক্ষা করে কথা বলতে। আরও একটি বিষয় ছিল তার। একেবারে অভিব্যক্তিহীন মুখাবয়ব নিয়ে এমন সব রসি কতা করত, যাতে যারা শুনত সেসব কথা, হেসে গড়াগড়ি খেত। আমাকে সে একসময় বলেছিল, খুব বেশিদিন আগে নয় যে, হাস্যরসাত্মক চরিত্রে অভিনয় করাই আমার উচিত হবে। কেননা, আমি সহজেই বোকা বোকা কথা বলে মানুষকে হাসাতে পারি। বোধকরি এটিও সে বলেছিল। কারণ , যখন আমি 'বহুব্রীহি'তে 'মামা' কিংবা 'আজ

রবিবার'-এ 'বড় চাচা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, সে হয়তো তারই চেহারার প্রতিচ্ছবি দেখছিল আমার চেহারায়, বিশেষ করে রসে ভরা সংলাপ উচ্চারণ করার সময়।

আমার মনে আছে, আমরা অর্থাৎ আমি, সারা যাকের, আসাদুজ্জামান নূর এবং হুমায়ূন আহমেদ একবার লস অ্যাঞ্জেলেসে বঙ্গ সম্মেলনে গিয়েছিলাম তারই রচিত একটি নাটক নিয়ে। লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আমার পুত্র ইরেশ যাকের , যে তখন আমেরিকাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধ্যয়ন শেষ করে ফিলাডেলফিয়াতে গবেষণাকেন্দ্রিক একটি চাকরি করছে। হুমায়ূনের নাটকটি ছিল হালকা চালের, হাস্যরসময় অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যতদূর মনে পড়ে , দর্শকের পছন্দও হয়েছিল সেই নাটক। সেখানে কলকাতার এক ভদ্রলোক নাটক শেষে একটি বৈরী মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা কেন আমাদের শিল্পকর্মে এত বেশি মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে বলি। তার ধারণা ছিল যে , আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আসলে আমাদের জিতিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী। আমি যখন সেই ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, কোনো বিদেশি বাহিনীর পক্ষে অন্য কোনো দেশে ঢুকে যুদ্ধ জয় করা অত সহজ নয় , যদি না সেই দেশের গণমানুষ এবং তাদের যোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা পাওয়া যায়। তখন হুমায়ূন আমাকে সেখানে থেকে চলে আসতে বললেন। আমি তার সঙ্গে হেঁটে সম্মেলন কেন্দ্র থেকে যখন হোটেলে ফিরছি, তখন হুমায়ূন আমাকে বলেছিলেন তার স্বভাবসুলভ ভাষায় , 'বেকুবকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। ' কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে। ভারি প্রাঞ্জল ভাষায় এই মানুষটি অনেক বড় বড় কথা বলতেন , যা অনেক নামজাদা লেখকের কাছ থেকেও আমরা সহজে শুনতে পাই না।

ওই লস অ্যাঞ্জেলেসে যে হোটেলটিতে আমরা ছিলাম, সেটি একেবারে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। আমরা এমন একটা বয়সে পেঁৗছেছি, যখন অল্প-বিস্তর শরীর চর্চা, সে যত সামান্যই হোক না কেন, করা বাঞ্ছনীয়। অতএব আমি, সারা, নূর এবং ইরেশ সকাল সকাল উঠেই সমুদ্রতটে যেতাম হাঁটতে। সেখানে আমাদের মধ্যে কেউ হাঁটত, কেউ দৌড়াত। প্রায় প্রতি সকালেই হুমায়ূন আমাদের সঙ্গী হতো। ওই ভোরবেলায় সূর্য কেবল উঠেছে , কি ওঠেনি, নির্মল বাতাসে স্নাত হয়ে বালুকাবেলার ওপর দিয়ে হাঁটা বড়ই আনন্দদায়ক ছিল। হুমায়ূন কিন্তু একটু দূরে দাঁ ড়িয়ে দার্শনিকের মতো চেহারা করে সূর্যোদয় দেখত আর আমাদের কসরত দেখে মিটিমিটি হাসত। যেদিন শেষবারের মতো আমরা সমুদ্রতটে গেছি , সেদিন আমি আর সারা হুমায়ূনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও দৌড়ানো শুরু করিনি। হুমায়ূন হঠাৎ করে আমাকে আর সারাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে কি কাজের লোকেরাও সকালে ব্যায়াম করে?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনার হঠাৎ এ রকম কেন মনে হলো?' জবাবে সে বলল, 'প্রতিদিন সকালেই তো দেখছি আপানারা নিয়ম করে এই সমুদ্রতটে এসে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য না দেখে কসরত করতে লেগে যান। ' আমি প্রমাদ গুণলাম। আমি ভাবলাম হুমায়ূন নিশ্চয়ই এই কথাগুলো তার পরবর্তী কোনো বইয়ে লিখে দেবে। আমি তার দু'হাত ধরে মিনতি করলাম যে, আপনি যদি এই রসময় কথাটি লিখতে চান, অবশ্যই

লিখতে পারেন, তবে দয়া করে আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না। আমি যতদূর জানি , হুমায়ূন আমার কথা রেখেছিল।

হুমায়ূনের প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল অতি সাধারণ সকল বিষয়ের প্রতি। মনে আছে, বিভিন্ন দিন তার ইচ্ছা হতো লস অ্যাঞ্জেলেসে বিভিন্ন খাদ্য কিংবা পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করার। আমরা যেহেতু মহড়া এবং মঞ্চায়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, ইরেশ তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে এবং ইরেশের প্রতি তার এক ধরনের অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছিল তখন। খুব পছন্দ হয়েছিল তার ইরেশকে। আজ এই কলামটি লিখতে বসে , এই কথাগুলো বড় মনে পড়ছে আমার। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা , যখন গতবার একপ্রস্থ চিকিৎসা শেষে সে ঢাকায় এসেছিল কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে। সে কি বুঝতে পেরেছিল যে , সে আর ফিরবে না এখানে, জীবদ্দশায়? এবং এসেই সে সরাসরি চলে গিয়েছিল নুহাশ পল্লীতে। তার প্রিয় , পছন্দের বৃক্ষরাজি ঘেরা, শ্যামল নুহাশ পল্লী। তার সেই সফর বাংলাদেশের অনেক টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা গেছে। তারা নুহাশ পল্লীতে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। আমি লক্ষ্য করেছি , চতুর্থ মাত্রার ক্যান্সার থেকে আরোগ্যপ্রত্যাশী একজন মানুষ কী অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে তার প্রিয় বৃক্ষগুলোর মধ্য দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে যে, মার্কিন দেশের অতি উন্নত চিকিৎসাও তার দেহমনের নিরাময়ে যতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তার অতি প্রিয় শ্যামল-সবুজ বৃক্ষরাজি বোধহয় তার অনেকটাই অর্জনে সফল হয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল মানিকগঞ্জের পারিলনিবাসী সেই বৃক্ষসখার কথা, যে নিজের সমস্ত রোগ-জরা দূর করত একটি বটগাছকে জড়িয়ে ধরে। এই গল্পটি বলেছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ড. নওয়াজেশ আহমেদ। আহা, তিনিও প্রয়াত আজ।

আজ হুমায়ূন ফিরে এসেছে তারই বৃক্ষরাজির সান্নিধ্যে। সেখানেই রচিত হয়েছে তার শেষ শয্যা। পাঠক , আমায় ভুল বুঝবেন না। তার সমাধি কোথায় হয়েছে বা হওয়া উচিত ছিল তা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এটা তার পরিবার-পরিজনের বিষয়। কিন্তু শ্যামল বনের মধ্য দিয়ে তার দৃপ্ত পদচারণা আমার বড় ভালো লেগেছিল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ওইরকম হাঁটতে হাঁটতে যদি ক্লান্তি এসে ঘিরে ধরে তাকে, তবে তারই অতি পরিচিত কোনো একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসে পড়বেন এবং বড় আনন্দে নিদ্রায় নিমজ্জিত হবেন। এই ধরনের বৃক্ষপাগল মানুষ বাংলাদেশে আছেন অনেকেই। তাদেরই প্রতিভূ হুমায়ূন আহমেদ বৃক্ষেরই ওপর একাধিক সৃজনশীল লেখা লিখে গেছেন। নানাভাবে আমরা হুমায়ূনকে জেনেছি, নিসর্গ প্রেমিক হুমায়ূনকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। এটি তার চরিত্রের আরও একটি মাত্রা, তা আমরা কোনোভোবেই ছোট করে দেখতে পারি না।

আজ এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। তারা সবাই ঘটনাচক্রে কোনো না কোনো সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তাদের কাছেই শুনতে পেলাম যে, অদূর অতীতে জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক উপাচার্যের আমলে সেখানকার অনেক দুর্লভ বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছে নির্মমভাবে। শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো, কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেই কোনো মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে মানবিক সকল দিকের প্রতি সজাগ হতে হয়। সংবেদনশীল হতে হয়। এই ঢাকা শহরেই আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষ হননের মহোৎসব , যখন আমাদের ভেতর থেকে কান্না উঠে এসেছে। চোখ ভিজে এসেছে। চোখ ভেসে গেছে। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি। হুমায়ূন কিছু করতে পেরেছিলেন বটে। তিনি এই প্রায় অবাসযোগ্য নগরীর প্রান্তেই রচনা করেছিলেন এক উদ্যান। যেখানে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল বৃক্ষরাজি। যার ছায়াতলে তিনি অন্তিম শয়ানে শায়িত আজ।

আমরা, যারা হুমায়ূনকে জানি, যাদের ভালোবাসায় তিনি স্থান করে নিয়েছেন তাদের হৃদয়ে, তাদের প্রতি একটি আবেদন। যদি ইচ্ছা এবং ক্ষমতা থাকে, আমরা যেন অন্তত পক্ষে এই বর্ষায় একটি বৃক্ষ রোপণ করি তার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে। সেই বৃক্ষ যখন আস্তে আস্তে পূর্ণবয়স্ক হবে , আকাশছোঁয়ার ইচ্ছা হবে তার, তখন আমাদের ভাষা, আমাদের অভিব্যক্তি এবং সৃজনশীল চিন্তায় আমাদের এই ক্ষমতাও হুমায়ূনেরই মতো আকাশছোঁয়ার চেষ্টা করবে।
আলী যাকের :সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

তিনি আমাদের
সেলিনা হোসেন

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় ১৯৭২ সালে। তখন আমি কর্মরত ছিলাম বাংলা একাডেমীতে। সেই সময়েই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'নন্দিত নরকে'। উপন্যাসটি নিয়ে তুমুল শোরগোল চারিদিকে। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে, আমাদের সাহিত্যের একটি পরিবর্তন সূচিত হলো এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। ছোট্ট একটি লেখা_ কিন্তু কী জোরালো! কী শক্তিশালী সে লেখা। আমাদের লেখালেখির জগতে এ যেন সুস্পষ্ট এক নতুন জগৎ, নতুন ভাষা। হুমায়ূন স্মিতহাস্যে আমাদের সামনে আসতেন, ঘুরতেন, কথা বলতেন। দেখতাম, মানুষ হিসেবেও তিনি তার লেখার মতোই সাবলীল।

পরে গত ৪০ বছরে দেখলাম আমাদেরই চোখের সামনে হুমায়ূন তার নিজস্ব জগৎটাকে কী নিপুণভাবে শুধু তৈরি নয়, বিস্তারিত করলেন। তার সাহিত্য, তার চলচ্চিত্র, তার নাটক, তার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগল বিভিন্নভাবে। এবং একই সঙ্গে তিনি ধরলেন পাঠক। এই পাঠক ধরার কৃতিত্ব এবং গৌরবটি হুমায়ূন এককভাবেই এই দেশে সম্পন্ন করেছেন। কারণ এত বড় পরিসরে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই যে বেঁচে থাকা, টিকে থাকা, মনের ভেতরে স্থান করে নেওয়া এবং একই সঙ্গে সাহিত্যের রস গ্রহণ করা_ এটি ছিল হুমায়ূন আহমেদের এক অসাধারণ নৈপুণ্য।

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

হুমায়ূন আহমেদের এখনকার যে পাঠক বা কিশোর পাঠক, বয়েসি পাঠক কিংবা মধ্যবয়েসি পাঠক; এসব বিবেচনা থেকে নয়_ তখনকার আমাদের নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক , শিল্পী, বুদ্ধিজীবী মহলে শোরগোলটি উঠেছিল তার গুণগত মান এবং সৃজনশীলতার শক্তির কারণেই।

জনপ্রিয় ধারাকে লক্ষ্য করে তিনি যে গল্প বা উপন্যাসগুলো লিখেছেন_ সেগুলো হয়তো কালের নিয়মে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও তাকে একজন বাংলাদেশি সাহিত্যিক হিসেবে চিরকাল স্বীকৃতি দিয়েই রাখতে হবে তার বেশ কিছু উপন্যাসের জন্য। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'জননী ও জোসনার গল্প'। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা তার অনেক উপন্যাসের জন্যও আমাদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে তিনি একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে থাকবেন। জনপ্রিয়তার মাত্রায় হয়তো তার একটু সমালোচনা আছে যে, জনপ্রিয় ধারার যা লিখেছেন তা সাহিত্যিক মান সম্পন্ন করেনি। কিন্তু যা-ই হোক, হুমায়ূন হুমায়ূন-ই। তিনি যা করে গেছেন তা নিয়েই আমাদের সাহিত্যের মাঝে থেকে যাবেন কাল থেকে কালে। হুমায়ূনের ক্ষমতার নানামুখী মাত্রা আমরা দেখেছি। তার 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের বাকের ভাই নামের যে চরিত্র_ সে চরিত্রের অবিস্মরণীয় শক্তি আমরা অনুভব করেছি। দেখেছি নাটকের একটি চরিত্রের ফাঁসি হবে_ এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। একটি চরিত্র গণমানুষের মনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, এটা হুমায়ূনের কাছ থেকেই শিখতে হয়। একজন সাহিত্যিক হয়ে, সাহিত্যের বিকল্পধারা হিসেবে নানারকম ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন।

তার গল্পের মুগ্ধতা, কাহিনী বিন্যাস, নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে একই সঙ্গে সব বয়েসি পাঠকের কাছে একটা আশ্চর্যরকমের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। সব বয়েসি পাঠককেই তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। সেই সাথে তার লেখার স্নিগ্ধতা, ভাষার গতিশীলতা, সারল্য পাঠকের কাছে ছিল দারুণভাবে আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, তার এই সবকিছুর ভেতরে মানুষকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় ছিল , মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় ছিল, সমাজকাঠামো নির্মাণের পটভূমিতে যে মানুষরা আমাদের জীবনে অহরহ আনাগোনা করে_ তাদেরকে তুলে আনার একটা বিষয় ছিল। আর সেই বিষয়গুলোর মধ্যে তিনি বিচিত্র সব উপাদান সংযোজন করেছেন_ সেখানে কৌতুক আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে, প্রেম-ভালোবাসা এবং মানবিক বোধ আছে। এই উপকরণগুলো মানুষকে টানে; যার মাধ্যমে মানুষের জীবনের নানা অভাববোধের বিপরীতে একটা আশার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তিনি। মানুষ তার জীবনের নানা প্রাপ্তি , যা তার নিজের জীবনে ঘটেনি, হুমায়ূনের গল্প-উপন্যাসে তা পাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং পেয়েছেও। তিনি ছিলেন মেধাবী, বিজ্ঞানমনস্ক, সাহিত্যমনস্ক, দেশ এবং মানুষের পক্ষের লোক। আমাদের লোক। তার এ চিরবিদায় আমাদের সাহিত্য জগতে নতুন এক চিরশূন্যতার সূচনা।

পড়বে না তাঁর পায়ের চিহ্ন

রঞ্জু চৌধুরী

শুভ্র চোখের মোটা কাচের চশমা সরিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কারও সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। স্তব্ধ শূন্য চারদিক। দিকশূন্য সে। মাজেদা খালা একটু পরপর এসে দেখে যাচ্ছে একই ভঙ্গিমায় বসে থাকা শুভ্রকে। এদিকে মিসির আলীর খোঁজে বেরিয়েছে শুভ্রর খালু সাহেব। তার কাছে বাড়ির ঠিকানা নেই। ঝিগাতলায় ঘুরছেন আর ঘামছেন তিনি। গাড়ির এসি তার ঘাম বন্ধ করতে পারছে না। এক বাড়ির সামনে হলুদ পাঞ্জাবি পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে।... ভাই মিসির আলীর বাড়িটা কোন দিকে ? হলুদ পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা বলল, আমার নাম হিমু। আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অপেক্ষা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিচে আসবেন। মিসির আলী নিচে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। খালু সাহেব বললেন , স্যার আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। কই যাবেন বলেন। আর কাজ শেষ করে আমার সঙ্গে আজ রাতে খাবেন। কী রান্না করতে বলব? মিসির আলী বললেন, আপনার গাড়ি কই?

তিতলী আর কঙ্কা শুভ্র ভাইয়াদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির কুকুর টুং ও টাংকে চুপচাপ দেখে ওরা ভড়কে গেল। এমন সময় কালো গাড়ির হর্নে গেট খুলল দারোয়ান। খালু সাহেব গাড়ি থেকে নেমে তাদের বললেন, উপরে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে বাঁদরের নাচ দেখছ নাকি! টুং টাং সারাদিন কিছু খায়নি। ওদের জ্বালিয়ো না। এই বলে খালু সাহেব হাঁটা ধরলেন। সঙ্গে মিসির আলী , হিমু, তিতলী এবং কঙ্কা। শুভ্রর মা এসে বললেন, হিমু কে? রূপা নামে একটি মেয়ে ফোন করে আপনাকে খুঁজেছে। ওকে বাসার ঠিকানা দিয়ে, আসতে বলেছি। নানা যুক্তিতর্কে শুভ্রর বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু শুভ্রকে মীরা , রূপা, হিমু, তিতলী কিংবা কঙ্কা কী বলবে? আজ সবারই মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। শুভ্রর এ থেমে যাওয়া সবাইকে হারিয়ে ফেলার যে দুঃখবোধের জন্ম দিয়েছে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। বইমেলার ধুলা আর উড়াবে না হুমায়ূন আহমেদের কোনো চরিত্র। বইমেলায় এখন এই চরিত্রগুলোকে কেউ খুঁজবে না। খুঁজলেও তাদের আর পাওয়া যাবে না কোনোখানে। পড়বে না স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদের পায়ের চিহ্ন...

নান্দনিক সৃষ্টিসত্তা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

দূরত্বটা যে কত কম বা কত বেশি , তা মাপার কোনো উপায় নেই। হয়তো তা মুহূর্তমাত্র , হয়তো তা অনন্তকাল। যে ভুবনে হুমায়ূন প্রবেশ করেছে, তা থেকে ফেরারও কোনো উপায় নেই। স্বীকার্য, হুমায়ূন সেখানে গেছে আমাদের সকলের আগে। যাব; আমরাও যাব। কিন্তু কখন যাব, কীভাবে যাব আমরা জানি না।

শেষ পর্যন্ত তার যুদ্ধটা চলছিল ঠিকই ; কিন্তু যে যুদ্ধে আজ পর্যন্ত জেতেনি কোনো মানব -মানবী, তেমন একটি অসম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সীমিত জীবন থেকে মহাজীবনে প্রবেশ করেছে হুমায়ূন। আমাদের সকলের সর্বোচ্চ কামনা ও প্রার্থনা অপ্রতুল প্রতিভাত হয়েছে। তাঁকে যেতে হয়েছে এমন এক লোকে , যেখানে তাঁর পার্থিব প্রিয়জন বলতে আর কেউ নেই। আমাদের এবারের প্রার্থনা, সেখানে করুণাময় স্রষ্টার আনুকূল্যধন্য হোক এই মানবতাবাদী মহান লেখক , যার জীবনসাধনা ও কর্মসাধনা মানবজাতির সামগ্রিক মাঙ্গলিকতায় পূর্ণ সমর্পিত। আসলে পৃথিবী নামক এই নন্দিত নরককেই হুমায়ূন রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল এক বাসযোগ্য স্বর্গে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার ৩২২টি গ্রন্থ, আর আছে বেশ কিছু অগ্রন্থিত রচনা। হুমায়ূন তার যাপিত জীবনের নানাকৌণিক উপলব্ধি পুনর্নির্মাণ করেছে তার গল্প -উপন্যাস-নাটকসহ সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে। আজ বাংলা ভাষাভাষী সর্বাঞ্চলে হুমায়ূন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথক। সহজ অথচ জাদুকরী এক বর্ণনাশৈলী তাঁকে করে তুলেছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর জনপ্রিয়তার স্থান আর কেউ দখল করতে সমর্থ হবে, এমন সম্ভাবনাও সহজদৃষ্ট নয়। চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা, চিরকাল অসাম্প্রদায়িক, চিরকাল সত্যসন্ধ হুমায়ূন কোনোদিন আপস করেনি কোনো ক্ষমতাপ্রভু তথা প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে। তাঁর রচনার নান্দনিক মূল্যায়নও অপেক্ষাকৃত কম। অথচ এ নিয়ে তাঁর মুখে কোনো আক্ষেপ শুনিনি। বরং নিন্দুকের প্র তি সপ্রশংস কটাক্ষপাতই ছিল তার রসঘন অস্ত্র। আমি তাকে চিনি সেই ১৯৬৭ থেকে, যখন আমরা দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় ও হলজীবনে প্রবেশ করি। কবিতা লিখতে শুরু করেও শেষ পর্যন্ত থিতু হলো কথাসাহিত্যে , পরে নাটক ও সিনেমায়। আসলে সফল লেখক হিসেবে এটি ছিল তাঁর সচেতন আত্মশনাক্তি। আজ এক্ষেত্রে তাঁর অর্জন প্রত্যাশারও অধিক। তবে মানুষের সব প্রত্যাশাই তো আর পূরণ হয় না। এমন একটি হলো চাঁদনী পশর রাইত। না , হুমায়ূন তেমন রাতে পরপারে পাড়ি জমায়নি। তবে এ কথা তো সত্য, তাঁর পুরো জীবনটাই সাফল্যের পূর্ণিমায় উদ্ভাসিত। কালে কালে তাঁর সাহিত্যেরও যথার্থতর বিচার আর পুনর্পঠন হতে থাকবে। ভাবীকাল অবশ্যই হুমায়ূনকে তাঁর প্রাপ্য নান্দনিক স্থানটি দেবে।

হুমায়ূনের দ্বিতীয় কামনাটি প্রকৃতিগত বিচারে সামষ্টিক ও সামাজিক। সুস্থতাপ্রিয় হুমায়ূন তার অতিপ্রিয় নুহাশ পল্লীতেই একটি ব্যতিক্রমী ওষধি বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর বছর খানেক আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হুমায়ূন আমেরিকায় গিয়ে এই কালব্যাধির হিংস্রতা ও তার চিকিৎসার ব্যয়বহুলতা বিশেষভাবে টের পেয়েছিল। তাই এই বাংলাদেশেই সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও অর্থায়নে এমন একটি সর্বাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল, যেখানে ধনী-গরিব সকলেই সমভাবে চিকিৎসা-সুবিধা পাবে। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষে তা করা হয়ে উঠল না। তিরোধানের পর তাঁর অগণিত ভক্ত, অনুরাগী আর সরকারি-বেসরকারি তাবৎ উদ্যোগের সমন্বয়ে আমরা কি তাঁর স্মৃতিতে তাঁরই স্বপ্নাশ্রিত 'হুমায়ূন ক্যান্সার

হাসপাতাল' বা তজ্জাতীয় একটি অনন্য আরোগ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি না? আমার মতে, সেটিই হবে জাতীয় স্তরে তাঁর প্রতি আমাদের স্থায়ী শ্রদ্ধা। আসুন , আমরা তাঁর এই অসমাপ্ত স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করি। চিরজীবী হোক হুমায়ূন আহমদের নান্দনিক ও মাঙ্গলিক সৃষ্টিসত্তা।

প্রকাশনা শিল্পের বাতিঘর

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প যার হাত ধরে দাঁড়িয়েছে, তিনি হুমায়ূন আহমেদ। সৃষ্টিশৈলী , মেধা আর জনপ্রিয়তায় তিনি আবিষ্ট করে রেখেছিলেন এদেশের পাঠক সমাজকে। বন্ধ্যা একটি বাজারকে তিনি একাই নিয়ে এসেছেন আজকের অবস্থানে। প্রকাশকদের স্মৃতিচারণ...

ফরিদ আহমেদ, সময়

হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। সমগ্র দেশবাসীর মতো আমিও শোকাতুর। স্বাধীনতা -পরবর্তী কয়েক দশক ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। ২৪ বছর আগে আমাদের প্রকাশনা থেকে তার বই প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। এরপর অসংখ্য বই প্রকাশ করেছি। তার সঙ্গে সরাসরি কাজের সুযোগ হয়েছিল আমার। হুমায়ূন আহমেদ তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে প্রায় একাই নিয়ে এসেছেন এতদূর। পাশাপাশি পাঠক তৈরি এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে তার অবদান ভোলার নয়। প্রতি বছর আমাদের বইমেলা জমজমাট হতো তার কারণে। তিনি আমাদের একলা করে চিরতরে চলে গেলেন। তার এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। যে ভূমি তিনি তৈরি করেছেন একাই , এখন থেকে সবই থাকবে_ শুধু তিনি থাকবেন না আমাদের মাঝে।

ওসমান গনি, আগামী প্রকাশন

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতে আমাদের সবার হৃদয়ে আজ রক্তক্ষরণ। একটা সময় আমাদের দেশে ভারতীয় সাহিত্যিকদের বইয়ের ভালো প্রচলন ছিল; কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যকে এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। আজ এমন দিনে এ কথা সাহসের সঙ্গে বলা যায় , বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে তার অবদান শতভাগ। তার হাত ধরেই দাঁড়িয়েছে এদেশের প্রকাশনা। একটা সময় এমনও গিয়েছে মানুষ বইমেলায় আসত শুধু হুমায়ূন আহমেদের বই কিনতে। তার রচনায় অভ্যস্ত হয়ে এদেশের অধিকাংশ মানুষের মাঝে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠেছে। পরে এ অভ্যাস ধরে রেখে তারা অন্যান্য লেখকের বইও পড়ছেন। এর ফলে আমাদের এখানকার বাজার তৈরি হয়েছে। তার মতো এত জনপ্রিয় লেখক আমাদের দেশে আসবেন কি-না জানি না। তার মৃত্যু তে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হওয়ার নয়।

মনিরুল হক, অনন্যা

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য নাম হুমায়ূন আহমেদ। তার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। সৃজনশীল সাহিত্যের এ প্রবাদপুরুষ চিরতরে আমাদের নিঃস্ব করে চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে আমরা যে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা পূরণ হওয়ার নয়। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকর্ম শুধু আমাদের দেশেই নয় , দেশের সীমানা পেরিয়ে ওপার বাংলায়ও সমান জনপ্রিয়। তিনি আমাদের এখানকার পাঠক তৈরি করেছেন। আমাদের প্রকাশনা শিল্পকে মজবুত অবস্থানে নিয়ে গেছেন । হুমায়ূন আহমেদের অনুপস্থিতি আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেবে তার কথা। তিনি সশরীরে না থাকলেও তার বিপুল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সবার হৃদয়ে। প্রত্যেক মানুষকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হবে ; কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, ভাবতে পারিনি। তার অনস্বীকার্য অবদান ভোলার নয়।

স্বজন হারানোর বেদনা
হাসান আজিজুল হক

এই মুহূর্তে খুব কষ্ট অনুভব করছি, ঠিক যেন স্বজন হারানোর বেদনা। কিছুদিন আগে হুমায়ূন যখন এসেছিলেন, তখন এখানে ওখানে অনেক কথা বলেছিলেন। আমি কথাগুলো আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলাম এবং খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। মানুষ হিসেবে হুমায়ূনের আরেকটা পরিচয় আমার সামনে তখন উঠে এসে ছিল। অস্বীকার করা যায় না, মানুষ হিসেবে তিনি অসাধারণ। ভীতি নেই , একেবারে নিঃশঙ্কচিত্ত। প্রায় সক্রেটিসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মৃত্যুটাকে দেখেছেন। সক্রেটিস যেমন বলেছিলেন , এখন যাও, তোমরা জীবনের পথে; আর আমি যাই মৃত্যুর দিকে। কে বলবে কোনটা ভালো ? প্রায় সে রকম একটা ঔদাসিন্য নিয়ে আর সেই সঙ্গে জীবনের আসক্তি নিয়ে হুমায়ূন সেই সময় যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। যাওয়ার পরেই শুনলাম দুটো অপারেশন হবে।

মাসখানেক আমি ছিলাম না। ফিরেই হুমায়ূনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটার পর একটা খারাপ সংবাদ পেতে লাগলাম। খুবই উদ্বেগ অনুভব করছিলাম এবং ঠিক আগের মতোই সমস্ত হতাশাকে একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবছিলাম, হয়তো হুমায়ূন ফিরে আসবেন আমাদের মধ্যে। হয়তো এ যাত্রা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অবধারিত যা হওয়ার তা-ই হলো।

কাল শুতে যাওয়ার আগেই শুনলাম খবরটা। আমি ওপরে বসে কাজ করছিলাম। খবরটা এখানে কখন এসে পেঁৗছেছে, জানি না। নিচে নেমেছি যখন তখন রাত ১২টা বাজে। আমার বড় বোন নিচে টেলিভিশন দেখছিলেন। তিনিই আমাকে ডেকে বললেন, হুমায়ূন আর নেই। ওই মুহূর্তটাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি একদিক থেকে মনে করি, লেখক-কবি-শিল্পী সব আসলে এক বংশের নানান শাখা। বিস্তারিত একটি পরিবার তাদের। কাজেই এর যে কোনো ক্ষতিই চূড়ান্ত ক্ষতি। সে রকম একটা অনুভব আমার মধ্যে এলো। আমি টেলিভিশনের সামনে বসে হুমায়ূনের পুরনো একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম। ওর কথাগুলো

আগে শুনেছি, তখনও শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল যে, এই কথাগুলো যখন বলছিল, তখন সে জীবিত। কত বাস্তব লাগছে মানুষটাকে। এখন অনস্তিত্ব। শুনতে শুনতে খুব অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। একসময় বুঝতে পারলাম, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। টেলিভিশনের পর্দাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। আমি উঠে গেলাম।

যা থাকবার ঠিকই থাকে। যা থাকবার নয়, তা শত চেষ্টা করেও রাখা যায় না। ওই বিচার করার দায়িত্ব একজনের নয়। আর এই মুহূর্তের ওপরও নয়। এখন আমরা নানা কথা বলব। কিন্তু আমি মনে করি , এখন তার সাহিত্য বা শিল্প নিয়ে যত কম কথা বলব ততই ভালো। কারণ এসব বলতে গেলে এখন আমাদের আবেগ এসে হাজির হয়ে যাবে। আমরা ঠিক নিকষ কষ্টিপাথর দিয়ে বিশুদ্ধ স্বর্ণটাকে খুঁজে পাব না।

সেই উত্তেজনাটা এখনও মনে আছে। সত্তরের দশকে যখন হুমায়ূনের নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার বের হলো, তখন মধ্যবিত্ত জীবনের এক নতুন রূপকার আসার ঘোষণাটা মিলল। মধ্যবিত্ত জীবনটাকে তিনি নতুনভাবে দেখেছেন, একেবারে নির্মোহ ভঙ্গিতে। খুবই আকর্ষণীয় ভাষায় তার লেখা। আমি নিজে ঠিক করেছি, আবার নতুন করে হুমায়ূনে মন দেব। আমি এখন বাছাই করে হুমায়ূনকে আবার নতুনভাবে পড়ব।

হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা
সৈয়দ শামসুল হক

হুমায়ূন চলে গেলেন। এই চলে যাওয়ার জন্য মন প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তারপরও এই শোক আমার কাছে গুরুতর মনে হচ্ছে। তার কারণ, চোখের সামনে দিয়ে যখন অনুজরা চলে যায় , তখন সেই বেদনা সত্যিই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

হুমায়ূন ছিলেন অসামান্য এক গল্পকথক। আমি হুমায়ূনকেই বলেছি_ তুমি হচ্ছো হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা। তোমার গল্পের টানে দেশের সমস্ত তরুণ-তরুণীকে তুমি টেনে নিয়ে যাচ্ছ। এই মাপের একজন গল্পকথক বাংলা ভাষায়, বাংলা সাহিত্যে বিরল। অনেকেই শরৎচন্দ্রের কথা বলেন; শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় ছিলেন, হুমায়ূন আহমেদও জনপ্রিয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন , 'শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন হুমায়ূন আহমেদ।' কিন্তু আমার মতে, দু'জনের জনপ্রিয়তা দু'রকমের। এবং যে জনদের কাছে তারা জনপ্রিয়, সেই জনরাও দু'ধরনের। শরৎচন্দ্র সমাজকে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং তুলে ধরেছেন তার গল্প -উপন্যাসে।

আর হুমায়ূন আহমেদ, তিনি সমাজকে অবলোকন করেছেন; সমাজকে তিনি প্রভাবিতও করেছেন। বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মকে। তার লেখার এক বিরাট প্রভাব রয়েছে তরুণ প্রজন্মের ওপর। শুধু তার লেখা নয় , তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, বিশেষ করে তার টেলিভিশন নাটকের মাধ্যমে। আজকের তরুণ-তরুণীরা যেভাবে বাঁচতে চায়, যেভাবে জীবনকে দেখতে চায়, জীবনের পথে চলতে চায়, তাদের উচ্চারণ, তাদের পারস্পরিক

সম্পর্কজ্ঞান_ এসবের ওপরই হুমায়ূনের একটা প্রভাব আছে বলে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এই মাপের মানুষ আমরা খুব সহসা দেখতে পাব বলে মনে হয় না। কত বিচিত্র দিকে ধাবিত ছিল তার সৃ জনশীল মন। কত পরিকল্পনা ছিল তার।

হুমায়ূন আহমেদ একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি বইমেলায় ছিলাম তখন। একটা অনুষ্ঠান স্থগিত রেখে আমি সোজা তার কছে চলে গেলাম। গিয়ে তাকে বললাম_ হুমায়ূন, আমাদের লেখকদের হাতের আঙুল পাঁচটি নয়, ছয়টি। কলম হলো আমাদের ছয় নম্বর আঙুল। আর এই আঙু লটি সবার চাইতে দীর্ঘ এবং এটি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার এ কথা শুনে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'আপনার এই কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাই তো, আমি কেন ভেঙে পড়ব।' আর এবার যখন ক্যান্সার হলো তাকে ভেঙে পড়তে শুনিনি, ভেঙে যেতে দেখিনি। নিউইয়র্কে তিনি যখন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ছিলেন আমার মনে হয়েছে, তার যতক্ষণ জ্ঞান ছিল তিনি সতেজ ছিলেন।

অত্যন্ত শান্ত, নিবেদিত, মিতভাষী এবং পরিশ্রমী লেখক ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। নিয়মিত লিখেছেন তিনি। এ রকম লেখক খুব কমই আছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে। তিনি পাঠাভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন আমাদের। এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকে, বাংলাদেশের লেখার দিকে তিনি তরুণদের ফিরিয়েছেন।

এখন হুমায়ূন আহমেদ তো চলে গেলেন। নতুন বই আর আমরা তার কাছ থেকে পাব না। হুমায়ূনকে পড়তে পারব না বলে বাংলা সাহিত্য আর পড়ব না, এ রকম যেন না হয়। সেই তরুণ সমাজ, যারা হুমায়ূনকে তাদের মানস নির্মাতা হিসেবে জানেন, সেই তরুণ সমাজকে আমি বলব_ যেন তাদের সাহিত্যপাঠের অভ্যাসটা চলমান থাকে। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পরও এই বাংলাদেশে যারা লিখছেন , আগামীতে লিখবেন, তাদের প্রতি তরুণ সমাজের দৃষ্টি যেন থাকে। এটা না থাকার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা এবারের বইমেলাতেই আমি দেখতে পেয়েছি যে, হুমায়ূন আহমেদের বিরল উপস্থিতি বই বিক্রির ওপর একটা প্রভাব ফেলেছিল। এ রকমটা যেন না হয়।

কালের যাত্রায় হুমায়ূনের বিপুল রচনার অনেকটাই হয়তো ঝরে যাবে , অনেক লেখাই আমাদের দৃষ্টির গহ্বরে তলিয়ে যাবে; কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ রচনা যেগুলো সেগুলোর মাঝে হুমায়ূন আহমেদ টিকে থাকবেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা_ হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন তার ছোটগল্পের জন্য। তার কিছু ছোটগল্প কেবল বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তো বটেই , সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতেও অসাধারণ। জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন অনবদ্যভাবে।

যখন আমি খবর পেয়েছি হুমায়ূন আহমেদ আর নেই, সেই মুহূর্তে তার মায়ের কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে। মায়ের উপস্থিতিতে সন্তানের চলে যাওয়া, এ শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। আমি তার পাশেই

আছি। আমরা সবাই তার পাশে আছি। হুমায়ূন আহমেদের দুই কৃতী ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব। তাদের প্রতিও সমবেদনা জানাই। রত্নগর্ভা মা ছিলেন হুমায়ূনের মা।

মানুষ মরণশীল, এই চিরসত্য আজ পর্যন্ত লঙ্ঘিত হয়নি। জীবন যখন থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও থাকবে। কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা মৃত্যুকে জয় করে নিয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদ সেই মানুষদের একজন, যিনি ইতিমধ্যে মৃত্যুকে জয় করে নিয়েছেন।

মহাসিন্ধুর ওপারে তুমি
গোলাম সারওয়ার

স্মৃতিকণাগুলো বিষাক্ত কীটের মতো হৃদয়কে এভাবে দংশন করছে কেন হুমায়ূন ভাই? কেন আপনার হাসিমাখা মুখটি বারবার মনের আয়নায় রোদের মতো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠার পর ধীরে ধীরে শ্রাবণধারায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে? কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন হুমায়ূন ভাই, কোথায় কোন দূরবর্তী অচেনা দ্বীপে? আপনার দরাজ কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দূরদিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে ? আপনি না ফেরার দেশে চলে যাচ্ছেন? বৃহস্পতিবার শেষ রাতে সমকাল থেকে বাসায় ফিরে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের রাজপুত্র হুমায়ূন ভাই আপনি যেন অলক্ষ্যে আমার আধো ঘুম আধো জাগরণের স্বপ্নলোকে রহস্যপুরুষের মতো বিচরণ করছেন। আপনাকে স্পর্শ করতে গিয়ে শরীর শিহরিত। আপনি যেন অস্ফুট কণ্ঠে বলছেন, আমি 'আসব না ফিরে কোন দিন'।

হুমায়ূন ভাই, আমার এই অক্ষম

লেখাটি একজন সম্পাদকের পেশাগত দায়িত্ব পালনের কোনো অংশ নয়। আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা একটি আবেগঘন সম্পাদকীয় উৎসর্গ করেছি। এই লেখাটি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়, অশেষ শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন এক প্রতিভাবান অনন্যসাধারণ মানুষ , হুমায়ূন ভাই আপনার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাংবাদিকরা বড় পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। অন্যদের মতো তাদেরও গভীর শোক আচ্ছন্ন করলেও তা ক্ষণিকের জন্য। পেশাগত বাস্তবতায় তারা হৃদয় খুঁড়ে আর 'বেদনা জাগাতে' ভালোবাসে না। বৃহস্পতিবারের রাতটি ছিল আমার জন্য অন্যরকম। ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের একটি সরাসরি টক শো চলার সময় আপনার চিরবিদায়ের মর্মভেদী সংবাদ শুনে অনুষ্ঠান শেষে সমকালে ফিরে এসে দেখি , পুরো বার্তাকক্ষে কেউ যেন শোকের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। আপনি এভাবে না ফেরার দেশে চলে যাবেন_ ভাবতে চাইনি। সমকালের দ্বিতীয় সংস্করণের বৃহদংশেই আপনার মহাপ্রয়াণের খবরটি ছাপা হলো।

বার্তাকক্ষে অনেকগুলো টেলিভিশন সেটে বিভিন্ন চ্যানেলজুড়ে শুধুই আপনি। আপনার প্রিয়জনরা স্টুডিওতে ছুটে এসেছেন তাদের প্রিয়জন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কিছু মন্তব্য জানাতে। একটি চ্যানেলে শুনলাম , আমাদের

আর এক প্রিয় সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের আপনার উদ্দেশে নিবেদিত অকপট প্রশংসার পঙ্ক্তিমালা। তার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই, আমাদের সাহিত্যে আর এক হুমায়ূন কবে জন্ম নেবেন আমরা জানি না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিবিসিকে বললেন , শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছে হুমায়ূন। এ কথা কে অস্বীকার করবে হুমায়ূন ভাই, আপনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে অনায়াস ভঙ্গিতে নির্ভার ভাষায় সুখ-দুঃখের যে কথকতা নির্মাণ করেছেন তা কোটি কোটি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। সমকাল শুক্রবার তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। সর্বশেষ সংস্করণে আপনার চিরপ্রস্থানের শিরোনাম 'শেষের খেয়ায় হুমায়ূন'। সত্যি 'শেষ পাড়ানির কড়ি কণ্ঠে নিয়ে' আপনি শেষের খেয়ায় চড়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বপ্নলোকে চলে গেলেন হুমায়ূন ভাই।

আমাদের অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথে বড় আচ্ছন্ন আপনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত বারবার ঘুরেফিরে এসেছে আপনার উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে। এমনকি শিরোনামেও। ভালোবাসতেন বাংলার লোকগান। বাউল সাধকদের গান। উকিল মুন্সি, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ বাংলার লোকসঙ্গীত স্রষ্টাদের আপনিই তো চলচ্চিত্রের গানে এনে অমর করেছেন। কী করে তা ভুলবে লোকজীবন সম্পৃক্ত মানুষ ? কুদ্দুস বয়াতির মতো কত আবিষ্কার আপনার!

জ্যোৎস্না ছিল আপনার বড় প্রিয়। অথচ জ্যোৎস্নার বিপরীত অন্ধকার জগতে চলে গেলেন? 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প'-এর বিশাল কলেবর উপন্যাসে একাত্তর নিয়ে আপনিই তো বলেছেন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ শোক আর গৌরবের কথা। সেই কত আগে যখন যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই তখন টিভি নাটকে পাখির ঠোঁটে সংলাপ দিলেন আপনি, 'তুই রাজাকার'। এই কটূক্তি ছড়িয়ে গেল দেশময়।

বাংলার তরুণ সমাজে বই পড়ার অভ্যাস-ঐতিহ্য যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল, তখন তো আপনিই তরুণদের বইমুখো করলেন, বইমেলা জমে উঠল তো আপনাকে ঘিরেই। ভারতীয় লেখকদের বইয়ের প্রচ্ছদে ধুলো জমলেও আপনার বই নিমিষেই বিক্রি। প্রকাশনাও যে লাভজনক শিল্প হয়ে উঠতে পারে সেই পথও আপনি দেখিয়ে গেছেন, এই ঋণ কি শোধ হবে কোনো দিন?

হুমায়ূন ভাই, আপনার কাছ থেকেই তো আমরা জানলাম কী করে মনোহারী গল্প আর ক্লাসিকস্, ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প একই সমান্তরালে রচিত হতে পারে পাঠকপ্রিয় প্রাঞ্জল ভাষার উপন্যাস।

হুমায়ূন ভাই, মনে পড়ে সেদিন আপনার স্বপ্নপুরী নুহাশ পল্লীতে আমি , আমার স্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে আপনার, আপনার প্রিয়তমা পত্নী, ছায়াসঙ্গিনী শাওনের সারাদিনের মাতাল করা কয়েক ঘণ্টার কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার। আকাশে কালো মেঘের ছায়া, কখনো রোদের লুকোচুরি। নুহাশ পল্লী জুড়ে আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অনেক চ্যানেলের রিপোর্টার -ক্যামেরাম্যানদের ভিড়। সেদিনই

আমার প্রথম 'নুহাশ পল্লী' দর্শন। ঘুরে ঘুরে নুহাশ পল্লী দেখে মুগ্ধ হলাম আপনার বৃক্ষপ্রেম লক্ষ্য করে। গল্প - গুজবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর। সবকিছু ছাপিয়ে আপনার বেঁচে থাকার অশেষ আগ্রহ , লেখার প্রতি অনুরাগ। আপনার সেই স্বগতোক্তি_ কেন মানুষ শত শত বছর বাঁচে না। আপনার এই উক্তি এখন হৃদয়ে হাহাকারের মতো বাজে। আপনি আমার গ্রামের বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়ায় যেতে চেয়েছিলেন। সেদিনও মনে করিয়ে দিলেন সে কথা। বললেন, সারওয়ার ভাই, এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমরা আপনার প্রিয় বানারীপাড়ায় যাব। এবার কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবেন না। হুমায়ূন ভাই, আপনাকে ফাঁকি দিতে পারলাম না। আপনিই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। বানারীপাড়ার মানুষ আপনার শ্যামল ছায়া দেখতে পেল না।

আপনার ও শাওনের সঙ্গে শেষ দেখা বসুন্ধরা সিটির সিনেপ্লেক্স প্রেক্ষাগৃহে। আপনার সর্বশেষ ছবি 'ঘেঁটুপুত্র কমলা'র একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে একান্ত কাছের কিছু মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আপনি। নুহাশ পল্লীতে আপনাকে যেমন প্রমোদে মন ঢেলে দিতে দেখেছিলাম সেদিনও দেখলাম অভিন্ন দৃশ্য। ভক্তদের সঙ্গে অবিরাম কথা বলছেন, অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। কোনো ক্লান্তি নেই। কে বলবে ক্যান্সার তখন আপনার জীবনীশক্তি গোপনে নিঃশেষ করে চলেছে। 'ঘেঁটুপুত্র কমলা'র কুশীলবদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ উপভোগ্য কৌতুকে হাসির ঝর্ণাধারা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ক্ষণিকের জন্যও ভাবিনি আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আপনার সর্বশেষ এই ছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি । ময়মনসিংহের হাওর এলাকায় বড়লোকের বিকৃত লালসার শিকার ঘেঁটু গানের গায়ক কমলার জীবন - ট্র্যাজেডি নিয়ে নির্মিত ছবিটি দর্শককে মুগ্ধ করবে। এই মুগ্ধতার কথা আপনি জানতে পারবেন না।

হুমায়ূন ভাই, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর সঞ্চিত ব্যথা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে চায়। আগামী বইমেলায় আপনাকে দেখা যাবে না। আপনার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ভক্তদের দীর্ঘ লাইন হবে না। এই মুহূর্তে সমকালের ঈদ সংখ্যা প্রকাশ নিয়ে আপনার অনুজতুল্য মাহবুব আজীজের সীমাহীন ব্যস্ততা। হুমায়ূনবর্জিত ঈদ সংখ্যা কখনও কল্পনা করেনি সমকাল। আপনি এবারও বলেছিলেন, বেঁচে থাকলে সমকালের জন্য লিখব। বরাবরের মতো এবারও 'সমকাল ঈদ সংখ্যা' বেরোবে। আপনি থাকবেন না। আমরাও আপনার পথ ধরে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব। আমাদের কেউ মনে রাখবে না। মহাকালের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে আপনি , আপনার সাহিত্য অমর হয়ে থাকবে।

আপনাকে হারিয়ে আমরা ভালো নেই। মহাসিন্ধুর ওপারে আপনি ভালো থাকুন হুমায়ূন ভাই।

খুব ভালো থাকুন।

'সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল'
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

হুমায়ূন আহমেদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনায় আমারবই.কম

হুমায়ূন আহমেদের যে কয়টি বই আমি পড়েছি, সেগুলো থেকে জোছনা ও জননীর গল্প অনেকটাই আলাদা। ইতিহাস, এমনকি গবেষণাগ্রন্থ থেকেও লেখক উদ্ধৃতি দিয়েছেন অনেক জায়গায়, একটি গবেষণাপত্রের মতো টীকা-টিপ্পনী, গ্রন্থসূত্র এবং পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জিও দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি কোনো ইতিহাস বইয়ের অথেনটিসিটি নয়, বরং একটি গল্পের মর্যাদাই দাবি করে। এভাবে এত সহজে ইতিহাসকে জুড়ে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরির উদাহরণ খুব কমই আছে আমাদের সাহিত্যে। তিনি নিজেও সে পথে আগে যাননি। এবার হয়তো আরও যাবেন।

'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ তিনটি কাজ করেছেন। প্রথমত, তাঁর নিজের ভাষায়, 'দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা' করেছেন। দ্বিতীয়ত, একটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস লিখেছেন এবং তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দুটি কাজ নির্বিঘ্নে করতে পেরেছেন ; কিন্তু তৃতীয় কাজটি করা এত সহজ নয়। যারা বিভিন্ন সময় সরকারি ইতিহাস রচনার দায়িত্বে থাকেন _ একেবারে ইতিহাস লেখক থেকে নিয়ে বিশেষ দিবসের সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর বাণী ও মূল প্রবন্ধ লেখক পর্যন্ত_ তাঁরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের জানা ইতিহাসকেও এমন অজানা করে রেখেছেন যে , একটি মাত্র উপন্যাসে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করে ফেলা সম্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণের শেষে 'জয় বাংলা'র সঙ্গে 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন কি-না, এ নিয়ে তিনি তাঁর ধারণা পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর' একটি প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তাদের অবদানের ঋণ স্বীকার করেছেন, বীরশ্রেষ্ঠদের তালিকায় কেন কোনো বেসামরিক সাধারণ মানুষের নাম নেই_ সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আবার আওয়ামী লীগ প্রণীত ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবদানের কোনো উল্লেখ কেন থাকে না, এ নিয়েও তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ রকম আরও কিছু অমীমাংসিত বিষয় তিনি উত্থাপন করেছেন এ উপন্যাসে। আমাদের এ ভয়ঙ্কর রকম বিভাজিত সময়ে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন কি-না, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় না। তবে বড় কথাটি হলো _ সেদিন ওই জনসভায় উপস্থিত সব মানুষের কাছে এ বাণীটি স্পষ্টভাবে পেঁৗছে গিয়েছিল যে , এবার মুক্তির এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বিদায় পাকিস্তান। জোছনা ও জননীর গল্পের গল্প কাঠামোয় এ বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। ৭ মার্চের সত্যটিই প্রধান হয়ে উঠেছে, তার খুঁটিনাটি নয়।

একইভাবে জিয়াউর রহমানের চরিত্রটিও এসেছে জোছনা ও জননীর গল্পে। কিন্তু জিয়াউর রহমান এ উপন্যাসে সেই জিয়া, যে জিয়া হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচিত করেছিলেন ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে লেখা একটি প্রবন্ধে, যে প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা উল্লেখ করে জিয়া লিখেছিলেন, সমগ্র বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নামেই তিনি ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ ওই ঘোষণার দিন হিসেবে ২৭ মার্চকেই উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে জিয়ার নিজের লেখা ডায়েরির উদ্‌দৃতি

দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'লেখক' পরিচিতির অধীনে আধা পৃষ্ঠার একটি বিবরণও জুড়ে দিয়েছেন ১৮৩ পৃষ্ঠায়, যেখানে শুধু একজন সর্বোচ্চ বর্ণনাকারী হিসেবে নন , এ গ্রন্থের লেখক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সব বিভ্রান্তির অবসান চেয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা, জিয়াকে জিয়ার। এ কাজটি অনেক ইতিহাসবিদও করতে পারবেন না, নব্য জাতীয়তাবাদী

ইতিহাসবিদরা তো নয়ই। দেশমাতার প্রতি ঋণটি লেখকের ব্যক্তিগত, তবে জাতি হিসেবে আমরা তাতে ভাগ নিতে পারি। হুমায়ূন আহমেদ যখন গভীর মমতা নিয়ে আঁকেন একজন অজানা মুক্তিযোদ্ধার এক দিনের জীবন ও মৃত্যুর ছবি, তখন ওই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান সব মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ঋণ সারাজীবনের_ সেটি উপলব্ধির সুযোগ করে দেন হুমায়ূন আহমেদ।

ইতিহাসের পাতা থেকে যখন কিছু তুলে নেন হুমায়ূন আহমেদ, তখন তাকে একটা জটিল গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোনটা তুলে নেবেন , এত লাখ লাখ ঘটনা থেকে? তিনি তুলে নেন ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের ডোমদের গল্প, স্বরূপকাঠির যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য , হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদি ত মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে কোনো চিঠি অথবা বয়ান। হুমায়ূন আহমেদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের গল্পগুলোই বেশি মর্যাদা পায়। কারণ সেগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণীগুলো লুকিয়ে আছে। তাদের প্রকাশ করার মধ্যে দেশমাতার দায় শোধের একটা ব্যাপারও থাকে। তবে পাকিস্তানিদের চরিত্রায়নে অনেক বেশি সংযত এবং দয়াশীল তিনি। একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন, যে তার মাকে ছেড়ে এ দেশে আছে, তার প্রতি কিছুটা মমত্ব দেখাতেই পারেন লেখক। কিন্তু ওই ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য ছিল না ত্রাণ বা ভালোবাসা বিতরণ। সে এসেছে মানুষ মারতে। সে খুনি। যেমন খুনি ছিল আলবদর গোষ্ঠী। এ খুনিদের ব্যাপারে আরেকটু কঠোর হতে পারতেন হুমায়ূন আহমেদ। আলবদরদের চেহারাটা আরেকটু বেশি দেখাতে পারতেন।

হুমায়ূন আহমেদ চাঁদে-পাওয়া মানুষ। তাকে নিসর্গ নানাভাবে উদ্বেলিত করে। যখন জীবন নিয়ে পালাচ্ছেন তিনি নৌকায় করে; নদীতে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ, তখনও আকাশের জ্যোৎস্না দেখে পুলকিত হয়েছেন। জোছনা ও জননীর গল্পে ওই চাঁদে-পাওয়ার বর্ণনা আছে অনেক। এটি হুমায়ূন আহমেদের গল্পে জীবনের রহস্য নির্ণয়ের একটা উপায়ও বটে। বইটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম, শিরোনামের 'জননী' তো বোঝা গেল। জোছনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক? মাঝখানের ওই জ্যোৎস্নার বর্ণনা থেকে বিষয়টি আন্দাজ করা গিয়েছিল, কিন্তু উপন্যাসের শেষ কয়টি পঙ্ক্তিতে তিনি নিজেই প্রায় ব্যাখ্যা করে দিলেন, জোছনার রাতে সে (অর্থাৎ দেশজননী, মৃত্তিকা) তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। এ উপন্যাসের আসলে দুটি 'শেষ' আছে। এক হলো, মুক্তিযোদ্ধা নাইমুল তার স্ত্রী মরিয়মের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু অন্যটি, যেটি অনেক

বেশি বাস্তব, সেটি ভিন্ন, 'নাইমুল কথা রাখেনি। সে ফিরে আসতে পারেনি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে।'

এই সমাপ্তিটিও চমকের এবং এ রকম একটি দ্বিপথী সমাপ্তির জন্য সাহসের দরকার। তবে নাইমুলের দুই গল্পের মতো, উপন্যাসের অন্য সব গল্পের মতো, জোছনার গল্প শেষ পর্যন্ত আসলে একটিই_ যার নাম মুক্তিযুদ্ধ।

তাঁর অক্ষরগুলো বেঁচে উঠতে শুরু করেছে
কুলদা রায়

তিনি চলে গেলেন। গেলেন বললেই তো চলে যাওয়া যায় না। তিনি তাঁর অক্ষরের মধ্যে থেকে আবার বেঁচে উঠবেন। বলবেন, তোমাদের রেখে যাব কোথায়?

শুরুতে তিনি উঠেছিলেন আমাদের পাড়ায়। নিউইয়র্কের কুইন্স বরোর জ্যামাইকায়। একদিন আমার বড় মেয়ে ঘুম থেকে উঠেই জুতা পরে রেডি। তখনও অতটা শীত পড়েনি। বলল , বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজতে যাচ্ছি। আমার বড় মেয়েটি বাংলা জানে। পড়তে পারে। ও যখন পড়তে শিখেছিল তখন আমার বুক শেলফ থেকে শ্যামল ছায়া গল্পের বইটি পড়েছিল। পড়ে বলেছিল _ ও বাবা, এই গল্প থেকে জল পড়ে। আমার ছোট মেয়েটি বলে উঠেছিল, পাতা নড়ে।

আমার মেয়েটি পাড়ার সব বাসার সামনে দিয়ে একা একা হেঁটেছে। দরজায় সিঁড়িতে তাকিয়েছে। কুইন্স লাইব্রেরিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। অবশেষে আমার মেয়ে হতাশ হয়ে তার স্কুলের শিক্ষক ড. মল্টোভাকে জিজ্ঞেস করেছে, কী করা যায়, বলো তো? ড. মল্টোভা বলেছেন, লেখককে বাইরে পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়। আমার মেয়ে খুশি। সে বইয়ের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজবে।

হুমায়ূন আহমেদ যখন নিউইয়র্কে এসেছিলেন, অনেককেই দেখেছি_ বলছেন, আমাদের তিনি এসেছেন। সবার মধ্যে একটা নিশ্চিত ভাব_ তাঁর কিছু হবে না। সেরে উঠবেন। জ্যাকসন হাইটসে যেদিন তাঁর জন্মদিন হলো, ঘটনাচক্রে সেদিন আমার ছিল বই কেনার দিন। কিছু গান খোঁজার দিন ছিল। তখন মুক্তধারা নামের বইয়ের দোকানে পিলপিল করে মানুষ আসছে। তারা হুমায়ূন জাদুকরকে দেখবে। একজন বুড়ো অবসরপ্রাপ্ত লোক এসেছেন। তার নাতিটি তাঁকে জিজ্ঞেস করছে , দাদু_ এখানে কী হবে?

দাদুটি তার নাতিকে বলে দিচ্ছেন_ আমার বন্ধুর জন্মদিন হবে।

নাতিটি জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধুটি কই?

তিনি হুমায়ূন আহমেদের বইগুলো দেখিয়ে দিলেন।

এক তরুণী মেয়ে এসেছিল নীল শাড়ি পরে। তার হাতে অচিনপুর বইটি। প্রথম পাতায় লেখকের স্বাক্ষর নেবে।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ নিজেই আসেননি এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। সবাই অপেক্ষা করে আছে। তিনি এলেন। তবে এলেন টেলিভিশনের পর্দার মধ্য দিয়ে। সবাই উইশ করে উঠল। নাতিটি শুধু তাঁকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, তুমি টেলিভিশনে কেন? আমাদের কাছে নেমে আসো। তিনি আসতে পারেননি। তিনি টেলিভিশনের পর্দায় আটকে গেছেন। বের হয়ে আসতে পারছেন না। তাঁর মাথায় একটি ক্যাপ। হাসি হাসি মুখ। ক্যাপটি খুলে দেখালেন। কেমোথেরাপিতে চুল পড়ে গেছে। হাসিটা নিভে গেল। ক্যাপটি আবার মাথায় দিলেন। তারপর হাসলেন। উইশ করে বললেন, আবার গজাবে। সবাই এ কথাটি জানে।

যারা তাঁর বই পড়ে তারা তাঁকে জানে। যারা পড়েনি তারাও তাঁকে জানে। এটা একটা ম্যাজিক। এভাবে এর আগে বাংলাদেশে আর কে সবার হতে পেরেছিলেন? তিনিই প্রথম। তিনি ম্যাজিক্যাল। এই ম্যাজিক তার কলমে ছিল। এখন অক্ষরে থাকবে। আমরা এই অক্ষরকে ভালোবাসব। এই অক্ষরকে দুষব। অক্ষরই সত্যি।

এটা গভীরতম সত্যি বলেই এবার তাঁর ম্যাজিক অক্ষরকে সত্যিকারের অক্ষরের মুখোমুখি হতে হবে। টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হবে। এভাবেই কালক্রমে নির্ধারিত হবে তাঁর নতু ন করে বাঁচা-মরা। সেখানে কোনো প্রকাশক নয়_ পাঠকই শেষ কথা। এই প্রকাশকই তখন তাদের দরকারের জন্য আরেকজন হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজে বের করবে। এটাই নিয়তি। এটাই নিয়তির পরিহাস। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর অক্ষর থেকে 'জল পড়ানো ও পাতা নড়ানোর' মতো অমিত প্রতিভা নিয়ে এই ফ্রেমবন্দি হয়েছিলেন। সেই ফ্রেম ভেঙে এবার তিনি বের হলেন।

এর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। বেলভ্যু হাসপাতালে। তখন দুপুর ১.২০। খবরটি দেখেছিলাম কবি-দার্শনিক মঈন চৌধুরীর ফেসবুক ওয়ালে। বিডিনিউজের রাজু আলাউদ্দিন জানতে চাচ্ছেন খবরটি সত্যি কি-না? গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে ফোন করলাম। তাঁর ফোন বিজি। ড. পূরবী বসুকে ফোন করেছি। তিনি বাসায় নেই। বেরিয়ে গেছেন। সাংবাদিক মঞ্জুর আহম্মেদকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি আঁতকে উঠলেন_ সে কী করে হয়? গল্পকার-চলচ্চিত্রকার আনোয়ার শাহাদাত ঘুমিয়েছিলেন। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহাকে ফোনে ধরলেন। বিশ্বজিৎ সাহা জানালেন_ খবরটি সত্যি নয়। দুপুর বারোটায় তিনি দেখে এসেছেন হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে আছেন। এগুলো গুজব। বিড়বিড় করে বলেছেন_ গুজবই যেন হয়। আর কিছু নয়। কিন্তু সংস্কৃতিজন তানভীর রাব্বানী আমাকে জানালেন _ খবরটি সত্যি। তানভীর গাড়ি

ছোটালেন ম্যানহাটানের বেলভ্যু হাসপাতালে যাবেন। ফোন রেখে দিয়েছেন। তানভীরের গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তখন দুপুর ১.৫০। এর মধ্যে ৩০টি মিনিট চলে গেছে। তিনি চলে গেছেন। নিউইয়র্কে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের আকাশে তখন রাত। চাঁদ উঠেছে। ফুল ফুটেছে। কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

আজ হুমায়ূন আহমেদ নিউইয়র্কের বেলভ্যু হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন। একা চলে গেছেন। একাই চলে যেতে চান। যেতে যেতে একটি বালকের কাছে ধরা পড়েছেন। বালকটির মুখে কে একজন বাংলাদেশের পতাকা এঁকে দিয়েছে। সেই তুলিটি নিয়ে বালকটি এখন হুমায়ূন আহমেদের মুখে আঁকবে তার নিজের মুখটি। সেই মুখটি বাংলাদেশের। সেই মুখটি মধুর। মধুর, তোমার শেষ নাহি যে পাই।

হুমায়ূন আহমেদ : যা কিছু প্রথম

গল্পের বই পড়া

সিলেটের মীরাবাজারে থাকতেন তখন কাজলরা। গত শতকের পঞ্চাশের দশক। স্কুল ছুটির পর কাজল একদিন একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েন। গাছপালা ছাওয়া বড় বাড়ি। সিলেট এমসি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এ কে রায় চৌধুরীর বাড়ি ছিল সেটি। বাড়ির বাগানে ঢুকে কাজল দেখলেন , দূরে একটা গাছের নিচে পাটি পেতে ১৬-১৭ বছরের একটি মেয়ে উপুড় হয়ে বই পড়ছে। মেয়েটির নাম শুক্লা, প্রফেসর সাহেবের মেয়ে। পরিচয় হলে শুক্লাদি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাওয়াল। মিষ্টির লোভে কাজল পরের দিনও গেলেন। তৃতীয় দিন গেলেন ছোট বোন শেফালিকে নিয়ে। এদিন আর মিষ্টি জোটেনি , তবে 'ক্ষীরের পুতুল' মিলেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বইটি কাজলকে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। এই বইটিতে আছে সেই গল্প - রাজার দুই রানি, দুয়ো আর সুয়ো। সুয়ো রানির সুদিন। রাজার আদর -যতেœ থাকে। আর দুয়ো রানির দুর্দিন। ভাঙাচোরা ঘরে থাকে। বাণিজ্যে যাওয়ার আগে দুই রানির কাছেই জানতে চাইল রাজাñ কার জন্য কী আনবে? সুয়ো রানি চাইল অনেক কিছুñ মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর হারñ আরও কত কী! দুয়ো রানি চাইল একটা পোড়ামুখো বাঁদর। রাজা এক আনা দিয়ে একটি বাঁদর কিনে আনল। ওই বাঁদরটাকেই সন্তানের মতো লালন-পালন করতে লাগল দুয়ো রানি। এরপর একসময় নিঃসন্তান রাজাও পেল ছেলে। দুয়ো রানির দুঃখ দূর হলো।

ক্ষীরের পুতুলই কাজলের পড়া প্রথম গল্পের বই। এই কাজলই আমাদের হুমায়ূন আহমেদ। ক্ষীরের পুতুলের পর থেকে তার বই পড়ায় আগ্রহ তৈরি হলো। তাদের বাড়িতেই বাবা ফয়জুর রহমানের গড়ে তোলা বড় পাঠাগার ছিল। বাবা অবশ্য ওই বয়সে গল্পের বই পড়তে দিতে আগ্রহী ছিলেন না। বইয়ের আলমারি তালাবদ্ধ করে রাখতেন। তবে কাজল পড়তেন ঠিকই, চুরি করে করে। একদিন বাবার হাতে ধরা পড়ে

গেলেন। বাবা অবশ্য রাগ করেননি। কাজলকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের গ্রন্থাগারে। অনেক বই ছিল সেখানে। কাজলকে গ্রন্থাগারের সদস্য করে দিলেন ফয়জুর রহমান। ওই পাঠাগারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিল ওই কাজলই।

প্রথম লেখা

বাবার চাকরিসূত্রেই অনেক জায়গায় থেকেছেন কাজলরা। তখন ছিলেন দিনাজপুরের জগদ্দলের এক জমিদারবাড়িতে। জমিদারের ছিল অনেক কুকুর। দেশান্তরি হওয়ার সময় একটি কুকুর যায়নি জমিদারের সঙ্গে। কুকুরটির নাম ছিল বেঙ্গল টাইগার। কুকুরটা কাজলের ন্যাওটা হয়ে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। একদিন বাড়ির মন্দিরের চাতালে ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন কাজল। হঠাৎ তারা একটা কেউটে সাপকে দরজার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসতে দেখলেন। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না তারা। ঠিক তখনই সাপটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেঙ্গল টাইগার। মরার আগে সাপটিও ছোবল দিয়ে যায় কুকুরের গায়ে । দুদিন পর বিষক্রিয়া শুরু হয়। বেঙ্গল টাইগারের শরীর পচে গলে যেতে থাকে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায় কুকুরটা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বেঙ্গলকে গুলি করে মেরে ফেলেন বাবা। ঘটনাটা গভীর দাগ কাটে কাজলের মনে। আমাদের বেঙ্গল টাইগার নামে একটা লেখা লিখে ফেলেন কাজল। তার বাবা অবশ্য তাদের গল্প-কবিতা লিখতে উৎসাহ দিতেন। বিষয়ও নির্দিষ্ট করে দিতেন। ভালো লেখকের জন্য পুরস্কারও ছিল। তাদের বাড়িতে সাহিত্যের আসরও বসত নিয়মিত। তবে নিজে থেকে তার প্রথম লেখা ছিল আমাদের বেঙ্গল টাইগার।

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস

১৯৭০ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে থাকেন তখন হুমায়ূন। ‘নন্দিত নরকে’ উপন্যাসটি হলে বসে লেখা। দেশ স্বাধীন হলে পরে উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো ‘মুখপত্র’ নামের একটি সংকলনে। আহমদ ছফা উপন্যাসটি পড়লেন। তিনিই এটিকে বই আকারে বের করার উদ্যোগ নিলেন। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে নন্দিত নরকে বের হলো খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং প্রকাশনী থেকে। মলাট ছিল বোর্ডের আর দাম রাখা হয়েছিল সাড়ে তিন টাকা। প্রচ্ছদ করেছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল , নন্দিত নরকবাসী মা-বাবা, ভাইবোনদের। নন্দিত নরকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০। এই ছোট পরিসরের ভেতরেই হুমায়ূন আহমেদ ফুটিয়ে তোলেন একটি মধ্যবিত্তের জীবন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্বেচ্ছায় লিখেছিলেন বইটির ভূমিকা। সেখানে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, ‘বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর , এক দক্ষ

রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জঃ§লগ্ন যেন অনুভব করলাম।' বেলাল আহমেদের পরিচালনায় উপন্যাসটির চলচ্চিত্র রূপ মুক্তি পায় ২০০৬ সালে।

প্রথম ছাপা হওয়া গল্প

কাজলের প্রথম ছাপা হওয়া গল্পটা নিয়ে একটা মজার কাহিনি আছে। তখন তিনি ক্লাস সেভেনে পড়েন। স্কুল থেকে একটা ম্যাগাজিন বের হবে। সেখানে গল্প দিতে হবে। কাজল একটা ভূতের গল্প লিখলেন। ব্যাপারটা নজরে পড়ল বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদের। পুরো গল্পটা তিনি পড়লেন। শেষে বললেন , 'হয়েছে, তবে অনেক কারেকশন লাগবে। কলম দে।'

কাজল কলম দিলেন। ফয়জুর রহমান কাটাকাটি করে ছেঁড়াবেড়া করে দিয়ে বললেন , 'কপি করে আন।' কপি করে আনার পর আবার কাটাকুটি। এ ভাবে তৃতীয় দফা কাটাকুটির পর যা অবশিষ্ট রইল , সেটা হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়, 'আর যাই হোক আমার গল্প রইল না। আমার গল্পে একজন বুড়ো মানুষের হুঁকো টানার কথা ছিল। সেখানে কলকের বিষয়ে কোনো কথা নেই। বাবা কলকের দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। সেই কলকে তার দিয়ে মোড়া, কোনা সামান্য ভাঙা ইত্যাদি।' কাজল সেই গল্পই জমা দিল। গল্প ছাপা হলো।

প্রথম উপন্যাস লেখা

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুটিতে বাড়ি গেছে পিরোজপুরে। বর্ষার দিন ছিল। সন্ধ্যা মিলিয়েছে কিছুক্ষণ হয়। খুব বৃষ্টি। হুমায়ূন রসায়নের বই খুলে বসেছে। খাতায় টুকটাক নোট নিচ্ছে। ঞয ব ঃবৎস 'সধপৎড়সড়ষবপঁষব' ধিং ভরৎংঃ ংঁমমবংঃবফ নু ঝঃধঁফরহমবৎ -লিখেই পরের বাক্য লিখে বসলেন, 'বাস থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলাম।' কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি। একের পর এক লাইন লিখে গেলেন একটি নীল মলাটের খাতায়। এত দ্রুত লিখলেন যে তিন দিনের মধ্যে উপন্যাস শেষ করে ফেললেন। লেখা হয়ে গেল 'শঙ্খনীল কারাগার'। হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রথম উপন্যাস।

হুমায়ূন চাইলেন বাবাকে লেখাটি পড়তে দেবেন। সরাসরি বলতে পারছিলেন না। তাই বাবার অফিসে গিয়ে টেবিলের ফাইলের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন খাতাটি।

ফয়জুর রহমানও সরাসরি ছেলেকে কিছু বললেন না। সন্ধ্যাবেলা মাগরিবের নামাজ শেষ করে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আল্লাহ পাক তোমার বড় ছেলেকে লেখক বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে ন। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

পরিচালনায় প্রথম ছবি ‘আগুনের পরশমণি’

প্রথম দিনের শুটিং। লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলতে লজ্জা লাগছিল হুমায়ূন আহমেদের। ছোট একটা দৃশ্য। প্রথম তিনটি শব্দ মাথা নিচু করে বললেন। দৃশ্য শেষ হলো। সবাই হাততালি দিলেন। কিন্তু ক্যামেরাম্যান তার দিকে ঠায় তাকিয়ে। হুমায়ূন আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? ক্যামেরাম্যান বললেন, তিনি ‘কাট’ বলেননি, তাই ক্যামেরা বন্ধ করেননি। এর মধ্যেই সব রিল শেষ হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, পরিচালক না বলা পর্যন্ত ক্যামেরা বন্ধ করতে পারেন না ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বলেন অভিনেতা আবুল হায়াত , ‘অত্যন্ত সহজ কথায় তিনি সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন। তার সঙ্গে কাজ করা এবং তার বন্ধুত্ব আমার জন্য বিরাট পাওয়া।’ ১৯৯৫ সালে মুক্তি পায় হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত প্রথম ছবি ‘আগুনের পরশমণি’। মুক্তিযুদ্ধের ওপরে নির্মিত এই ছবি তে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন আসাদুজ্জামান নূর, আবুল হায়াত, বিপাশা হায়াত ও ডলি জহুর। ছবির সূচনা সংগীতও হুমায়ূন আহমেদের করা। ছবির সংগীত পরিচালনা করেন সত্য সাহা। এক ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের ছবিটি সে বছর সেরা ছবি ও সেরা পরিচালকসহ আটটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পু রস্কার পায়।

প্রথম কল্পবিজ্ঞান

হুমায়ূন আহমেদ কল্পবিজ্ঞান কাহিনির অত্যন্ত ভক্ত পাঠক হিসেবে। বলেছিলেন, ‘যখন পড়ার মতো কল্পকাহিনি পাই না, তখন নিজেই লিখি যেন পড়তে পারি।’ তার লেখা প্রথম কল্পবিজ্ঞানের বই ‘তোমাদের জন্য ভালোবাসা’।

আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করছি , কাহিনিটা তার চেয়ে কয়েক হাজার বছর পরের। ধারেকাছে তৈরি হয়ে গেছে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। মানুষের সমকক্ষ কিংবা বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ মিলেছে এখানে - ওখানে। ওদিকে টাইফা গ্রহে থাকে চতুর্মাত্রিক প্রাণী। সম্মিলিত বুদ্ধির জোরে চলে তারা। সে কারণে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান। টাইফাবাসীর ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হতে চলেছে পৃথিবী। মাত্র কয়েক মাস তার আয়ু। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ মহামান্য ফিহার একটি সমীকরণে কোনো রকমে রক্ষা পায় পৃথিবী।

‘তোমাদের জন্য ভালোবাসা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এরপর ‘তারা তিনজন’, ‘অন্য ভুবন’, ‘ইরিনা’, ‘ফিহা সমীকরণ’, ‘নি’, ‘ওমেগা পয়েন্ট’সহ অনেক কল্পবিজ্ঞান লিখেছেন। পেয়েছেন জনপ্রিয়তাও। এ দেশে কল্পবিজ্ঞানও জনপ্রিয় হয় তার হাত দিয়ে।

প্রথম কবিতাটা ছাপা হয় বোনের নামে

কবি হওয়ার সাধ ছিল তারও। নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সোফায় বসে অফিসার অফিসার ভঙ্গিতে লিখে ফেললেন কবিতা। দুই ঘণ্টা কঠোর শ্রম দিয়ে শেষ করলেন ১২ লাইনে। ছোট বোন মমতাজ আহমেদের নামে পাঠিয়ে দিলেন দৈনিক পাকিস্তানের মহিলা পাতায়। বোনটি তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী। হুমায়ূন দেখতে চেয়েছিলেন, সেটি ক্লাস টেনে পড়া একটি কিশোরীর কবিতা হিসেবে চালানো যায় কি না। পরের সপ্তাহেই ছাপা হয়ে গেল! পরে এই কবিতার দুটি লাইন অবশ্য শঙ্খনীল কারাগার উপন্যাসে রাখা হয়েছেÑ ‘দিতে পারো এক শ ফানুস এনে/ আমার আজ ঃ§ সলজ্জ সাধÑ একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।’ এভাবে তিনি বেশ কিছু কবিতা দৈনিক পাকিস্তানে ছাপিয়ে ফে লেছিলেন। তবে এর আগে স্বনামেই স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেটি ছিল ইংরেজিতে। ইংরেজিতে লেখার কারণও ছিল। বাংলায় বেশ কয়েকটি জমা দিয়েছিলেন, অখাদ্য বলে ফেলে দিয়েছিলেন শিক্ষক। বলেছিলেন, ইংরেজি সেকশনে কোনো লেখা জমা পড়েনি, লিখে আনলে ছেপে দেবেন। ব্যস, সেই লিখতে বসা। সেই ষষ্ঠ শ্রেণীতেই লিখে ফেললেন ঈশ্বরবিষয়ক একটি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা। নাম ‘গড’। খবঃ ঃযব বধৎঃয সড়াব/ খবঃ ঃযব ংঃঁহ ংযরহব/ খবঃ ঃযবস ঃড় ঢ়ৎড়াব/ অষষ ধৎব রহ ধ ষরহব. এই কবিতা পড়ে স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক তো মুগ্ধ। তিনি এটি ক্লাসে পাঠ করে শোনালেন আর ব ললেন, ‘হুমায়ূন তুই ইংরেজি কবিতা লেখার চর্চা ছাড়বি না। আমি দোয়া করে দিলাম। খাস দিলে দোয়া করে দিলাম।’

প্রথম চাকরি

তখনো এমএসসির রেজাল্ট হয়নি। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগের বারান্দায় হাঁটছিলেন। এমন সময় ডেকে পাঠালেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান খোন্দকার মোকাররম হোসেন। হুমায়ূন আহমেদ ভয়ে ভয়ে ঢুকলেন চেয়ারম্যান স্যারের রুমে। তিনি কিছু একটা লিখছিলেন। লেখা শেষ করে হুমায়ূন আহমেদের হাতে সেটা দিয়ে বললেন, ‘তুমি ময়মনসিংহ অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে চলে যাও। চেয়ারম্যান কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে এই চিঠিটা দেবে। তুমি লেকচারারের একটা চাকরি পেয়ে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পোস্ট খালি নেই। খালি থাকলে এখানেই তোমাকে নিতাম।’

হুমায়ূন আহমেদ ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয়ে গেলেন। এটাই তার জীবনের প্রথম চাকরি। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন লেকচারারের বেতন ছিল ৪৫০ টাকা। অনার্স ও এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস থাকলে দুটো ৫০ টাকার ইনক্রিমেন্ট পেয়ে হতো ৫৫০ টাকা। সেখানে হুমায়ূন আহমেদকে চারটা ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলো। বেতন ৬৫০ টাকা। কয়েকজন টিচার মিলে ইউনিভার্সিটির কাছেই একটা পাকা

বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আলাদা একটা রুম নিয়ে থাকতেন তিনি। কাজের লোক এসে রান্না করে দিয়ে যেত।

আমার দেখা হুমায়ূন আহমেদ
নাজমা চৌধুরী

এ লেখাটা আমার না লিখলেই নয়। আর ছাপাতেও হবে যেভাবেই হোক, হুমায়ূন আহমেদের জন্য। সেই হুমায়ূন আহমেদ, যাঁর এদিকটা নিয়ে কোন পত্রপত্রিকায় বা টিভি চ্যানেলে কোনো উল্লেখ নেই। আমার মনে হলো, তার কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা রয়ে যাবে, যদি আমি তার এই দিকটা আর দশজনের কাছে তুলে না ধরি।

১৯৭৪ থেকে এ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার মোট তিনবার যোগাযোগ হয়েছে। প্রথম এবং শেষবার অতি স্বল্প সময়ের জন্য। তেমন উল্লেখ্য নয়। তবু বলি , প্রথম আমিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে যাই একটা পরিচিতির সূত্র ধরে , তার লেখা 'নন্দিত নরকে' পড়ার পর। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করলেন, তিনি আমার বাবা ড. মতিন চৌধুরীর কাছে একটি বিশেষ কারণে কৃতজ্ঞ। তাকে দেখার জন্যে নয়। তিনি কত বড় মাপের লেখক বা পরবর্তীকালে হবেন সে কারণেও নয়। তার লেখা কত সাবলীল, রচনাশৈলী কত সমৃদ্ধ ইত্যাদির জন্য নয়। সালাম জানাতে গিয়েছিলাম যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি লিখেছেন এবং সমাজের, সংসারের যে অনুচ্চারিত সত্য অথচ বিকৃত রূপকে অসীম নির্ভী ক সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, সেই সমাজ বিপ্লবীকে সালাম জানাতে। উনি আমার সালাম গ্রহণ করলেন। তার স্ত্রী আমাকে এক পেয়ালা চা আমাদের মতো মধ্যবিত্তের সৌজন্য মিশিয়ে পরিবেশন করলেন। উনি আমাকে তার স্বাক্ষর করা 'নন্দিত নরকে' উপহার দিলেন। ওখানেই ওই অধ্যায়ের ইতি।

এরপর কেটে গেছে বহু বহু বছর। তার কিছু লেখা তার পরও পড়েছি। নাটক দেখেছি। হেসেছি। কেঁদেছি। দেখা করিনি, দেখা হয়ওনি।

দ্বিতীয়বার দেখা হলো '৯৮ সালে কর্মসূত্রে। তখন আমি একটি আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য সংস্থার আবাসিক অফিসে কর্মরত ছিলাম। স্বাস্থ্য বিষয়ে তৃণমূল মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'এন্টার এডুকেট' বা 'বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা' বিষয়ক সিরিয়াল তৈরি করানো এবং তা টেলিভিশনের প্রচার আমার কাজ ছিল। এশিয়াটিকের সুত্রে আসাদুজ্জামান নূরও যুক্ত ছিলেন এই প্রকল্পের সঙ্গে। নূরের সাহায্যেই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি রাজি হলেন। এর আগেও তিনি এমন ধারার আরও একটি কাজ করেছেন। আমি তখন দেখেছি কী গভীর আর তীব্র আবেগে তিনি অনাদৃত , অবহেলিত এসব মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক বাণী। তিনি 'স্লোগান'কে 'ললিত বাণীতে'

পরিণত করেছেন, আমাদের চোখের সামনে। শুষ্ক বিষয়বস্তুকে করে তুলেছেন একধরনের নান্দনিক আন্দোলন নিপুণ কারিগরের মতো। এসব করেছেন তিনি তার লেখা দিয়ে নয় , এসব সৃষ্টি শুধু লিখতে জানলে বা নামকরা লেখক হলেই হয় না, তার জন্যে থাকতে হয় 'চান্নি পসর রাতের হৃদয়', হতে হয় একজন আলোকিত সাদামনের স্রষ্টাÑ যিনি সৃষ্টির সকলকে ভালোবাসেন , মিশে যান আলো বাতাসের মতো তাদের সঙ্গে, নিজেকে জাহির না করে।

তার সঙ্গে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতাবিষয়ক ম্যাসেজের কোনো দিক স্পষ্ট না হলে আগ্রহী শিশুর মতো জানতে চাইতেন, বারবার বুঝতে চাইতেন। তার কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের কাজ , এত স্বল্প পারিশ্রমিক, যার জন্য প্রচুর কল্পনা করতে হবে, তিনি অনায়াসে তা 'না' বলে দিতে পারতেন। ধরে নিলাম আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বের কারণে রাজি হয়েছেন এ ধরনের নন -রিওয়ার্ডিং কাজ করতে, কিন্তু সে জন্যও এমন গভীর, আন্তরিক, আািক সম্পর্ক তৈরির প্রয়োজন ছিল কি? যদি-না তিনি অন্তর থেকে মানুষের জন্য 'যদি কিছু করা যায়' এ মতবাদে নিবেদিতপ্রাণ না হতেন। ওনাকে শুধু কোন কোন বিষয় খণ্ড নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে , তা বলে দেওয়া ছিল আমার কাজ। তাতে রংতুলি মেশানো , সর্বজনগ্রাহ্য ছবি আঁকা আর ঘরে ঘরে তা টাঙিয়ে দেওয়া ছিল তার কাজ। বলতে হলে এমনটাই বলতে হয়। সে কাজ তিনি করেছেন অন্তরের সমস্ত মাধুর্য ঢেলে। তিনি যে এসব কাজে সফল হয়েছেন , তার প্রমাণ আমরা যারা জীবিকার সূত্রে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম , তারা মাঠ আর উঠোন থেকে উঠে আসা তার আন্তরিকতা আর ডিপ ইমোশনাল ইনভলভমেন্টসের ফসল কেটেছি। তিনি বহন করেছেন, আমরা ফল ভোগ করেছি কর্মক্ষেত্রে। তৃণমূলের মানুষগুলো কিছুটা হলেও সচেতন হয়েছেন , হয়েছেন উপকৃত।

এ সময় আমি বহুবার 'নুহাশপল্লী'তে গিয়েছি নাটকগুলোর শুটিংয়ের সূত্র ধরে। তিনি আমাদের অফিসে এসেছেন, ঠিক সময়মতো বহুবার প্রি-প্রোডাকশন মিটিংয়ের জন্য। মিটিং পরিনত হয়েছে মহা আড্ডায়। আর তারই মাঝে চলছে কাজের কথা, তৈরি হচ্ছে স্ক্রিপ্টের রূপরেখা।

স্ক্রিপ্ট তৈরি হলে তা পড়ে শোনাতেন নিজেই। ম্যাসেজগুলো ঠিক থাকলে কোনো সংযোজন আর বিয়োজনকে চট করে মেনে নিতেন নাÑ সেখানে তিনি অটল, তিনি যে এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন তার ক্ষীরের পুতুলগুলো। চরিত্রের প্রয়োজনে অনেক নামি নাট্যজনকেও হাজির করেছেন নিজ উদ্যোগে। জনশিক্ষামূলক, সচেতনতামূলক নাটকÑ এজ স্পোকস ম্যান অব দ্য ম্যাসেজ। যার প্রয়োজন এ ধরনের ইন্টার-এডুকেট অনুষ্ঠানের সাফল্য এনে দেওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় , যা কিনা আমাদের সাধ্যের বাইরে

ছিল। তিনি সেটা অনুধাবন করতেন এবং তাদের উপস্থিত করে ছাড়তেন। এটা তিনি করতেন তার সমাজ সচেতনতাÑসামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। তার সঙ্গে আমাদের চুক্তিবহির্ভূত ছিল তার এ ধরনের সম্পৃক্ততা।

(হুমায়ূন আহমেদের তৈরি জনস্বাস্থ্যে, জনশিক্ষায়, শিশু শিক্ষায়, সামাজিক সচেতনতায় বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষামূলক নাটকগুলোর নামÑ সবুজছাতা, সবুজছায়া, এই মেঘ এই রৌদ্র, রংধনু, জোসনার ফুল, গাড়ি চলে না। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এগুলো তিনি লিখেছিলেন এবং নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। যার প্রায় সবই বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে।)

খেতে আর খাওয়াতে ভালোবাসতেন। তার ধানমন্ডির ২০ নং রোডের বাসায় যখন রিহার্সেল শুনতে মাঝেমধ্যে যেতাম, শুরু থেকে শেষ অবধি একে একে আসত নানা ধরনের খাবার। পরিবেশন করতেন তার স্ত্রী ‘গুলতেকিন’। চমৎকার একটা ঘর (পড়ার ঘর, না বসার ঘর বোঝা মুশকিল) কোনো চেয়ার নেই। মেঝেতে নানান ছাদের, নানা রকম গালিচা আর কুশন তাতেই বসার ব্যবস্থা। মেঝে থেকে প্রায় ছাদ অবদি বইয়ের তাক, অজস্র বই আর বই। বহুক্ষণ নিচে বসতে কষ্ট হতো সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত আমার এবং আরও অনেকের। আমাদের আড্ডা কিন্তু তার কোনো বিকার নেই! ওই আসনেই তিনি স্বচ্ছন্দÑ তার মনোজগতের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সিংহাসন। তার সামনে মাঝেমধ্যে নিজেকে পোকামাকড়ের মতো মনে হতো।

নুহাশপল্লীতে গেলেতো কথাই নেই। যেন তার মেয়ের বিয়ে , তিনি বরকর্তার মতো দেখাশোনা করতেন প্রত্যেকের। দুপুরের খাবার দেওয়া হতো বাঁধানো খোলা চত্বওে , টেবিলের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত খাবার। তার মধ্যে তার পুকুর থেকে ধরা তাজা মাছের ঝোল। কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলেন, আমি রুই মাছের লেজ খেতে ভালোবাসি। নিজের হাতে তুলে দিতেন আমার পাতে। আপত্তি জানালে বলতেন , ‘গুরুদক্ষিণা তো দেয়া হলো না, তাই গুরুকন্যাকে একটু খাতির করছি , বাধা দেবে না।’

একটা জনস্বাস্থ্যমূলক নাটকে তিনি একটি অ বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করলেন। ভিক্ষুকের চরিত্র , যে কিনা ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ায়। নিজের জন্য আর ঘোড়ার জন্য। এই ভিক্ষুকের মাধ্যমেই সচেতনতামূলক ম্যাসেসগুলো বোঝাতেন গ্রামের মানুষদের। তার সঙ্গে মজার মজার সব সংলাপ। আমি আমার দায়িত্ব নাকি ওস্তাদি জানি নাÑ মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম , ব্যাপারটা ঠিক বাস্তব সম্মত নয় বলে। মনে হলো তিনি একটু চটেই গেলেন। বললেন , ‘অসুখে কি শুধু ওষুধই খেতে হয়, চুরি করে কি আমড়া বা আচার খেতে নেই’? একটু মজা থাক নাÑ ভারি কথার মাঝে। তারপর অবশ্য তিনি মুখ গম্ভীর করে (বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে কি না জানি না) বললেন, ময়মনসিংহের কোনো একটি অঞ্চলে নাকি এ ধরনের

ভিক্ষুকের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি নিজে দেখেছেন। এরপর এ নিয়ে আর তর্ক চলে না। ওই ভিক্ষুকের চরিত্রে অভিনয় করলেন বাংলাদেশের নাটক এবং চলচ্চিত্রের অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। হুমায়ুন ফরিদী। চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং জনস্বাস্থ্য সচেতনতায় অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছিল।

এই ছিলেন 'হুমায়ূন'!! অসম্ভবকে সম্ভব করার অসীম, অকল্পনীয়, অলীক চরিত্রের একজন আপাত বেরং, আসলে সাতরঙের এক মানুষ। টক, ঝাল, মিষ্টি দিয়ে তৈরি একজন মানবতাবাদী ক্ষীরের পুতুল।

সাক্ষাৎকার আয়শা ফয়েজ

জব্বার হোসেন: বিয়ের পর তো প্রথম সিলেটে থেকেছেন। সেই সময়টার কথা বলবেন ?

আয়েশা ফয়েজ: সিলেটে প্রথমে ছিলাম রামের দীঘিরপাড়। তারপর বদলি হয়ে গেলাম কোতোয়ালি থানায়। থানায় কোয়ার্টারে ছিলাম দীর্ঘদিন। বাসাটা ভালোই।

প্রথম যখন যাই, তখন আমার শ্বশুর আর আমার বাবা নিয়ে যান। পরের বার যাওয়ার সময় আমার দেবর আজিজ নিয়ে যায়। তখন তো খুব আন্দোলন হয়েছিল। যাওয়ার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের গাড়িতেই একটা মার্ডার হয়ে যায়। রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমি দেখলাম, আরও যারা যাচ্ছিল, সবার মধ্যেই থমথমে ভাব।

জব্বার হোসেন: শুনেছি, প্রথম সন্তান দেরিতে হয়েছিল। সেটা নিয়ে নাকি সবাই উৎকণ্ঠিত ছিল?

আয়েশা ফয়েজ: বিয়ের চার বছর পরে বড় ছেলে হুমায়ূনের জঃ§ হয়। তত দিনে সবাই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। ভাবত যে, বউয়ের বাচ্চা হবে না। আয়েশা নাম থাকলে নাকি বাচ্চা হয় না। আমার এক শাশুড়ির নাম ছিল আয়েশা, তার বাচ্চা হয়নি। এরপর সিলেটে গিয়ে বুঝতে পারা গেল।

(আয়েশা ফয়েজ। হুমায়ূন আহমেদের রতœগর্ভা মা। বছর কয়েক আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে সুযোগ হয়েছিল তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়ার। আলাপচারিতা য় হুমায়ূন আহমেদ প্রসঙ্গে অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ নিজেও সাক্ষাৎকারটি পড়ে প্রশংসা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী এই লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাক্ষাৎকারটির 'হুমায়ূন' অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন)

আমি পরিবারের বড় মেয়ে, ফয়জুর রহমান আহমেদ সাহেবও তার পরিবারের বড় ছেলে। সবার মধ্যে একটা খুশি ছড়িয়ে পড়ল। সবাই খুব হইচই , আনন্দ করল। কারণ, সবাই ব্যাপারটা নিয়ে খুব আতঙ্কের মধ্যে ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, আমার শাশুড়ি খুব সরল মানুষ ছিলেন। বাসায় ফকির -টকির এলে জিজ্ঞেস করত কিগো, তোমার নাতি-টাতি কি হয়েছে? শাশুড়ি জবাব দিত। নাতি হলে কি তোমরা দেখতে না, তোমরা শুনতে নাÑ এ রকম হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলতেন। অনেক তাবিজকবচ করা হয়েছিল। পরে হুমায়ূন হলে সবাই সবকিছু ভুলে গেল। সন্তান হওয়ার সময় শাশুড়ি তো আমাকে ঘর থেকেই বের হতে দিতেন না। সব সময় আমার পিছে পিছে থাকতেন। তখন তো কী যেন একটা ঝাড়– ছিল। তার মধ্যে জাল, লোহা, গাছের পাতা-টাতাÑ এসব অনেক কিছু দিয়ে ঝাড়া হতো। একটু বাইরে গেলেই আমার শাশুড়ি আমাকে ঝেড়ে দিতেন, যাতে খারাপ নজর না লাগে। ব্যাপারটা একটা অত্যাচারের মতো ছিল। তখন বউরা যে শাশুড়ির ওপর একটা কথা বলবে এমন সাহস ছিল না। তিনি যা-ই বলতেন, চুপ করে মেনে নিতে হতো। তবে তিনি আমাকে খুব আদর করতেন।

(হুমায়ূনের জš§ আর ইংল্যান্ডের রানির ছেলে চার্লসের জš§ একই সময়ে। তিনি আবার বই দেখে অ্যাস্ট্রোলজি চর্চা করতেন। তার কথা শুনে আমি হাসলাম। তিনি বললেন, হাসলে কেন? বললাম, কোথায় ইংল্যান্ডের রানির ছেলে আর কোথায় আমার ছেলে)

তারপর ওষুধ খাওয়া নিয়ে আমার নানিশাশুড়ি খুবই খেপে গেলেন হুমায়ূনের বাবার ওপর। বললেন , কী সাহস দ্যাখো, ওষুধ খাওয়াইতেছে। তখন তিনি বললেন , যে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, সে অনেক বুদ্ধিমান, অনেক বোঝে। এতে তিনি আরও রেগে গেলেন।

জব্বার হোসেন: বিয়ে হওয়ার পর প্রথম ঘরে ওঠার স্মৃতি...

আয়েশা ফয়েজ: প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়েছি। বউ ওঠানো হয়েছে, আÍীয়স্বজনে ঘর ভরে গেছে। আমি তো এর আগে হুমায়ূনের বাবার কণ্ঠ শুনিনি। কিন্তু অনেক রাগারাগি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। ঘটনাটা হয়েছিল কি, তখন সেই বাড়িতে নিয়ম ছিল, নতুন বউ এলে বউকে পান্তা ভাত আর শাড়ি দিয়ে বলবে Ñ এই তোমাকে ভাত-কাপড় দিলাম। এটা বউ ঘরে তোলার একটা রীতি। কিন্তু হুমায়ূনের বাবা এটা মানবেই না। তার পর থেকে ওই নিয়ম আর কখনোই মানা হয়নি।

জব্বার হোসেন: প্রথম সন্তান জন্মের অভিজ্ঞতা যদি বলেন। প্রথম সন্তান হওয়ার স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা বলবেন?

আয়েশা ফয়েজ: আমার চাচা ছিলেন হুমায়ূনের বাবার বন্ধুমানুষ। তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। সবাই তো তখন অসম্ভব রকমের খুশি। আমার বাবার ছিল তিন ভাই। প্রত্যেকে আলাদাভাবে মিষ্টি নিয়ে এলো । খুব খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ অনুষ্ঠান করল।

তারপর আমি আবার সিলেটে এলাম। সিলেট থেকে পরে আবার গেলাম। তারপরে হুমায়ূনের জন্ম হলো। হুমায়ূনের জন্মের এক মাস পরে তার বাবা দেখতে এলেন। সবাই খুব উদ্গ্রীব হয়ে আছে যে দেখবে , তখন এভাবে কেউ সরাসরি এসে বাচ্চা দেখত না। পরে রাতের বেলা তিনি বললেন, জানো হুমায়ূনের জন্ম আর ইংল্যান্ডের রানির ছেলে চার্লসের জন্ম একই সময়ে। তিনি আবার বই দেখে অ্যাস্ট্রোলজি চর্চা করতেন। তার কথা শুনে আমি হাসলাম। তিনি বললেন, হাসলে কেন? বললাম, কোথায় ইংল্যান্ডের রানির ছেলে আর কোথায় আমার ছেলে।

(সেই ফকির তার বিশাল এক টিনের থালায় ডাল দিয়ে খাচ্ছে, তা দেখে হুমায়ূনের খুব ভালো লাগল। এখন সেও সেভাবে ভাত খাবে, না হলে খাবে না। কী যে পাগলামি তার মাথার মধ্যে ঢুকত! পরে তাকে সেভাবে খেতে দেওয়া হলো)

তিনি বললেন, রানির ছেলে তো রানির যোগ্যতায় বড় হবে, আর তোমার ছেলে নিজের যোগ্যতায় বড় হবে। বরাবরই তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তার ছেলে একদিন অনেক বড় হবে। হুমায়ূন তো বরাবরই পড়াশোনায় ভালো করেছে, যেখানে গিয়েছে সেখানেই ভালো করেছে। ম্যাট্রিক যখন দিল, তখন আমরা তো জানতাম যে এটা হলো সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। প্রথমবার যে কেউ ফেল করবেই, তার পরের বার গিয়ে পাস করবে। সেই জায়গায় রেডিওতে তার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন তো টেলিভিশন ছিল না। তখন বাড়িতে আমার ভাইয়ের বিয়ে ছিল। সবাই মহা খুশি। আমার বাবা প্রচুর মিষ্টি আনলেন। এত মিষ্টি আনলেন , একেবারে মিষ্টিময় হয়ে গিয়েছিল বাড়ি। বাড়ির পাশেই থানা ছিল। থানায় মিষ্টি পাঠানো হলো।

হুমায়ূনের দাদার বাড়িতে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল আমার ভাই আর এক দূর সম্পর্কের মামা। তখন ওদের আবার কাপড়চোপড় দেওয়ার একটা নিয়ম ছিল।

জব্বার হোসেন: প্রথমে হুমায়ূন স্যারের নাম রাখা হয়েছিল কাজল। কে রেখেছিলেন কাজল নামটা?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূনের বাবা কাজল নামটা রেখেছিলেন।

জব্বার হোসেন: কাজল নামটা রাখার পেছনে কোনো কারণ ছিল কি?

আয়েশা ফয়েজ: না, এমনিতেই। নামটা তার ভালো লেগেছিল। পরে যদিও কাজল নামটা আর টেকেনি।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ নামটা কার রাখা?

আয়েশা ফয়েজ: আমার শ্বশুর আর আমার বাবা মিলে প্রথমে নাম রাখল শামসুর রহমান। পরে , হুমায়ূনের বাবা বললেন, বাচ্চার নাম রাখা হবে হুমায়ূন আহমেদ। আমার শাশুড়ি অবশ্য আমাকে সারা জীবন শামসুর মাই ডেকেছেন।

জব্বার হোসেন: তাহলে শামসুর রহমান নাম বদল করে হুমায়ূন আহমেদ রাখা হলো ?

আয়েশা ফয়েজ: হ্যাঁ।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ এবং মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের মধ্যে বয়সের পার্থক্য কত ?

আয়েশা ফয়েজ: চার বছর।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন স্যারের ছবি দেখেছি, শৈশবে মেয়েদের ফ্রক পরা!

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূনের বাবার খুব মেয়ের শখ ছিল। উনি হুমায়ূনকে প্রায়ই মেয়েদে র জামা পরিয়ে রাখতেন। তিনি দীর্ঘদিন হুমায়ূনকে মেয়েদের জামা পরিয়ে রেখেছেন। অনেক ছবিও তুলেছিলেন মেয়েদের জামা পরিয়ে।

জব্বার হোসেন: ছোটবেলায় হুমায়ূন আহমেদ কেমন ছিলেন?

(ছেলেটার বাবাকে আর্মিতে মেরেছে। তার পরও সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তার মানে সে স্পাই। হুমায়ূনকে আর্মিরা প্রচুর টর্চার করেছে। অনেক দিন আটকে রেখেছিল। ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে, তখন টিচাররা গিয়ে উদ্ধার করল)

আয়েশা ফয়েজ: খুব বুদ্ধিমান ছিল। তার প্রতিটা কাজেই বুদ্ধির ছাপ ছিল। কিন্তু খুব দুষ্টু ছিল। আর কেমন যেন একটা পাগলামি করত। হঠাৎ করে হুলস্থুল চিৎকার করত। তার বাবাকে এ কথা বললে বলত, ওর

মধ্যে আলাদা একটা কিছু আছে, যা সাধারণ মানুষের ভেতর নেই। আবার বলত , প্রমথনাথ বিসি এমন ছিল। কোথায় কোথায় ঘুরতে যেত তার ঠিক নেই। কোনো খোঁজখবর নেই। একবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হলো। লঙ্গরখানা দেওয়া হয়েছিল তখন। সে ওই লঙ্গরখানায় গিয়ে খেয়ে আসত। কী রকম? কলাপাতার মধ্যে খাবার দেয়, অনেকখানি ছড়িয়ে যায়, তার দেখতে খুব ভালো লাগে। একদিন ছোট বোন সুফিয়াকেও নিয়ে গেল। পুলিশ ওদের দেখতে পেয়ে নিয়ে এলো আমার কাছে। আমি খুব রেগে গেলাম। বললাম , লঙ্গরখানায় যদি খাওয়া লাগে, তাহলে বাসায় এসেছিস কেন? লঙ্গরখানাতেই যা। খুব রাগারাগি করলাম আমি। ওর বাবা শুনে বলল, ওর মধ্যে বিশেষ কিছু আছে, যেটা অন্যদের মধ্যে নেই। হুমায়ূনের বাবা ছেলের সবকিছু সম্পর্কে একটা ভালো ব্যাখ্যা করতেন।

আরেক দিনের ঘটনা, এক ফকিরকে ভাত খেতে দেওয়া হলো। সেই ফকির তার বিশাল এক টিনের থালায় ডাল দিয়ে খাচ্ছে, তা দেখে হুমায়ূনের খুব ভালো লাগল। এখন সেও সেভাবে ভাত খাবে , না হলে খাবে না। কী যে পাগলামি তার মাথার মধ্যে ঢুকত! পরে তাকে সেভাবে খেতে দেওয়া হলো। এ রকম পাগলামি তার ভেতরে ছিল। যেটা অন্যেরা করত না, সেটা সে করবেই।

জব্বার হোসেন: খেলাধুলা কি করতেন?

আয়েশা ফয়েজ: খেলাধুলা তখন যা ছিল তা -ই করত। তারপর যখন পড়াশোনা আরম্ভ করল, তখন থেকেই আবৃত্তি-টাবৃত্তি করা। বাসার মধ্যেও তার বাবা বিভিন্ন কবিতা পড়াত। রবীন্দ্রনাথের ‘বীরপুরুষ’ একটা কবিতা আছে, এটা তার খুব পছন্দ ছিল। কোনো প্রতিযোগিতায় গেলে প্রাইজ যে সে পায়নিÑ এ রকম হয়নি কখনো।

জব্বার হোসেন: ছবি আঁকা তিনি শিখলেন কীভাবে? হুমায়ূন আহমেদ তো চমৎকার ছবি আঁকেন...

আয়েশা ফয়েজ: আমার সব কটা ছেলেমেয়েই কিন্তু ছবি আঁকতে পারে। কীভাবে ছবি আঁকা শিখল, সেটা আমার কাছেও বিস্ময়। হুমায়ূন খুব সুন্দর ছবি আঁকে। ই কবাল, শাহীন (আহসান হাবীব) এরা তো আঁকেই। ইকবাল তো কার্টুন এঁকে পড়ার খরচও চালাত। এখন জানতে চাইলে বলে যে বড় মামার কাছে শিখেছে। অথচ বড় মামা যে ছবি আঁকতে জানে, সেটা তো আমরাই জানতাম না। আমার ছোট মেয়েটা তো শংকর পুরস্কার পেয়েছিল ছবি এঁকে।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ তার ‘আমার ছেলেবেলা’য় বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা বলেছেন। এ ধরনের শাস্তি দেওয়া হতো কেন? তার দাদি নাকি বিভিন্ন রকমের শাস্তি দিতে ভালোবাসতেন? ছোটদের মার খাওয়াতে ভালোবাসতেন?

আয়েশা ফয়েজ: তিনি তো অনেক ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন। তার ছিল পাঁচ ছেলে , দুই মেয়ে। তাদের শাসনের ভেতর দিয়েই মানুষ করেছেন। আর সবাই যখন বেড়াতে যেতাম , বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে হতো, অনেক রকম দুষ্টুমি করত। আমরা চাইতাম, ছোটরা যা খুশি করুক। তিনি এটা মানতেন না। বলতেন, শাসন করো। মায়েদের বলতেন শাসন করতে, নিজে না করে আমাদেরই বলতেন শাসন করো।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদের বিভিন্ন লেখা থেকে পাওয়া যায়, তার 'হিমু' চরিত্রটা আসলে তার বাবার একধরনের প্রতিকৃতি। আপনার কী মনে হয় ?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূন তার বাবার কোনো আদল থেকে হিমু চরিত্রটা করেছে কি না আমি নিশ্চিত না। তবে হতে পারে। ওর বাবা অনেকটা খেয়ালি ধরনের ছিল। হিমু যেমন অনেকটা খেয়ালি ধরনের , যা বলে তা-ই করে। অন্যদের অনেক কিছুই মেলে না। মানুষটা একটু অন্য রকম ছিল। যখন যেটা ইচ্ছে হতো , করত। যেটাকে সে নিজে ভালো মনে করত, সেটাকেই গুরুত্ব দিত বেশি। আবার হুমায়ূনও কিন্তু তাই। হিমু হয়তো হুমায়ূন নিজেই। হতে পারে অবচেতনভাবে।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ প্ল্যানচেট করেছেনÑ এ রকম একটা ঘটনা বলবেন?

আয়েশা ফয়েজ: তখন আমরা কুমিল্লাতে। ইকবাল ওর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় গেল , খুব হইচই হচ্ছিল। বিরাট বড় বাসা ছিল। সবাই মিলে একদিন প্ল্যান করল, তারা নকল প্ল্যানচেট করবে, ওদের ভয় দেখাবে। তারপর কী কী যেন করল, নির্দিষ্ট সময়ে মোম নিভে গেল। ইকবাল তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে এর মধ্যে নেই। হঠাৎ রাতের বেলা হুমায়ূন ইকবালকে না জানিয়ে আব্দুল হক নামের অডারর্লিকে বলল, তুমি গাছের আগায় একটা দড়ি বাঁধো। দড়ির আরেক মাথা তোমার ঘরের ভেতর রাখবে। রাত যখন আড়াইটা বাজবে, তখন তুমি দুইটা ঝাঁকি দেবে। যখন ঝাঁকি দিল মোমটা নিভে গেল। ভয়ংকর পরিবেশ তৈরি হলো। ইকবালসহ সব ছেলেমেয়ে ভয় পেয়েছিল। তারা সবাই ভয়ে আমার ঘরে এসে শুয়ে থাকল। ভয়ে সবার অবস্থা খারাপ। সকাল হতেই সবাই চলে গেল। এখানে আর থাকলই না। হুমায়ূনের আরও অনেক দুষ্টুমি ছিল। কুমিল্লার বাড়িটা বিশাল ছিল। অনেক বড় দোতলা বাড়ি। বাড়িতে অনেক হাঁস -মুরগি ছিল। হাঁসের ঘরের দরজাটা খুলে দেখতাম , হাঁসে ডিম পেড়েছে কি না। হুমায়ূন সেটা খেয়াল করেছে। সে তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। ও যেদিন চলে গেল, তার পরদিন হাঁসের ঘর খুলে দেখি, সবগুলো হাঁস ডিম পেড়েছে। অনেক ডিম। আমি তো অবাক। বাসায় তখন টেলিফোন ছিল। হুমায়ূন ফোন করে জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার হাঁসে কি ডিম পেড়েছে? আমি বললাম, হাঁসে ডিম পেড়েছে, তুই জানিস কীভাবে ? মানে, সে ডিম কিনে হাঁসের ঘরে রেখে গিয়েছে। এ রকম দুষ্টু ছিল সে!

জব্বার হোসেন: শুনেছি, হুমায়ূন স্যারকেও আর্মিরা মারতে চেয়েছিল?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূনকে একদিন ধরে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আরও তিনটা ছেলেকে নিল, একজন শিক্ষককে নিল, নিয়ে যখন একটা বন্ধ গাড়ির ভেতর ঢুকিয়েছে, তখন তারা বারবারই বলছে, এই ছেলেটার বাবাকে আর্মিতে মেরেছে। তার পরও সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তার মানে সে স্পাই। হুমায়ূনকে আর্মিরা প্রচুর টর্চার করেছে। অনেক দিন আটকে রেখেছিল। ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে, তখন টিচাররা গিয়ে উদ্ধার করল। হুমায়ূন ঘরে ফিরে গিয়ে দেখে, ঘরে তালা দেওয়া।

(হুমায়ূন আহমেদ ছফাকে অনেক পছন্দ করত, আবার আহমদ ছফাও হুমায়ূনকে অনেক পছন্দ করতেন। হুমায়ূনের প্রথম বই 'নন্দিত নরকে'। এই বইটি আহমদ ছফাই অনেক চেষ্টা করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন)

জব্বার হোসেন: ঘটনা কোথায়?

আয়েশা ফয়েজ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই দলটার মধ্যে কেবল হুমায়ূনই বেঁচে ছিল, বাকি সবাইকে গুলি করে মেরেছিল।

জব্বার হোসেন: ১৬ ডিসেম্বর আপনি কোথায় ছিলেন? দেশ স্বাধীন হয়েছে খবরটা আপনি কীভাবে পেলেন? কেমন লাগল?

আয়েশা ফয়েজ: দেশ স্বাধীন হওয়া তো অনেক বড় ব্যাপার। তখন তো সব মানুষের একটাই কথা ছিল ñ পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে বাঙালি পারবে না। তারপর বিজয় তো অসম্ভব ব্যাপার। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হলো। তখন হুমায়ূন আর ইকবাল ঢাকায়। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কে জানে তারা কোথায় আছে, কেমন আছে। পুরো দেশে রাস্তাঘাট নেই, বাস-ট্রেন চলে না, তাদের কোনো খোঁজ জানি না। দীর্ঘদিন পর তারা পায়ে হেঁটে একদিন মোহনগঞ্জে হাজির হলো।

যুদ্ধের দিনগুলো ঢাকা শহরে লুকিয়ে কাটিয়েছে। ঢাকায় তখন তাদের খোঁজখবর রাখতেন আনিসুর রহমান ঠাকুর, আমাদের এক মামা। বিপদের সময় আমাদের এত বড় সহায় ঢাকা শহরে আর কেউ ছিল না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের নতুন জীব ন শুরু হলো।

জব্বার হোসেন: যুদ্ধের পর তো নতুন জীবন। এক অনিশ্চয়তার দিকে একরকম জীবন ছেড়ে দেওয়া। সেই অভিজ্ঞতার জায়গাটা থেকে বলবেন, যুদ্ধের পর বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা?

আয়েশা ফয়েজ: আমার ভাই এবং বাবা তারা সব সময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন তো আমার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। কী জানি আমি নিজেও চিন্তা করি, সময়গুলো কীভাবে পার হয়েছিল! কীভাবে মান-সম্মানের সঙ্গে আল্লাহ দুনিয়ার জীবন পার করে দিল।

পেনশন তুলতে অনেক দুর্ভোগ হয়েছিল। পাকিস্তানি পেনশন তো খুবই সামান্য। আবার ছেলেমেয়ের বয়স কমিয়ে নাকি পেনশন নেওয়া লাগে। আমি পেনশন পেয়েছি খুবই সামান্য। আরেকটা ফান্ড থেকে বোধ হয় মাসে ২০০ টাকা দিত। কাগজপত্রে হুমায়ূনের নাম শামসুর রহমানই ছিল। যখন ওই পেনশন ছেলের নামে দিয়েছে, তখন অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে টাকা পেতে হয়েছে। খুবই সামান্য টাকা। কী জানি আল্লাহর বোধ হয় একটা রহমত ছিল। কীভাবে ছেলেমেয়েরা এত বড় হলো, মানুষ হলো, আমি নিজেও এখন ভাবি।

আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে বোধ হয় আল্লাহ শোনেন। তাদের বাবা খুব সৎমানুষ ছিল। এই মানুষটার অছিলায় এই ছেলেগুলো মানুষ হয়েছে। ভাবতাম , বাচ্চাগুলোর কী হবে? আমার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আল্লাহ আমাকে বুঝিয়েছেন, আমি যদি মানুষ করি, তবে মানুষটা ছাড়াও আমি মানুষ করতে পারি। যা মানুষ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কি উনি বেঁচে থাকলে করতে পারতেন? আমি বিশ্বাস করি যে আমার প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেছেন।

জব্বার হোসেন: ঢাকায় পৌঁছে প্রথম কোথায় আসেন?

আয়েশা ফয়েজ: এখানে আমার এক মামা ছিলেন, তার বাসায় উঠেছিলাম। আবুল হাসিম আমার ভাই। তার বাসায় ছিলাম প্রথমে, তারপর মামার বাসায়। আনিসুর রহমান ঠাকুর নাম। উনি ইনস্যুরেন্সে চাকরি করতেন।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ তখন কত বড়?

আয়েশা ফয়েজ: বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত।

জব্বার হোসেন: তখন তো হুমায়ূন আহমেদ লেখালেখি করেন।

আয়েশা ফয়েজ: তত দিনে বোধ হয় হুমায়ূনের একটা বই বেরিয়েছে।

জব্বার হোসেন: কোনটা?

আয়েশা ফয়েজ: ‘নন্দিত নরকে’ হয়তো। এখন মনে নেই।

জব্বার হোসেন: যুদ্ধের পর আপনি তো একটা মামলাও করেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে। সে ই মামলাটির কী অবস্থা বর্তমানে?

আয়েশা ফয়েজ: চাপা পড়ে আছে। সরকার চাইলেই এই মামলা আবার তুলতে পারে। আমি তো অনেকের কাছে গেলাম, কেউ কিছু করল না। এভাবে কত সময় চলে গেল।

জব্বার হোসেন: ঢাকায় সরকারি বাসা পেলেন কীভাবে?

আয়েশা ফয়েজ: মোহাম্মদপুরে বাসা পেয়েছিলাম। একদিন রক্ষীবাহিনী এসে তো খুব হম্বিতম্বি। তারা গাড়ি ভর্তি করে লোক নিয়ে ঢোকে। লুটপাট করে। আমাদের ঘরে এলো। তিন -চারটে ফাঁকা গুলি করল, ঘরের পর্দা, কাপড়চোপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। আমার তো জিনিসপত্র তেমন ছিল না। যা ছিল সব ছুড়ে বাইরে ফেলে দিল আর বন্দুক নিয়ে আমার দিকে এলো। ইকবাল আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। পাশের বাসায় মনোয়ার সাহেব ছিলেন। ডা. মনোয়ার হোসেন। তার বাসায় ছিলাম। পরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

জব্বার হোসেন: খ্যাতিমান লেখক আহমদ ছফা আপনাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তার সঙ্গে পরিচয় কীভাবে? কীভাবে তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন?

আয়েশা ফয়েজ: আহমদ ছফার সঙ্গে মূলত পরিচয়টা ছিল হুমায়ূনের। হুমায়ূন আহমেদ ছফাকে অনেক পছন্দ করত, আবার আহমদ ছফাও হুমায়ূনকে অনেক পছন্দ করতেন। হুমায়ূনের প্রথম বই 'নন্দিত নরকে'। এই বইটি আহমদ ছফাই অনেক চেষ্টা করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। রক্ষীবাহিনী যখন আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল, তখন আহমদ ছফা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন আহমদ শরীফের বাসায়। সেখানে নেওয়ার পরে আহমদ শরীফ সকল ঘটনা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এরপর 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় আমার অ্যালটমেন্টটি ছাপিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যেই আমি সন্তানদের নিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে পড়ি। পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর রক্ষীবাহিনীর প্রধান আমাদের প্রতিবেশী ডা. মনোয়ারের বাসায় ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। আমি কথা বলতে রাজি হইনি। আমি চাইনি ওই বাড়িতে উঠে নতুন করে আর কোনো ঝামেলায় জড়াতে। এরপর রক্ষীবাহি নীর প্রধান আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বিশেষভাবে অনুরোধ করতে থাকেন। এ সময়টাতে আহমদ ছফা ও ডা. মনোয়ার আমাকে বোঝাতে থাকেন। তারপর আমি মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের এই বাড়িতে আবার বসবাস শুরু করি।

আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় আহমদ ছফা প্রেসক্লাবের সামনে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। আহমদ ছফা অনেক বড় মনের মানুষ ছিলেন।

জব্বার হোসেন: সে সময় তো সংসারে উপার্জনের কেউ ছিল না। সংসারের খরচ নির্বাহ করতেন কীভাবে?

আয়েশা ফয়েজ: মুক্তিযোদ্ধা পরিবার হিসেবে তখন একটি সংগঠন থেকে মাসে ২০০ টাকা পেতাম, হুমায়ূনের বাবার একটি প্রাইভেট ফান্ড ছিল। আর আমার ছেলেরা সবাই তখন স্কলারশিপ পেত। জাফর

ইকবাল প্রাইভেট পড়াত। পত্রিকায় কার্টুন আঁকত। টেলিভিশনে 'কিন্তু কেন?' নামে একটি অনুষ্ঠান করত। তারা এই টাকা খরচ না করে পুরো টাকাই আমার হাতে দিত।

জব্বার হোসেন: বড় ছেলে হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ সংসারের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল ছিলেন?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হয়, রেজাল্ট বের হওয়ার পরদিনই চাকরি হয় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর চাকরি হয় ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে। হুমায়ূনের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বেতনটা সংসারের জন্য অনেক বড় সহায়ক ছিল। এদিকে কিছুদিন পরেই জাফর ইকবাল স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেল আমেরিকাতে। শাহীনও পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু না কিছু করত। এরপর আর আমাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আমেরিকা থেকে ওরা দুই ভা ই টাকা পাঠাত আর হুমায়ূনের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনটাও তুলতাম। তারা তাদের যোগ্যতা দিয়েই এগিয়ে গেছে। তাদের পড়াশোনায় আমার তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি।

জব্বার হোসেন: এবার ছেলেমেয়েদের লেখালেখির প্রসঙ্গে আসি। আপনার তিন ছেলে। তিনজনই খ্যাতিমান লেখক। হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখির শুরুটা কীভাবে? আপনার স্মৃতি থেকে বলবেন, তিনি কী ধরনের লেখালেখি করতেন এবং কীভাবে করতেন। শুরুর দিকের কথাটা বলবেন?

আয়েশা ফয়েজ: আমার ছোট ভাই আর হুমায়ূন ঢাকা কলেজে পড়ত। ঢাকা কলেজ থেকে একটা পত্রিকা বের হবে। সেখানে আমার ভাই একটা লেখা দেবে। তখন হুমায়ূন আহমেদকে বলল, একটা লেখা লিখে দাও তো। হুমায়ূন লিখে দিল। লেখাটা এত ভালো হয়েছিল যে আমার ভাইকেই সম্পাদক বানিয়েছিল। এভাবেই তার লেখালেখির আরম্ভ। একটার পর একটা সে লিখেই গেছে এবং প্রতিটা লেখাই সবাই ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। হুমায়ূনের লেখা পড়ে সৈয়দ শামসুল হক নাকি বলেছিলেন, সবার বাড়িতেই একটা মিনি লাইব্রেরি আছে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের। আসলেও তাই। এটা আসলে আল্লাহর একটা রহমত।

জব্বার হোসেন: লেখার জন্য হুমায়ূন আহমেদকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন কে?

আয়েশা ফয়েজ: ওর বাবা লিখত সেটা একটা বিষয়। লেখার জন্য একটা পরিবেশ লাগে। এসব তার মধ্যে ছিল না। সবার মধ্যে বসে সে লিখত। তার লেখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ছিল না।

জব্বার হোসেন: আপনার তিন ছেলের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী কে? আপনার কাছে কী মনে হয়?

আয়েশা ফয়েজ: আমার কাছে তো মনে হয় হুমায়ূনই। কারণ, লেখালেখির দিক দিয়ে সে এ পর্যন্ত যা করে এসেছে, তা একমাত্র মেধাবী ছেলের দ্বারাই সম্ভব। একেক জনের মেধা-প্রতিভা একেক দিক দিয়ে।

ইকবালেরও কিন্তু অনেক প্রতিভা। সে সমাজের অনেক কিছু নিয়ে এগিয়ে যায়। অন্যরা যা বলে না , সে বলে। এটাও তো অনেক বড় ব্যাপার। আমার এই ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই তার বাবার মতো খুব আদর্শবাদী।

জব্বার হোসেন: লেখক হিসেবে তিন ছেলের মূল্যায়ন কী ?

আয়েশা ফয়েজ: তিনজনের লেখা তিন রকম। হুমায়ূন আহমেদের লেখা অনেক ভালো। লেখার ভাষাও সুন্দর। হুমায়ূন যে প্রসঙ্গ নিয়েই লেখুক না কেন , তার বই মানুষ একবার হাতে নিলে পড়ে শেষ করতেই হবে। একবার সৈয়দ শামসুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন , বাংলাদেশে পাঠক তৈরি করার পেছনে হুমায়ূন আহমেদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আমি নিজেও ভারতীয় লেখকদের বই পড়তাম। কিন্তু আমার ছেলে লেখক হওয়ার পর থেকে আমি ভারতীয় বই পড়া বাদ দিয়েছি। জাফর ইকবাল বিজ্ঞানবিষয়ক বই লেখে। মাঝেমধ্যে গল্প-উপন্যাসও লেখে। তার লেখাও আমার ভালো লাগে। আর আহসান হাবীব তো উšাদ নিয়েই আছে। আমার একজন বোন বলেছিল, লেখক হলো আহসান হাবীব। কারণ, তার লেখায় অনেক মজা আছে। সে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে।

জব্বার হোসেন: এই তিনজনের মধ্যে আপনি কার লেখা বেশি পছন্দ করেন?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূন আহমেদের লেখা আমার অনেক ভালো লাগে। কারণ, তার লেখা সহজ এবং ভাষা অনেক সুন্দর। সে যে বিষয় নিয়েই লেখুক, একটানা পড়ে শেষ করা যায়।

(লেখালেখির দিক দিয়ে সে এ পর্যন্ত যা করে এসেছে, তা একমাত্র মেধাবী ছেলের দ্বারাই সম্ভব। একেক জনের মেধা-প্রতিভা একেক দিক দিয়ে। ইকবালেরও কিন্তু অনেক প্রতিভা। সে সমাজের অনেক কিছু নিয়ে এগিয়ে যায়। অন্যরা যা বলে না, সে বলে)

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদের শুরুর দিকের লেখাগুলোতে জীবনের গভীরতা, মানুষের জীবনবোধ উঠে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের লেখাগুলোতে তা অনেকটা অনুপস্থিত। এমন মন্তব্য অনেক পাঠকের...

আয়েশা ফয়েজ: আমি মনে করি, লেখকের বড় কৃতিত্বই হচ্ছে পাঠক ধরে রাখা। তার লেখা পাঠক পছন্দ করে কি না, সেটা বড় বিষয়। হুমায়ূন আহমেদ যা-ই লিখুক না কেন, হাজার হাজার পাঠককে মুগ্ধ করা তো সহজ কথা নয়। সুতরাং হুমায়ূনের লেখা নিয়ে অন্যরা সমালোচনা করলেও আমি করতে পারি না।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ নাট্যকার হিসেবেও অনেক জনপ্রিয়। কিন্তু শুরুর দিকের নাটকগুলোর আঙ্গিক ও বিষয়ের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ের নাটক অনেক বেশি তরল -সরল...

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূনের তখনকার নাটকগুলো মানুষ অসম্ভ ব পছন্দ করেছে। এখনকারগুলোও পছন্দ করছে। একজন লেখকের দীর্ঘযাত্রায় বাকবদল তো হতেই পারে। দর্শক এখনো তার নাটক আগের মতোই পছন্দ করে। একজন লেখকের পাঠকপ্রিয়তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ , যা হুমায়ূনের শুরু থেকেই ছিল, এখনো আছে। হুমায়ূন অনেকবার বলেছে, সে তার নিজের আনন্দের জন্য লেখে। তা ছাড়া একেক ধরনের লেখা বা নাটকের একেক দর্শক।

জব্বার হোসেন: একজন বড় লেখকের সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব থাকে। হুমায়ূন আহমেদ তার সেই দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন বলে আপনি মনে করেন?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূন আহমেদ সব সময়ই পরিবার এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নামকরণ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেখানে হুমায়ূন আহমেদ ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে অনশন করেছিল এবং জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। এই ঘটনা নিশ্চয়ই মনে আছে।

জব্বার হোসেন: হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন। এটা কি আপনাকে কখনো কষ্ট দেয়?

আয়েশা ফয়েজ: হুমায়ূনের নিজস্ব নীতি ও দর্শন রয়েছে। সে বলেছে, আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকভাবে ক্লাস না করাতে পারি, তাহলে আমার বেতন নেওয়া ঠিক হবে না। সে লেখালেখি, নাটক, ছবি অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাকে থাকতে হয়। সে কারণে সে তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

(হুমায়ূন যে প্রসঙ্গ নিয়েই লেখুক না কেন , তার বই মানুষ একবার হাতে নিলে পড়ে শেষ করতেই হবে। একবার সৈয়দ শামসুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন , বাংলাদেশে পাঠক তৈরি করার পেছনে হুমায়ূন আহমেদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে)

জব্বার হোসেন: ‘জোসনা ও জননীর গল্প’ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র কতটা ফুটে উঠেছে বলে আপনি মনে করেন?

আয়েশা ফয়েজ: আমি মনে করি, হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে কয়টা লেখা , তা অসম্ভব ভালো লিখেছে। শুধু জোসনা ও জননীর গল্পই নয়, হুমায়ূন আহমেদ তার অনেক ছোটগল্পের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছে।

জব্বার হোসেন: ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সায়েন্স ফিকশন লেখেন। অসম্ভব জনপ্রিয়ও তিনি। হুমায়ূন আহমেদও প্রথমে সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন। তাদের দুজনের মধ্যে আপনার কার লেখা ভালো লেগেছে?

আয়েশা ফয়েজ: সায়েন্স ফিকশন নিয়ে আমি তেমন কিছু বলতে পারব না। কারণ , আমি সায়েন্স ফিকশন তেমন ভালো বুঝি না। তবে ইকবালের কিছু সায়েন্স ফিকশন পড়েছি , ভালো লেগেছে। তাদের দুজনের লেখার বিষয় এবং ধরন দুটো তো একেবারেই ভিন্ন।

www.amarboi.com সাইটের সৌজন্যে নির্মিত।